শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রকাশক
প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

মূল্য ৪৲ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ভূমিকা

পুস্তক-পরিচয় লেখা গ্রন্থরচনার আবেগবর্জ্জিত, তাই কাজটা ঈষৎ গোঁজামিল-ঘটিত। বন্ধু দেবীপ্রসাদ ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। কথাশিল্পে হাত দিলে তিনি যে নিজের সৃষ্টিগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবেন এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর বিশ্লেষণ ও বিবৃতি যে সবল, সুবিন্যস্ত ও প্রাণবন্ত হবে এটা স্বাভাবিক, এমনকি স্বতঃসিদ্ধ। শিল্পের মূল প্রেরণা যে অনুভূতি ও আবেগ তা শিকারের গল্পে পুরাপুরি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেননা মনের টান না থাকলে গাছের ডালে বসে মশার কামড় খাওয়া বা সর্প-বৃশ্চিকের সান্নিধ্য উপভোগ আয়েস-অনুরাগী সৌন্দর্য্যপিপাসী শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং শিকার করা বা তার আনুষঙ্গিক ভয়-ভীতি, সঙ্কট-দুর্ভোগ অনায়াসে হজম করা সুগভীর বিচারে কোন ফ্রয়েডীয় কারণ-ঘটিত হলেও শতকরা নিরানব্বই ভাগই ইচ্ছালব্ধ ও অনুরাগের ছাঁকনিতে ছেঁকে নেওয়া। সৃষ্টি ও সংহার পরস্পর-বিরোধী নয়। তূলির টানের সঙ্গে ট্রীগারের টানেরও কোন জাতিগত বিরুদ্ধতা নেই। তাই দেবীপ্রসাদ ভল্লুকের সাহচর্য্যে যদি অরক্ষিত ব্রহ্মতালুতে মধুমক্ষিকা-দংশিত হয়ে হৃদয়ে পূর্ণতা লাভ করেন এতে পাঠকের অবাক হবার কিছু নেই। একটা-দুটো কালকেউটে যদি তাঁর দেহকাণ্ড বেয়ে যাতায়াত করে বা তেঁতুলের দেশের অতিকায় তেঁতুলে বিছেরা তাঁর বৃষস্কন্ধে লীলায়িত হয় তাতেই বা আপত্তির কি আছে, বিকটদশন শার্দ্দূলরাজের সঙ্গে টর্চ্চের আলোতে শুভদৃষ্টির রোমাঞ্চকর হৃদকম্পন, বিস্তৃতনখর চিতার হিংস্র আবেদন কিংবা শবাহারী ঘৃণ্যবৃত্তি হায়েনার পূতিগন্ধ নৈকট্য যে পারিপার্শ্বিকের খোরাক জোগায় তার মধ্যে যদি মাতা সরস্বতীর সাকরেদ ইস্কুল-পালানোর সাময়িক উন্মাদনায় কালীপূজায় মেতে উঠেন তাকে আধ্যাত্মিক মুখ বদ্‌লান বলে সাদরে মেনে নেওয়াই উচিত। আমরা তাই শিল্পী দেবীপ্রসাদকে কিরাতের ছদ্মবেশেও নিজত্ব বজায় রেখে চলতে দেখে অক্ষুব্ধচিত্তে তাঁর নূতন প্রেরণা সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করছি।

শিল্পীর তূণে যেসব আয়ুধ সমাবেশিত হয় অতিরঞ্জন তার মধ্যে অন্যতম। অবয়বে, আকারে, অঙ্গবিন্যাসে বা বর্ণে অতিরঞ্জন চিত্রশিল্পে চির-প্রচলিত। অসম্ভব-নয়না, অকল্পনীয় নাসা, চূড়ান্ত দেহ, ভ্রমরকটি সুন্দরীদের প্রাচুর্য্যে ভারত-চিত্রকলা রহস্যময়।—এ আতিশয্যের আবেগ নারীজাতির প্রতি প্রেম অথবা প্রতিহিংসার পরিচায়ক এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দেবীপ্রসাদের শিকার অবলম্বন করে যে সব আনুষঙ্গিক রসের অবতারণা হয়েছে তার মধ্যে একটি কাল্পনিক সহধর্ম্মিণী সযত্নে অভিব্যক্ত। ইনি শিল্পীর নৃকুলস্মৃতিজাত অর্দ্ধচেতনার আতঙ্কের প্রতীক, না অভিমানের মানহানির নিষ্ফল প্রচেষ্টা ঠিক বোঝা গেল না। Vitamin-calory-hygiene-pedagogy ও Prison Administration-এর এ অপরূপ সমন্বয় দেবী-

প্রসাদেই সম্ভব। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে দুঃস্বপ্নপ্রসূত চিত্র হলেও the hunter hunted-এর হাস্যরসের আবেদন আছে। যে পুরুষজাতির আত্মা নারীর হাতে পড়ে পাম্প-ফিল্টার শোধিত হয়ে সংসারে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে পরিবেশিত হয়ে আসছে সে পুরুষের এই কৃচ্ছ্রসাধন চির অব্যাহত থাকবে। মৃগয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্বলিত হোমাগ্নির সূচনা করে তাতে ঘৃতদান নারীতেই সম্ভব। তবে সপরিবারে শিকার করতে যাওয়াই বা কেন ?

দাক্ষিণাত্যের মধ্যযুগের যে গল্পটি গ্রন্থকার বন্দুকের গলায় পুষ্পমাল্যের মত দুলিয়ে দিয়েছেন তাতে শিকারের নিছক আমিষ ভাব কতকটা কেটে গেছে। গল্পটি রাজপুতবীর বাপ্পাদিত্যের প্রণয়-কাহিনীর সহজাতীয় ; যদিও আরও সালঙ্কৃত। অরণ্যদেশের মানুষ, তার জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ আর দৃষ্টিভঙ্গী খুব ভালরকমই চিত্রিত হয়েছে। ভূমিকা আরও দীর্ঘ হলে পাঠকের উপর অন্যায় করা হয়। উপভোগে বিলম্ব স্বভাবতই কিছুটা অপেক্ষার আনন্দের সৃষ্টি করে এবং তাতেই গৌরিচন্দ্রিকা সার্থক হয়।

কলিকাতা **শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়**
১-১১-৫৩

সূচী

লেখক

পোষা হাস্‌ব্যাঙের শিকার-কাহিনী

মানুষ মাত্রেই সারাটা জীবন পরম শান্তিতে বাঁচিয়া থাকিবে, এইরূপ উদ্দেশ্য বিধাতা কখনও পোষণ করেন নাই। সুখ ও দুঃখের কাহিনী, ধনী দীন রাজা প্রজা নির্ব্বিচারে অল্প-বিস্তর সকলেরই বলিবার আছে। তবে পাত্র হিসাবে বিধাতা যে পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কাহারও কপালে অকারণ বেশি সুখের ব্যবস্থা করিয়া কাহাকেও যৎপরোনাস্তি দুঃখ দেওয়াটা তাঁহার স্বভাব।

ভাগ্যের দিক দিয়া আমি বিধাতার সুনজর যুতসইভাবে আকর্ষণ করিতে পারি নাই। কৈশোর পার হইতেই যৌবনকে তিনি আদালতের ক্রোক-নোটিসজারীর পেয়াদার মত আমার পিছনে এমনভাবেই লেলাইয়া দিলেন যে, বয়সের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বেঘোরে বিবাহ করিয়া ফেলিলাম—ভবিষ্যতের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পাইলাম না। বিবাহের পর কিছুদিন ফ্যাশনমত্তা পত্নীকে পাশে বসাইয়া সিনেমা দেখিয়া চা ও ডিনার পার্টিতে স্যাণ্ডাল স্যাণ্ডাল ও শাড়ির চর্চ্চা করিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছিলাম। কিন্তু দিনগুলি যখন মাস বৎসর পার হইয়া প্রায় যুগে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ঠিক বুঝিলাম—বিবাহ করিয়া কাজটি ভাল করি নাই।

এই সূত্রে আমার স্ত্রীর পরিচয়টা দিয়া রাখা ভাল। তিনি চলতি মতে শিক্ষিতা, তদুপরি ঘোরতর মার্জ্জিতা অর্থাৎ তিনি ডাক্তারী জানেন, সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত সম্বন্ধে কথা বলিতে পারেন, মাঝে মাঝে কবিতা লিখিয়া থাকেন—এমন কি ভিড়ের মাঝে প্রয়োজন না থাকিলেও নবজাগরণের দৃষ্টান্ত কায়েমীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ট্রামে বাসে ভদ্রসন্তানকে চড় কষাইতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

নিমন্ত্রণ আসিলে পার্টির সময় ও মানুষ বিচার করিয়া তিনি পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকেন—যথা রাত্রিতে সাহেবী ডিনারে হাইহীল, সন্ধ্যায় দেশী চায়ে চটিকা এবং অপরাহ্নে কাহারও শ্রাদ্ধঘটিত ভূরিভোজনে ভেজিটেবল্ সু।

রাত্রের সাহেবী ডিনারে শুধু হাইহীল পরিলেই তো ডিনার-প্রসাধনের জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া যায় না। শাস্ত্রমত দেহের কতক অংশ রং করিয়া ম্যাচিং করিয়া লইতে হয়। দেহই বলিলাম, কারণ আধুনিক পরিচ্ছদে ঢাকা অংশ আর কতটুক? লাল জুতা হইলে ঠোঁট ও নখ লালে লাল করিয়া দেওয়াটা ফ্যাশন-ধর্ম্মে অবশ্যপালনীয়।

এ বিষয়ে আমার স্ত্রী একটু বেশি অরিজিন্যাল। কলার স্কীমে (Colour Scheme) একটি অভিনব হারমনি (harmony) না আনিতে পারিলে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

লালজুতা-লালনখ-লালপাড়ের সহিত হয়তো একটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ক্রেপ-ডী-সীন শাড়ি পরিয়া বসিলেন। উগ্র লাল ও ঘোর কালোর সংমিশ্রণে যে হারমনির সৃষ্টি হইল, তাহা কতকটা পোড়া কাঠের স্থানে স্থানে আগুন জ্বালার মত। বেমানান লাগিতেছে বলিবার সাহস নাই, কারণ আমি মাত্র একটা নিরীহ হাস্ব্যাণ্ড (husband)। উনি পোশাক পরিয়াছেন—that smart young manকে দেখাইবার জন্য। এইরূপ অবস্থায় সুবোধ বালকের মত তাঁহার রুচির সমর্থন করাটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। অন্যথায় অজ্ঞাত বিপদ অকস্মাৎ মাথাটাকে ঘায়েল করিয়া দিতে পারে। যাহা হউক, ডিনার-প্রসাধনের কথা বলিয়াছি, এইবার দেশী চায়ের পালা।

ডালমুট ও কচুরির উল্লেখ করিয়া ঘরোয়া চায়ের নিমন্ত্রণ আসিলে তিনি জরিদার সেফটি (safety) চটি পরিয়া থাকেন। 'সেফটি' বলিলাম এইজন্য, কারণ পরিলে উহাতে জুতার জাতিগত আকৃতির কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু খুলিবার সময় কুলীন গোটা জুতার মতই অস্বস্তিকর চেষ্টার প্রয়োজন হয়। না পরিলেও বিপদ কম নয়। আলমারিতে সাজাইয়া রাখিলে শিল্প-সমালোচক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা গ্রীক প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া থিসিস লিখিবার ভয় দেখান। বাস্তবিকই আমি সংস্কারবদ্ধ শিল্প-সমালোচক ও গোঁজামিল-বাদী প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশেষ ভয় করিয়া চলি। ভাবোদয় হইলে কোন্ মহাপুরুষ কি চাহিয়া বসিবেন ঠিক নাই এবং যাচিত বস্তু হস্তগত হইলে ফেরত দিবার কথাটা সুবিধামত ভুলিয়াও যাইতে পারেন। ভাবুকরা অনেক কিছুই করিয়া থাকেন যাহার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি যদি ভদ্র কায়দায় চুরি করিতাম, তাহা হইলে লোকে প্রথমেই বলিত, শালা চোর তো বটেই, তাহার উপর আবার চালাক। আমি যদি প্রথম খেতাবটা বাদ দিয়া দ্বিতীয়টা পাইতাম, তাহা হইলে কি আমার কাহিনী লিখিতে বসিতে হইত!

যাহা হউক, আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আর একটু বলিবার আছে। আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী—অনবরত উল্লেখ করিলে জাগ্রত মহিলাটি মনে মনে ক্ষুণ্ণা হইতে পারেন—তৎপর চটিতে কতক্ষণ। চটিবার কারণ যথেষ্ট আছে—মানুষের উপর "আমার" শব্দের প্রয়োগ প্রগতির যুগ সমর্থন করে না। জীবন্ত মানুষ তো দূরের কথা, কিছুদিন বাদে আমার বাড়ী, আমার ফাউন্‌টেন্‌পেন, আমার বাইসাইকেল বলিবারও হয়তো উপায় থাকিবে না। যাঁহারা পরস্ত্রী, ফাউন্‌টেন্‌পেন, বাইসাইকেল ইত্যাদি না বলিয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করেন নাই, তাঁহাদের আধুনিক যুগে বোকা বলাই ধার্য্য হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন জড়কে পুরা দাম দিয়া কিনিয়াও যদি সম্পূর্ণ দখলে না রাখা যায় এবং আমার বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানুষের উপর possession-এর দাবি প্রগতি সমর্থন করিবে কেমন করিয়া—সুতরাং অতঃপর "স্ত্রী"র স্থানে শ্রীযুক্তা ব্যবহার করিব। শ্রীমতী কথাটায় কেমন একটা ছোট করার সংস্কার জড়াইয়া

আছে। হাজার হউক, যাহাই লিখি, আইনত তিনি আমার স্ত্রী তো বটেই। তাঁহার সম্বন্ধে যৎসামান্য দুর্ব্বলতা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

যে ঘটনা লিখিতে বসিয়াছি, তাহা নিতান্তই বাজে। তথাপি আমার পক্ষে বাজে নয়; কারণ আমি নাজেহাল হইয়া গিয়াছি এবং এই গল্পটিকে সূত্র করিয়া শ্রীযুক্তা ভবিষ্যতে যে আরও দুর্ভোগের সুব্যবস্থা করিবেন, সে বিষয় সন্দেহ করি না। সবই জানি, তথাপি আমার দুঃখের কাহিনী লিখিব, পাঠকদের সহানুভূতি ভিক্ষার জন্য। যদি কোন দরদীর সৎসাহসের অভাব না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ যেন আত্ম-কাহিনী লিখিয়া পাঠান। আমি জানিতে চাই, আমার মত পোষা হাস্‌ব্যাণ্ড ধরণীর বুকে অন্তত আর একটি আছেন।

আমি আসলে একটি বুনো প্রকৃতির মানুষ। Evolutionএর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ঘষা-মাজার পূর্ব্বে মানুষ যে মনোবৃত্তি লইয়া জীবন যাপন করিত, আমি এখনও নির্লজ্জের মত তাহা ব্যবহার করিয়া থাকি। নেশার প্রতি আসক্তি আছে, শিকার ছাড়া আর অনেক কিছু—। সাম্বার, শার্দ্দুল অথবা বরাহের পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া উঠে, তখন নির্ভয়ে পাঁকযুক্ত জল পান করিয়া থাকি।

জঙ্গলে ক্ষুধার তাড়নায় জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে এবং সুপক্ক ফলের
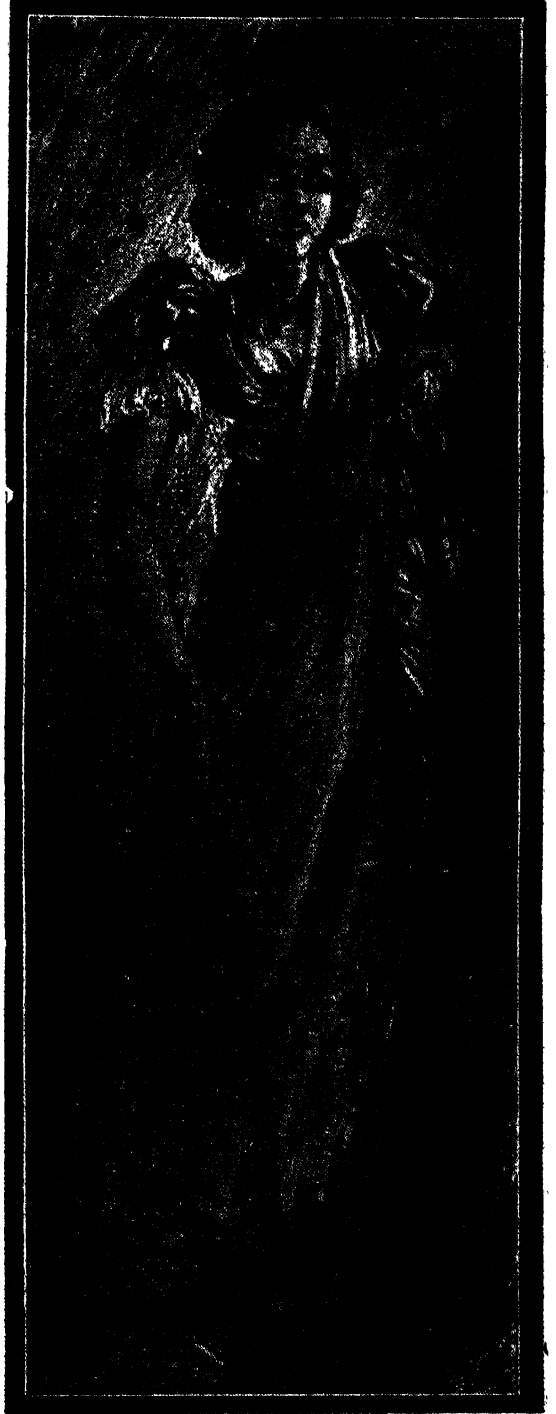
সন্ধান পাইলে অবলীলাক্রমে গাছে উঠিয়া পড়ি এবং বন্য ফল গাছে বসিয়াই ভক্ষণ করি, কিছুমাত্র লজ্জা আসে না। সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না সব কয়টিরই সহজ উচ্ছ্বাস শ্রীযুক্তা নিকটে না থাকিলে বর্ব্বরের মতই প্রকাশ করিয়া ফেলি। তাঁহার সাহচর্য্য পাইতে হইলে অবশ্য ভাষার একটু পোশাকী খোলস ব্যবহার করিয়া থাকি। খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে আমার immunity প্রায় অবিশ্বাসযোগ্য হইয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস বলেন, আমি নাকি লিভার বাদ দিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এত বড় সমালোচকের গভীর গবেষণা শ্রীযুক্তা মানিতে প্রস্তুত নহেন, কতদিন বলিয়াছেন—কোন্‌দিন বেঘোরে···বক্তব্য সম্পূর্ণ শেষ করেন নাই কেন আমি বলিতে পারি না।

সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় ভক্ষণের পূর্ব্বে বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নানা প্রথায় ভগবানের নাম করা চলতি আছে। খ্রীষ্ট-উপাসক সাহেবেরা আমেন বলিয়া থাকেন, হিন্দুরা গণ্ডূষ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অন্নের অংশ ঈশ্বরের নামে অর্পণ করেন—হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর আলোক-প্রাপ্ত, তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অজানাকে দেখিয়া থাকেন—আরও নানা পন্থা নিশ্চয় আছে—আমার জানা নাই।

আমি সাহেবী ও দেশী কায়দায় ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার খাইয়া থাকি। যখন খাইতে বসি, তখন ভগবানকে স্মরণ করিবার সময় পাই না—ভীতভাবে শ্রীযুক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। তিনি ভিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদির আদি-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক গবেষণার গোটা তালিকা বলিয়া যান। এ, বি, সি, ডির বর্ণমালায় আর কতকগুলি অক্ষর যোগ দিতে পারিলে ছোটদের স্বাস্থ্যের বর্ণপরিচয়ের পুস্তক হইয়া যাইত। প্রৌঢ় বয়সে আমি এই বর্ণ-পরিচয়ের নববিধান শ্রবণ করিয়া খাইতে বসি। না শুনিলে তিনি আমার প্রিয় ভক্ষণীয়গুলি, ভয়ে ভয়ে বলিতেছি—দেশী বাটলারের সার্ভ করিবার হুকুম নাই—কি জানি যাহা প্রাপ্য তাহার বেশি যদি লইয়া ফেলি—শ্রীযুক্তা দাঁড়াযুক্ত চামচের সাহায্যে নিজে আমার প্লেটে তুলিয়া দেন। নিজে তুলিয়া না দিলে অসুবিধা তাঁহারই বেশি; কারণ অনেক সময় অন্যমনস্কতাবশত আমি হাত দিয়াই তুলিয়া লইয়া থাকি। এই সময় শ্রীযুক্তা হাঁ হাঁ করিয়া টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়েন—যেন কাহাকেও অস্ত্রাঘাত হইতে আত্মোৎসর্গ করিয়া রক্ষা করিতে চলিয়াছেন। আমি থতমত খাইয়া চকিতে হাতটি সরাইয়া লই, তাহার পর ক্ষীরের লাড়ু লোলুপ দৃষ্টি দ্বারা উপভোগ করিবার চেষ্টা করি—কারণ এই ঘটনার পর জিহ্বার দ্বারা রসনার তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। উক্ত ঘটনাগুলি আমার দৈনিক জীবন-যাত্রার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সেদিন সকাল হইতে প্রায় বৈকাল পর্য্যন্ত খোদ কর্ত্তার জুতা পালিশ করিবার অভিনব scientific process আবিষ্কার করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম—বিকালে পানদোষে অভ্যস্ত হইয়াও ব্রাণ্ডি খাইলাম না—মনটা বিগড়াইয়াছিল। জুতা পালিশের টেক্‌নিক ঠিক

methodical হয় নাই। অবশেষে মরিয়া হইয়া ঠিক করিলাম, চা খাইব। বেপরোয়া হইয়া শ্রীযুক্তার নিকট একটি চিঠি পাঠাইয়া দিলাম। চা খাইবার অনুরোধটি সত্যই তাঁহার নিকট অপ্রত্যাশিত—কেন জানি না, গৃহে আসিয়া দেখিলাম, চায়ের ব্যাপারটায় কেমন একটা বৈশিষ্ট্যের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। আমি যাহা ভালবাসি, সবই টেবিলে সাজানো রহিয়াছে—আহা, কুক্কুটের স্যাণ্ডুইচটা (sandwich) পরিপাটিভাবে আমার চক্ষের সামনে বিদ্যমান। প্যাটির পাপড়িগুলা দেখিলেই জিহ্বা লালায় ভরপুর হইয়া উঠে, বিদেশী পিঠাগুলাও মন্দ নয়—আমি হাত কচলাইতে কচলাইতে চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম ; সাবধানী মন হঠাৎ অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিল —অত আদরের পিছনে কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য নাই তো ? হিসাব করিয়া দেখিলাম, তিন দিন আগে শ্রীযুক্তার জন্মদিনের ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে তাঁহাকে বেজায় দামী এবং তাঁহার ফেভারিট ক্রেপ-ডি-সীন দেওয়া হইয়াছে। তবে এত আয়োজন কিসের জন্য ? আয়োজনের গূঢ় উদ্দেশ্য জানিতে সময় লাগিল না। শ্রীযুক্তা আমার পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, তোমার শিকার দেখতে যাব। ইচ্ছাটা তাঁহার একলার হইলে, অত্যুচ্চ বিশেষণ-যোগে চাটুবাক্য ব্যবহার করিয়া বলিতাম, তোমার এমন চমৎকার রং শিকারে যাইলে ঝলসাইয়া যাইবে। মিথ্যা প্রশংসা আশ্রয় না দিলে বাঘের ভয় দেখাইতাম। কিন্তু প্রস্তাবটি আমার নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমার বালক পুত্র ও অনূঢ়া ছাত্রীকে দলে টানিয়া লইয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া যখন 'তথাস্তু' বলিলাম, তখন আরও ফ্যাঁকড়া আসিয়া জুটিল। Miss X শিকারে যাইতেছেন শুনিয়া ছেলেদের দল ছুটিয়া আসিয়াছে। উচ্চ ক্লাসের ডেঁপো ছেলেরা আবদার ধরিল। মিস অমুক যদি শিকার দেখিতে পারেন তো আমরা বাদ যাই কেন ? ছেলেগুলির ভিতর অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা-প্রাপ্ত—এক কথায় 'না' বলিতে সাহস পাইলাম না, হয়তো তর্ক জুড়িয়া দিবে। ডেঁপোদের সঙ্গে তর্ক করা অপেক্ষা সময়টা অন্য কাজে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। আমি আর একজনকে সঙ্গে লইবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু ছেলেগুলা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়াই রেজলিউশন পাস করিয়া দিল—ভেঙ্কট রঙ্গস্বামী, নলিন, বিশ্বমোহন, খগেন, শচীন, সুশীল, কালী ও বামাপদ নিজ নিজ ফ্লাস্ক লইয়া সকলে বাস-টারমিনাসে যোগ দিবে ; তাহার পর শিকারের নিকটবর্ত্তী স্থানে, গরুর গাড়ি, হণ্টন যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। আমি তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলাম ; কিন্তু থমকিয়া নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিলাম—দেখিলাম, শ্রীযুক্তা ছেলেদের প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। আমার মুখ হইতে প্রতিবাদ বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া চলিলেন—বেশতো সে ভারি মজার হইবে—মিস X গান গাইবেন, সুশীল বাঁশী বাজাইবে, পুত্র তবলা ধরিবে—কালী হারমোনিয়ামটা সঙ্গে লইবে। জঙ্গলের মাঝে পিকনিক জমিবে ভাল। মনে মনে ভাবিলাম, এতগুলি যন্ত্রের নাম করা হইল, একতারার উল্লেখ

তো কেহ করিল না। শার্দ্দূল-বহুল অরণ্যে বনভোজনের যেভাবে আয়োজন চলিয়াছে, তাহাতে শিকারী বন্দুক ছাড়িয়া একতারা লইয়া বৈরাগী না হইলে চলে কেমন করিয়া! যাহা হউক ঠিক হইয়া গেল, দুইজন পিয়ন, তিনজন চাকর, একটি পাচক ও একজন দাসী যাইবে—তদ্ব্যতীত অন্য সাঙ্গোপাঙ্গ তো আছেই। শিকার-পার্টি একটি ছোট ফৌজ হইয়া দাঁড়াইল।

প্রত্যহ প্রাতে এক ঘণ্টা মুগুর ভাঁজিলে যকৃতের ক্রিয়া অভদ্রোচিত ও উগ্র হইয়া থাকে। আমার সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অভ্যাসানুসারে অসভ্যের মত কসরৎ শেষ করিয়া অনশনভঙ্গের জন্য টেবিলে আসিয়া বসিলাম। অনশনভঙ্গ বলিলেই রাজনৈতিক কিছু সংশ্লিষ্ট আছে মনে হয়; বর্ত্তমান ঘটনার সহিত জটিল কিছু জড়াইয়া নাই। আমার অনশনভঙ্গ নিতান্তই দৈনিক ব্যাপার, সোজা বাংলায় যাহাকে বলে ব্রেকফাস্ট (breakfast)।

সম্মুখে যাহা কিছু আমার ভাগে ছিল, অতি অল্প সময়ের ভিতর নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম। শ্রীযুক্তার জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব হইল না। তিনিও কসরৎ করিতেছিলেন, মুগুর ভাঁজা নয়, প্রসাধন। পুরা আধঘণ্টা-কাল দরজা বন্ধ করিয়া যে বেশে সামনে আসিলেন, তাহাতে সার্কাসের অবলা ক্লাউন (clown) বলিলে অত্যুক্তি হইত না। আধ ঘণ্টাও তাঁহার নিকট তাড়াতাড়ি—এই সময়ের ভিতর যতটা সম্ভব ক্ষিপ্রতাসহ পাউডার লেপন করিয়াছিলেন। ফলে স্থানে স্থানে আসল দেহবর্ণের উঁকি চাপিতে পারেন নাই। দুঃখ হইল—অটোমেটিক পাউডার লেপনের যন্ত্র থাকিলে এইরূপটি ঘটিত না—ভাবিতে লাগিলাম, আমি যদি husband না হইয়া that smart youngman হইতাম, তাহা হইলে কি শ্রীযুক্তা এই ভাবে আমার সামনে আসিতেন! আর কিছু না হউক, অন্তত রসরাজ রাজশেখরবাবুর, ঠোঁটের সিঁদুরটা ব্যবহার করিতেন। শাড়িটা হয়তো এত সস্তার হইত না। তিনি টেবিলে বসিয়াই বলিলেন, সবই ঠিক হইয়া গিয়াছে কেবল বড় ফিলটার-পাম্পটির ব্যবস্থা হইলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

আমি অবাক হইয়া গেলাম—বলে কি! শিকারে ফিলটার-পাম্প? যে পাম্প ব্যবহার করিতে তিন চারজন সবল পুরুষের দরকার হয়, তাহাকেই জঙ্গলে লইয়া যাইতে হইবে? মানিলাম জঙ্গলে তিনজন জোয়ান লোক পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এখান হইতে পাঁচ মণ ওজন যন্ত্রটি বহন করিবে কে? মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, ভয় পাচ্ছ কেন টি-বি-তে (Travellers' Bungalow), সুন্দর পাতকুয়ার জল আছে, সে জল তো আমি নিজে—

শ্রীযুক্তা তাঁহার হাতটি আমার মুখের কাছে আনিয়া বলিলেন, থামো খুব হয়েছে—সঙ্গে ছেলে যাচ্ছে—বাইরের মেয়ে রয়েছেন, আমার শরীর খারাপ, তা ছাড়া এতগুলি লোক। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি, সকলেই ফিল্টার্ড ওয়াটার খাবে? শ্রীযুক্তা দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলেন, নিশ্চয়, তুমি কি ভেবেছ জঙ্গলের মাঝে অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে আমরা সেইখানেই থেকে যাব?

"নিশ্চয়" শব্দটি যে পর্দ্দায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় সাড়ে পঞ্চম পার হইয়া গিয়াছিল। অতটা চড়া পর্দ্দায় সুর মিলাইয়া কথা বলার শক্তি আমার ছিল না। মানিয়া লইলাম তাঁহার আদেশ। ফিলটারের জন্য একটি লরির বন্দোবস্ত হইল।

পরের দিন অফিসের ফাইল দেখিতেছি ; পিয়ন সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকিয়া বলিল, হুজুর মেমসাহেব চিঠি দিহিন হ্যাঁয়। দমিয়া গেলাম—শ্রীযুক্তার প্রেরিত কাগজের টুকরার ভাঁজ খুলিয়া দেখিলাম, একেবারে শিলযুক্ত সমন, মাত্র কয়েকটি কথা "এখুনি এস, দরকার আছে।" G. O. D. O. অনেক কিছুই টেবিলে জড় হইয়াছিল। কোনটাই আমাকে থামাইতে পারিল না শ্রীযুক্তা যে কোন্ কারণে চটিয়াছেন, তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। কারণ চিরকুটটি পেনসিলে লেখা, একটি কথা লিখিতেই শিস ভাঙিয়া গিয়াছিল, তথাপি ভাঙা পেন্‌সিলটাই জোর দিয়া ব্যবহার করিয়াছেন—বক্তব্যের শেষ অংশ engraved হইয়া গিয়াছে। আশঙ্কান্বিত হইয়া বাংলোর দিকে চলিতেছিলাম—বেলা তখন তিনটা হইবে।

মাতা ও পুত্র উভয়ে প্রাণপণ শক্তির দ্বারা ফিল্টার-পাম্প ভাঙিবার চেষ্টা চালাইয়াছে

উপরে উঠিয়া দেখি, শ্রীযুক্তা পুত্রের সহযোগে প্রাণপণ শক্তিতে ফিলটারটা দোরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মা ও ছেলে উভয়ে মিলিয়া ফিল্‌টারের হাতাটা (handle) এমন ভাবেই টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত পোরসিলেনের যন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি আসিয়া কি করিয়া যন্ত্রটা ব্যবহার করিতে হয় দেখাইয়া দিলাম। যন্ত্র চলিতেছে দেখিয়া শ্রীযুক্তা কোমরে হাত রাখিয়া বলিলেন, এই পাম্পের জন্যই তোমাকে ডেকেছিলাম—এতগুলো টাকা কেবল জলে ফেলেছ। আমি উত্তর করিলাম, সে তো সত্যি কথা, টাকাগুলো তো জলের জন্যই খরচ করা হয়েছে।

শ্রীযুক্তার কাপড় কোমরের কাছে কড়া করিয়া বাঁধা ছিল। আমার উত্তর শুনিয়া আরও কড়া করিয়া বাঁধিলেন। আচরণটি সুবিধার ঠেকিতেছিল না—একটি সাংঘাতিক বিস্ফোরণের আশু সম্ভাবনা ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে মনে হইল। আমি ছেলেটিকে আদর করিয়া শ্রীযুক্তার উত্তেজনা যৎকিঞ্চিৎ লঘু করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ফল পাইলাম ঠিক বিপরীত।

পুত্রকে ধমক দিয়া বলিলেন, যাও নীচে যাও—এখন বিরক্ত ক'রো না। কত কাজ আছে দেখছ না! কাজের মধ্যে তো ছিল পাম্পটা বিকল করিবার—তাহাও বন্ধ হইয়াছে। এক মুহূর্ত্ত আগে ঐ পাম্পটা ভাঙিবার জন্য পুত্র মাকে প্রাণপণ সাহায্য করিতেছিল। প্রমাণ, উভয়েই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ নিজ সন্তানের প্রতি এইরূপ ব্যবহার কেন? এক যুগ কাটিল শ্রীযুক্তার সহিত হাস্‌ব্যাণ্ড সাজিয়া ঘর করিতেছি—পুত্রকে অকারণ তিরস্কার করিবার অর্থ বুঝিতে দেরি হইল না। উহা আমাকে প্রস্তুত হইতে দিবার ইঙ্গিত। শ্রীযুক্তা এদিক দিয়া যথেষ্ট উদার, warning না দিয়া তিনি কখনও আমাকে দুঃখ দেন নাই—তাঁহার লেখা ছোট চিরকুট পড়িয়াই জানিতে পারিয়াছিলাম কপালে একটা দুর্ঘটনা ঘনাইয়া উঠিতেছে। আক্রমণকারী প্রবল, সুতরাং প্রস্তুত হইবার সময়টা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতই লাগিতেছিল। জ্বালা বহুগুণ বাড়িয়া উঠিবার ভয়ে বলিলাম, পাম্প তো ঠিক হয়ে গিয়েছে, তা হ'লে আমি আপিসে যাই।

• •

শ্রীযুক্তা কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি কাঠের সিঁড়িতে আগন্তুকের পদশব্দ অনুসরণ করিল। খটাং খট্ খটাং খট্—এক জোড়া high heel জুতা উপরে উঠিয়া আসিতেছে। শব্দটি Screen-এর ওপাশে থামিতেই মিস্ X বলিতেছেন, আসতে পারি—দেখুন। মনে মনে ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি প্রকাশ করিলাম—দীনদয়াল খেতাবটি কি সোজা ব্যাপার! মিস্ Xএর উপস্থিতিতে হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলাম। প্রকাশ্যেই ধন্যবাদ দিয়া ফেলিতাম, কিন্তু তিনি ক্লাস ফাঁকি দিয়া আসিয়াছেন। কর্ত্তব্যবোধ বাধা দিল—মুখের এক দিকে কপট কোপ অপর দিকে হাসির আভাষটুকু মাত্র রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখন এলেন কেমন করে?

শ্রীযুক্তা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিলেন না। মিস্ Xকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। আপনি বাঁচিলে বাপের নাম—শ্রীযুক্তার কবল হইতে রক্ষা পাইবার আশা প্রায় সম্ভব হইয়াছে, ভাবিতে পারাটাই তখনকার মত মস্তবড় সান্ত্বনা। আমি কর্তব্যের কথা ভুলিয়া সস্নেহে একটা চেয়ার তাঁহার সামনে ধরিলাম। মিস্ X ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, তা দেখুন, শিকারে এই শাড়িটা চলবে তো?

দোল খেলিবার সময় বেরসিক দল যেমন নোংরা অথবা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকে, মিস্ Xও ঐ রকম একটা বাতিল কিছু লইয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া শাড়িটা দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। না দেখিয়াই বলিলাম, চলবে চলবে, খুব চলবে। মিস্ X বলিলেন, ওমা, সে কি! দেখুন—শাড়িটা যে এখনও প্যাকিংয়ের ভিতর রয়েছে, আপনি দেখলেন কি ক'রে? দেখুন। কাল কিনেছি শিকারে যাবার জন্যে। শিকার দেখিবার জন্য নতুন শাড়ি কিনিয়াছেন? প্রথমটা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। গঠন তাঁহার ছাঁচে-ঢালা আধুনিক তন্বীর। গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া দাঁড়াইতেই মনে হইল, একটি চাঁচাপোঁচা মোটা লতা, ঝুলিতেছে না, অস্বাভাবিকভাবে মাটি হইতে হেলিয়া দুলিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ক্লাস ফাঁকি দিলেও মনোভাব কিঞ্চিৎ নরম হইয়া আসিল। আমি বাণ্ডিল খুলিতে বলিলাম। টিস্যু কাগজে মোড়া বাণ্ডিল উন্মুক্ত হইতেই শাড়ি ছাড়া আর একটি বস্তু প্রকাশিত হইয়া পড়িল—একটি নয়া ধরণের ব্লাউস। পরিলে কিরূপ দেখাইবে বলিতে পারি না, তবে জামার কাট হইতে অনুমান করিলাম, স্কন্ধের নিকট গোদজাতীয় কোনও ব্যাধি হইলে ব্লাউসটি পরার সার্থকতা থাকে। কি উত্তর দিব ভাবিতেছি। প্রশ্নটার ভিতর ইচ্ছাকৃত না হইলেও অস্বস্তিকর কটাক্ষ রহিয়াছে। জন্তুরা evolutionএর তাড়া খাইয়া আধুনিক পোশাকের রসগ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদের মত যথেষ্ট সভ্য হইয়া উঠিয়াছে কি না আমি জানিব কেমন করিয়া? আমি উত্তর করিলাম, শ্রীযুক্তা এদিক দিয়া আপনাকে সঠিক উত্তর দিতে পারিবেন। তিনি নানা দেশের আধুনিক ফ্যাশানের খবর রাখিয়া থাকেন—বুনোদের আর্টও আজকাল পাকা দেওয়ালে গোবর লেপিয়া প্রচার করা হইতেছে simplicityর আদর্শ হিসাবে। এ খবর শ্রীযুক্তাই দিয়াছেন, বুনোদের পোশাকও অনেক মেয়েরা শখ করিয়া পরিতেছেন। একেবারে simple, ঢাকাঢাকির কোন বালাই নাই।

শ্রীযুক্তা কান খাড়া করিয়া কথাটা শুনিয়াছিলেন। খোসামোদটা তাঁহার নিশ্চয় ভাল লাগিয়াছিল। তাহা না হইলে গাছে-উঠা ভাব কাটাইয়া শাড়ির ভাঁজগুলি শান্ত করিয়া লইলেন কেন? কোমরের কড়া বাঁধন শ্লথ হইতেই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম—ফাঁড়াটা বোধ হয় এইবার কাটিল। দীনদয়াল যখন সুযোগ পাঠাইয়াছেন, তখন ছাড়া নয়—আমি পুত্রকে বলিলাম, চল নীচে যাই, আপিস বন্ধ হ'লেই টারগেট করা যাবে—কাল শিকারে যাচ্ছ, আজ একটু নিশানা ঠিক ক'রে না নিলে চলবে কেন?

পুত্র আমার ছোটখাট ভাষাতত্ত্ববিদ্, তিন চারিটি ভাষার সপিণ্ডকরণ করিয়া সে পাত্রের উপযুক্ততা হিসাবে সুবিধামত মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। রাগিয়া গেলে চিঁচিঁ (ট্যাঁস) ভাষার সংমিশ্রণে কোপ প্রকাশ করা তাহার অভ্যাস। একরাশ চিঁচিঁ, তামিল ও বাংলা শব্দের সপিণ্ডকরণ করিয়া বলিল, মা আমাকে বকলেন কেন?

ভাবিলাম, চীৎকার করিয়া বলি, ওরা বকতে না পেলে হাঁপানী রোগ চেপে ধরে! আর অনেক কিছুই বলিবার আছে এবং বলিতে চাই, কিন্তু বলা হয় কই? মনে যাহাই থাকুক প্রকাশ্যে পুত্রকে বলিলাম, ছি, মাকে কিছু বলতে আছে? মা বকেছেন তো কি হয়েছে, চল, তোমাকে একটা নতুন বন্দুক কিনে দেব। প্রতিশ্রুতিটা বেফাঁস বাহির হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্তা পুত্রকে ধমক দিয়া বলিলেন, এই সেদিন তোমাকে বন্দুক কিনে দেওয়া হ'ল না? ছেলে জানিত, বাবা প্রতিশ্রুতি দিলে তাহা রাখেন। সে পরমানন্দে লাফাইতে লাফাইতে নীচে নামিয়া গেল।

কোথায় টারগেট অভ্যাসের অছিলায় সরিয়া পড়িব ভাবিতেছিলাম। ঘটিল ঠিক বিপরীত। আমি দুইটি পাস-করা মার্জ্জিত মহিলার সামনে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া গেলাম। হিংস্রপ্রকৃতির সরল উচ্ছ্বাস যখন মার্জ্জিতরা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন ভূমিকম্প, ঝটিকা, প্রলয় সব কিছুই ঘটিতে পারে। না ঘটিলে ভবিষ্যতে অধিকতর বিপদের আশঙ্কা মাথায় লইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। আমি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্তা মিস্ Xএর শাড়ি ও ব্লাউজের প্রশংসা-কীর্ত্তন সারিয়া লইলেন। আমি জানিতাম, শ্রীযুক্তা যাহা বলিলেন, তাহার একটি কথাও সত্য নয়—মনে মনে কালার (colour) হারমনি সম্বন্ধে যে সব ত্রুটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা মিস্ Xএর অনুপস্থিতির সুবিধা পাইলেই আমাকে বলিবেন। প্রশংসার বিশেষণগুলি নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। আমিও অভ্যাসমত প্রস্তুত হইতেছিলাম পরের ঘটনার জন্য। শ্রীযুক্তা সব কাজই methodically করিয়া থাকেন—প্রশংসা শেষ করিয়া আমাকে ধরিলেন—ছেলেকে নষ্ট করিবার আমি কতরকম নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছি তাহারই একটি অতি দীর্ঘ তালিকা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিক দিয়া শ্রীযুক্তার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তালিকার মধ্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন, যাহার সহিত আমার কোন কালে যোগ ছিল বলিয়া মনে পড়িল না। মনে না পড়ুক, শ্রীযুক্তার স্মরণশক্তির উপর কটাক্ষ করিবার সাহস আমার নাই। নীরব ভাষায় মানিয়া লইলাম সংসারে সব রকম দুর্ঘটনার জন্য আমিই দায়ী।

বাক্যবাণে ঘায়েল হইতেছিলাম—ঠিক মরি নাই। শ্রীযুক্তা খানিকটা দম লইয়া বলিয়া চলিলেন, তোমার জন্যে আমাদের কপালে আরও দুঃখ আছে। এই যে যন্ত্রটা কিনেছ, এটা কি পাম্প? পাঁচজন লোক না হ'লে জল ওঠে না!

আমি উত্তর করিলাম, ওটাকে তো পাম্প ব'লেই জানি এবং পাঁচজন লোকের সাহায্যেই যন্ত্রটা চলার কথা। শ্রীযুক্তার দন্তঘর্ষণের শব্দ শুনিলাম এবং বুঝিলাম, এবার বারুদে আগুন

লাগানো হইয়াছে। পাম্পের হাতলটা আবার একলা নাড়িবার চেষ্টা করিলেন। হাতল নড়িল না, তিনি আমার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুমি না হ'লে এমন যন্ত্র আর কে কিনবে! যাই হোক, এখন এটাকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত কর। মাথা নত করিয়া আদেশ মানিলাম। অন্তরটা ত্রাহি মধুসূদন করিতেছিল। পাম্পের বন্দোবস্তের জন্য এক পা এক পা করিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমার গতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্তা দৃঢ় আদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন—কোথায় চলেছ? থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমি উত্তর করিলাম, কোথাও না, পাম্পটার ব্যবস্থা হ'লে ভাল হ'ত না—

মনে মনে ভাবিতেছিলাম, কি কুক্ষণেই যন্ত্রটা কিনিতে গিয়াছিলাম! মনের অবস্থাতে মুখের উপর একটু কাঁচুমাচুভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা এড়াইতে পারে নাই। তিনি জাঁদরেল পিসীমার মত গুরুগম্ভীর গলায় বলিলেন—এখনি কর। তাহার পরই বলিলেন, তোমার খরচে হাত, দেখো যেন অকারণ বেশি টাকা না লাগে। কারণ চোখের সামনে বিদ্যমান, তথাপি বলিতেছেন, অকারণ বেশি টাকা যেন না লাগে!

লরির ব্যবস্থা হইয়াই ছিল, একটি নিরীহ মিথ্যার আশ্রয় লইলাম—হাসিয়া বলিলাম, আরে ছ্যা, তুমি ভেবেছ আমাকে একটা ড্রাইভার ঠকিয়ে দেবে—কয়েক টাকায় সব ঠিক হয়ে যাবে। পঞ্চাশ মাইল বৃহৎ লরির চাকা চলিলে কত টাকা লাগে, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন। চাকার চলন্ত গতির বিনিময়ে যাহা খরচ হইবে, তাহার সংখ্যা এখানে লিখিলাম না। মাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমার অনেক খ্যাতিই আছে। সুযোগ পাইলে শ্রীযুক্তা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। শ্রীযুক্তার নিকট মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়া যদি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পাই তো মিথ্যাবাদী কেন সাধুবাবা অথবা দেড়ে আচার্য্য হইতেও আপত্তি নাই। কিন্তু আপনারা (পাঠকের দল) যেন আমাকে একেবারে অধার্ম্মিক ভাবিবেন না। আমি বুনো হইলেও কতকগুলি সদ্‌গুণ এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছি—হলফ করিয়া লিখিতেছি, সেগুলি প্রাচীনদের মতে সদ্‌গুণ। প্রগতির যুগ হয়তো তাহা মানিবে না। তা না মানুক, আমি তথাপি বলিব আমার অনেক সদ্‌গুণ আছে। আত্মপ্রশংসা নিজে করিবার উপায় নাই—নম্রতার আইন খোঁচা মারিয়া বসিবে, সেই কারণে নিজ গুণ কীর্ত্তনে বিরত হইলাম এবং তারই শরণাপন্ন হইয়া পাশ কাটাইলাম। প্রথম দুই চারিটি ধাপের পর কি ভাবে নামিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা এখানে দিবার চেষ্টা করিব না।

পরের দিন শনিবারের বারবেলা যখন জমকালো হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় আমরা শিকারে বাহির হইলাম। উত্তেজনা দেখিলাম মিস্ Xএর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শহরের সীমানা পার না হইতেই তিনি গুন গুন করিয়া গান ধরিলেন। কি সুর বলিতে পারি না। গানের শব্দগুলি কোন্ বু ভাষায় তাহাও ঠিকঝিতে পারিতেছিলাম না। হেঁচকি, কাসি, গলা-খাকরানি

ও বিচিত্র সুর মিলিয়া যে তান শুনিতেছিলাম, তাহাকে ছ্যাঁচড়া গজ্‌লী কীর্ত্তন বলিলে সুরের একটি নূতন নামকরণ হইতে পারিত। Originalityর জন্য সুরস্রষ্টা বাহবাও পাইতেন। কিন্তু মিস্ X বলিলেন, কি সুন্দর কথাগুলো বলুন তো! যা হোক সুর বলেন নাই ইহাই রক্ষা। ফার্‌সি, বাংলার ও গেঁয়ো শব্দের যোগাযোগে যে ভাষা তৈয়ারি হইয়াছিল, তাহার মানে বুঝিবার ক্ষমতা আমার মত বেচারা লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি মাথা নাড়িয়া তাঁহার মত সমর্থন করিলাম। মত সমর্থন করিয়াই ভাবিলাম, আবার একটা বেঁফাস মন্তব্য বাহির হইয়া গেল। কি জানি প্রশংসা শুনিয়া যদি আর একটা গান ধরিয়া দেন! অনন্যোপায় হইয়া আমি মোটর-ড্রাইভারকে ধমক দিয়া অনবরত ভেঁপু (মোটর-গাড়ির হর্ন) বাজাইতে বলিলাম, একে Black Out আছে, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে—সামনের লোক দেখা যায় না, বাবু ভেঁপু না বাজাইয়া গাড়ি চালাইতেছেন, দেখ না এখুনি একটা একসিডেন্ট (accident) করিয়া বসিবে। ড্রাইভারের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া যত না হোক, ভেঁপুর আওয়াজে গান শোনার বাধা সৃষ্টি হইতেছিল। শ্রীযুক্তা বলিলেন, এমন করে হর্ন টিপলে গান শোনা যায়?

কতকগুলি হেঁচকি ও কাসির শব্দ বামাকণ্ঠ হইতে নির্গত হইলেই তাহা সঙ্গীতের কোঠায় পড়ে, আমার জানা ছিল না। আমি আগের মত ধমক দিয়াই বলিলাম, তুঝে একদম্ রেহুদ্দা, বিবি গানা গয় রহেঁ হেঁ, আউর তু—। ড্রাইভার বলিল, হুজুর, মাফ কিজিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ভালরকম বক্‌শিস্ দিব ঠিক করিয়া ফেলিলাম। আমি হুজুর কথাটা শুনিতে বাস্তবিক খুব ভালবাসি, বিশেষ করিয়া তৃতীয় ব্যক্তি অথবা শ্রীযুক্তার সামনে হইলে তো কথাই নাই। এই কারণে সাদা চামড়াওয়ালা মোড়ের সার্জেণ্টগুলাকে বৎসরে মোটা টাকা বক্‌শিস্ দিয়া থাকি। মোড়ের নিকট আসিলেই আমাকে একটা সেলাম ঠুকিয়া দেয়। গাড়ি সার্জেণ্টকে অতিক্রম করিলেই আমি আড়চোখে দেখিয়া লই—খাস সাহেবের কায়দাদুরস্ত সেলাম মাঠে মারা গেল না তো? অধিকাংশ সময়েই হতাশ হইয়া যাই—যাহারা সাহেবের সেলাম দেখে তাহারা নয় কুলী, নয় পানওয়ালা, একটিও চেনা লোক নয়। সাদা চামড়াওয়ালা সার্জেণ্টগুলা আবার সময় বুঝিয়া সেলাম বন্ধ করিয়া দেয়। আমার পাশে কোন সাহেবের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইলে সেলাম তো দেয়ই না, অধিকন্তু অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া থাকে—আমি তখন ভাবিতে থাকি, প্রতি সার্জেণ্ট-পিছু করকরে দশ দশটা টাকা জলে গেল!

মিস্ X এবার তাড়া করিয়া গান ধরিলেন রবীন্দ্রনাথের নয়, নজরুলের নিজস্ব গজল নয়, একেবারে আধুনিক—সিনেমার হাঁপানী ও ক্রন্দন। এমত অবস্থায় পড়িলে সঙ্গীতের সূক্ষ্ম রস-গ্রাহী বলিত—ধরণী দ্বিধা হও। আমি সঙ্গীতজ্ঞ নই, তথাপি কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুকে sincerely অনুরোধ করিলাম, কর্ণ বধির করিয়া দাও। কর্ণ বধির হইল না। শ্রীযুক্তার অনুরোধে

গান শুনিতে শুনিতে গাড়ির ঝাঁকুনির আওয়াজ ভোগ করিতে লাগিলাম। লিখিতে ভুলিয়াছিলাম, আমি যে দিকটায় বসিয়াছিলাম, সেইদিকটাতে আবার Solid টায়ার লাগানো হইয়াছিল —জোড়ের স্থানে ফাটিয়া গিয়া বেশ খানিকটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে—সেই কারণে ঝাঁকুনিটা systematically হইতেছিল, সুরের তালটাও automatic হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় শ্রীযুক্তা উচ্চগলায় বলিয়া উঠিলেন, গেল গেল, সব গেল—নাইটগাউন, মিষ্টিটিষ্টি সব ভেসে গেল —পা তোল, পা তোল! কথার সহিত আচমকা একটি কুনুইয়ের গুঁতাও ব্যবহার করিতে ভুলিলেন না। গুঁতা মারিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না—বলিয়া চলিলেন, তোমার জ্বালায় আর কদিন বাঁচব? এইটুকু তো জায়গা, কি রকম বাবু হয়ে বসেছেন দেখ না! পা কোন্ দিকে তুলিব এবং কেমন করিয়াই বা তুলিব, তাহার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। তিনজনের চাপে এমনভাবে কোণঠাসা হইয়াছিলাম যে নড়িবার স্থান ছিল না।

এ অবস্থায় দুর্ঘটনার কারণ আমি হইলাম কেমন করিয়া? গোড়ালি পর্য্যন্ত জল উঠিতেই বুঝিলাম ঘটনাটি তুচ্ছ নয়। একটি বড় রকমের জলপাত্র হয় কাত হইয়াছে নয়তো ভাঙিয়াছে। আসলে মিস্ Xই ঘটনাটি ঘটাইয়াছিলেন। গানের সহিত পা দিয়া তাল রাখিতেছিলেন—অর্থাৎ হাইহীলের ঠোক্কর, অনবরত পদতলে গোপনে রক্ষিত কুঁজার উপর পড়িতেছিল। উঁচুনীচু মেঠো রাস্তায় ট্যাক্সির হেঁচকা জোরে লাগায় তাল ওজনে ভারী হইয়া গিয়াছিল—ফলে একটি কুঁজা ভাঙিল, আমি কুনুইয়ের গুঁতা খাইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ফিলটার-পাম্প তো সঙ্গেই ছিল, তাহার উপর দুই কুঁজা জল লওয়া হইল কেন? জিজ্ঞাসা করিয়াই মনে হইল, ঠিক এই সময়টিতে প্রশ্নটা না করিলেই ভাল হইত। লাঞ্ছনা কপালে থাকিলে, তাহা রদ করিবে কে? শ্রীযুক্তা উত্তর করিলেন, থাক থাক, এখন আর বুদ্ধি বার করতে হবে না—তোমার ওটা পাম্প, না ছাই। ধর, যদি কল না চলে তখন কি হবে! বুদ্ধি যেটুকু পড়িয়াছিল, তাহাই আমাকে নির্ব্বাক করিয়া দিল। বুদ্ধি নাই কেন? আমি মানুষ নই বলিলেও অধিক মাত্রায় দুঃখ পাইতাম না। চৌদ্দ বৎসর বিবাহ করিয়াছি এবং এই দীর্ঘকাল সরকারের উচ্চপদস্থ গোলাম হইয়া জীবন যাপন করিতেছি। বাহিরের চামড়া হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরের হৃদয়ে পর্য্যন্ত কড়া পড়িয়া গিয়াছে—কড়া কেন বলি, অসাড় হইয়া গিয়াছে, মারিলেও লাগে না। থেঁতলাইলেও বুঝি না, কেবল চাকরি আর পোষা হাস্‌ব্যাণ্ডের অস্তিত্বটা বজায় আছে মনে করিতে পারিলেই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হই। ক্রমে আমরা বাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারধারে ঘোর অন্ধকার। বারান্দার এক কোণে মিট মিট করিয়া একটি কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। বারান্দায় উঠিয়াই দেখিলাম, সেই ফিলটার-পাম্পটা, চাকরদের ভিতর কেহ চোখের সামনে রাখিয়া দিয়াছে।

চক্ষুঃশূল এই যন্ত্রটি দৃষ্টিগোচর হইলেই এখন মনে হয়, উহা একটি মূর্ত্তিময় অভিশাপ।

গাড়ি হইতে মাটিতে পদার্পণ করিয়াই মিস X বলিলেন, ব্লাঃ, কি চমৎকার দেখুন। চারধারে জমাট অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু নাই। উহা ভেদ করিয়া তিনি কি দেখিলেন অন্তর্য্যামীই জানেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি থাকা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তিনি নিজে আলোকপ্রাপ্তা। অন্তর দীপ্ত হইয়া উঠিলে তাহার রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি থাকিতে পারে!

ফিলটারের পাশেই আর একটি বিরাটকায় যন্ত্র রাখা হইয়াছিল—ভোজরাজের বাতি (Wizard's lamp)। কষিয়া হাওয়া পুরিতে পারিলে রাত্রিতেও দিনের আলোর মত দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দুইটি পিয়ন এই যন্ত্রটিকে জ্বালাইবার জন্য আমরা আসিবার পূর্ব্ব হইতেই প্রাণপণ চেষ্টা চালাইয়াছে। ভোজরাজের বাতি নানারকম ফোঁসফাঁস শব্দ করিতেছে, কিন্তু জ্বলিতেছে না। মনে মনে ভাবিলাম, মিস X যাহাই দেখুন, আমি অন্ধকারের জীব অন্ধকারেই থাকিয়া যাইব। শেষ পর্য্যন্ত বাতিটা জ্বলিবে না। কিন্তু আমার মনে রাখা উচিত ছিল—মানুষের চেষ্টায় অসাধ্যও সাধন হইয়া থাকে। বাতি জ্বলিল, উনুনে পাথুরে কয়লা ধরিবার আগে যে ভাবে ধূম উদ্গীরণ হইতে থাকে, সেইভাবে ধুঁয়াও থাকিয়া গেল। বাতি শুধু নিজে জ্বলিল না, শ্রীযুক্তাকেও জ্বালাইয়া দিল, তিনি ধূম উদ্গীরণ দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন। তাহার পর তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্ট ভাষায় আমাকে বুঝিতে বলিলেন যে, এই আলো ঘরে রাখিলে সকলকে Oxyzen বাদ দিয়া নিশ্বাস লইতে হইবে, সোজা কথায় কাহাকেও বাড়ি ফিরিতে হইবে না। বেগতিক দেখিয়া তাঁহার মতেই মত দিলাম এবং পিয়নকে আদেশ করিলাম আলোটা বাহিরেই রাখিয়া দিতে।

ফল ভাল হইল না। ইহাতেও তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বেশ মজার লোক তো তুমি! ঘরে আলো না থাকলে আমরা নড়ব চড়ব কেমন ক'রে? নড়াচড়া যে আলোকপ্রাপ্তাদের পেশা নয়, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতাম; কিন্তু এত বড় নিছক সত্য প্রকাশ করিতে সাহস পাইলাম না। জঙ্গলে বৈদ্যুতিক টর্চ খারাপ হইয়া গেলে মোমবাতি ব্যবহার করিব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুইটিই পকেটে ছিল, তখনকার মত রক্ষা পাইবার আশায় বাতি দুটি তাঁহার করকমলে অর্পণ করিলাম। তিনি গস্ গস্ করিতে করিতে বাতি জ্বালিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ইতিমধ্যে একটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। পুত্র বন্দুক চালনায় বয়সের তুলনায় অধিক পাকিয়া গিয়াছিল। নূতন Air Rifle লইয়া এটা সেটা মারিতে মারিতে সাদার উপর কাল bull's eye দেখিয়া ফেলিল। বাংলোর মালীর রং আমা অপেক্ষা কালো অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য বেচারা একটি ধপধপে সাদা কাপড় পরিয়া আসিয়াছিল। সাদা কাপড় পরিয়াছিল ভালই করিয়াছিল, কিন্তু ছিদ্রযুক্ত কাপড় পরিবার জন্য তাহাকে কে

মাথার দিব্য দিয়াছিল! ঘূর্ণমান ভাগ্যচক্রের প্রকোপে আমার পুত্র ঐ ছিদ্রটিকে বুলস্ আই (bull's eye) দেখিল। যেমন দেখা, অমনি টিপ করা, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া টিপিয়া দেওয়া। লোকটা "বাপ রে" বলিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া দেখিলাম, পুত্রের নিশানা অব্যর্থ হইয়াছে। জানুর উপর ছিদ্র, তাহারই ঠিক মধ্যস্থল ভেদ করিয়া ছররা ঢুকিয়া গিয়াছে। প্রমাদ গণিলাম। শিকার মাথায় উঠিয়া গেল। মালী নালিশ করিলে ছেলেটাকে Juvenile Courtএ ধরিয়া লইয়া যাইবে। অত্যুচ্চ পদমর্য্যাদা ভুলিয়া মালীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিলাম, একতাড়া নোট ঘুস দিলাম। নোটগুলি হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়ায় মনে হইল তাহার বেদনার কতকটা উপশম হইয়াছে। প্রথম ধাক্কা সামলাইতেই ভবিষ্যতের কথা মনে আসিল। ছররা না বাহির করিতে পারিলে সেপ্‌টিক হইয়া যাইতে পারে এবং সেপ্‌টিক হইলে শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া যাওয়াটাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

টর্চ (torch) লইয়া ক্ষতস্থানটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করাতে বুঝিলাম, ছররা বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। তলা হইতে টিপিয়া টিপিয়া উপরের দিকে গুলিটাকে তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কোন ফল হইল না—অবশেষে বুদ্ধি জোগাইল। ড্রাইভারের নিকট হইতে বল্টু-আঁটা বড় প্লায়ারস্ (pliers) চাহিয়া লইলাম। লৌহযন্ত্রের রাম চিম্‌টিতে কাজ হইল—গুলিটা চামড়ার নিকটে দেখিতে পাইলাম, একটা ছোট সন্না থাকিলে সহজেই বাহির করিয়া আনিতে পারিতাম; কিন্তু এখন পাই কোথা? বিপদে পড়িলে মাথাটা অনেক সময় খোলে ভাল। নীচের দিকে প্লায়ারস্ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উপর হইতে একটি দিয়াশলাই-কাঠির উল্টা দিক গর্ত্ত-স্থানটিতে প্রবেশ করাইয়া দিলাম। তাহার পর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বহু চেষ্টায় ছররাটি বাহির করিয়া আনিলাম। গুলি তো বাহির হইল, কিন্তু সীসার বিষ তো সোজা বিষ নয়, টিন্‌চার আইডিন লাগানো একান্ত দরকার। শিকারে বাহির হইলে আমি পকেটেই এ সব সরঞ্জাম রাখিয়া থাকি। ঔষধটি বাহির করিয়া যেই দুই ফোঁটা ফেলিয়াছি, অমনি বেটা হাউমাউ করিয়া উঠিল। আমি রীতিমত রাগিয়া তাহাকে ধমক দিলাম। চেঁচামেচির কারণ শ্রীযুক্তা জানিতে পারিলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়িবে, এমনই তো লোকটাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি; তাহার উপর পুত্রকে পথভ্রষ্ট করিবার হেতু হইয়া লাঞ্ছনাকে ডাকিয়া আনি কেন! পুনরায় মালীর হাতে মাথায় হাত বুলাইয়া ঠাণ্ডা করিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই শ্রীযুক্তার অজ্ঞাতে সারিয়া ফেলিলাম। তাহার পর তখনকার মত পুত্রের হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইলাম।

একটু সুস্থ ভাব আনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় দূরে শুনিলাম ছেলেদের দল এক যোগে চীৎকার করিয়া It is a long way to Tipparary গান ধরিয়াছে। বাংলো হইতে জঙ্গল বেশি দূর নয়। এইরূপ চীৎকারের পর শিকারের ফলাফল কি হইবে সহজেই অনুমান

করা চলে। ছেলেদের যৌবন ভিতরে টগবগ করিতেছিল। এই বয়সের মন জ্বালাইয়া ফুটাইয়া কল্পনার নির্য্যাস বাহির করিয়া থাকে, কোথায় টিপারারি আর কোথায় একটি অখ্যাত ভারতীয় জঙ্গল। স্বপ্নবিলাসীর দল ভাবিল ভারতের একটি অখ্যাত জঙ্গলকে টিপারারি! শুধু ভাবিলে কোন ক্ষতি ছিল না। চীৎকার করিয়া বনের জন্তুগুলাকে জানাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিল কি কারণে? এই জাতীয় ঘটনার জন্য কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিলাম। তথাপি ভাল করিয়া দমিয়া যাইতে লাগিলাম। "পথি নারী বিবর্জ্জিতা" কথাটার ভিতর যে কত বড় সত্য রহিয়াছে, তাহা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্তা সঙ্গে না থাকিলে ডেঁপোর দল আমার সহিত আসিতে পারিত? সুশীল ছোক্‌রা আবার বিলাতী গানের সহিত বাঁশীতে একটা ভীমপলশ্রী রাগিণী ধরিয়াছে। কান পাতিয়া শুনিলাম, বেশ লাগিতেছিল—আতঙ্কও ছিল কি জানি নূতনের লোভে যদি টিপারারির সহিত হারমনি (harmony) করিবার চেষ্টা করে।

অল্প সময়ের ভিতর গরুর গাড়ি বারান্দার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সুশীল ছোক্‌রা ছাত্র হিসাবে ভালই, কিন্তু অধিক মাত্রায় ডেঁপো—সে যেন দূর হইতেই আমার ফ্লাস্কটির প্রতি তাগ করিয়াছিল। গাড়ি হইতে নামিয়াই বলিল, সার্, বড্ড জল তেস্টা পেয়েছে, আপনার ফ্লাস্ক থেকে একটু জল দিন না।

মনে মনে ভাবিলাম—আহা বাছারে, অনুরোধে আপ্যায়িত হইয়া গেলাম আর কি! হিন্দু বাড়ির ছেলে—সংস্কার ঘাড় চাপিয়া ধরিল—তৃষ্ণার্ত্তকে জল না দিয়া পারিলাম না।

ছেলেটা শুধু ডেঁপো নয়, একেবারে ঘুঘু মার্কা, এক ঢোকে সমস্ত জল নিঃশেষ করিয়া বিনা বাক্যে গেলাসটি আবার আমার সামনে ধরিল। গেলাসের আকৃতি একটি সাধারণ কালির দোয়াত অপেক্ষা বড় নয় সুতরাং এক চুমুকে যে জল পাত্রটি নিঃশেষ করা যায়, জানি; কিন্তু শিকারে জল খাওয়ার নিয়ম তো ঐ রকমের নয়! কেবল টাগ্‌রা ভিজাইয়া জলপূর্ণ পাত্রটি দেখিতে হয়। ছোক্‌রা যে ভাবে কৃপাপ্রার্থী হইয়া গেলাসটি ধরিয়াছিল, তাহাতে 'না' বলিতে পারিলাম না। দিলাম আর এক গ্লাস—দ্বিতীয় গেলাসও এক চুমুকে শেষ করিয়া বলিল, আর একটু। আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম। সুশীলের সাহস দেখিয়া বোকা বামাপদ এক মুহূর্ত্তে চালাক হইয়া উঠিল। সুশীলকে একটা কুনুইয়ের গুঁতা মারিয়া সামনে আসিয়া বলিল, সার্, আমাকেও একটু। কি করি, তাহাকেও এক পাত্র দিলাম। সেও সুশীলের পন্থা অবলম্বন করিয়া বলিল, সার্, আর একটু। ফ্লাস্কের তৃতীয়াংশ প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে। বামাপদ ক্লাস ফাঁকি দিবার একটি ওস্তাদ, বলিতে চাহিয়াছিলাম—কাজের বেলা কেবল ফাঁকি, এখন জল চাইছ কেন—তোমাদের নিজেদের ফ্লাস্ক কি হ'ল? বলিতে পারিলাম না। হাজার হউক আমি একটি সার্ ব্যক্তি। একটু দয়া না থাকিলে চলিবে কেমন করিয়া! বাধ্য হইয়াই তাহার অনুরোধ রাখিলাম। বোকা বামাপদ কাজ হাঁসিল করিয়াছে দেখিয়া খগেন মুরব্বীআনার চালে

আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বলিল, তা হ'লে আমাকেও একটু। ভাবটা বোকা যদি সারের কৃপার পাত্র হইতে পারে তো আমি হেন ছাত্র বাদ যাই কেন। খগেনের মুখের ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম—ছেলেটা ফ্লাস্ক কাড়িয়া লইবে না তো? আমি একটি কুস্তীগীর পালোয়ান, অথলে রোগী একটা চিমড়া ছোকরা, তাহাকে আমার ভয় কিসের—আমি বাঘ মারি, পল্টনের গোরার নাক থেঁতলাইয়া দিই, হিন্দু-মুসলমান রায়টের মধ্য দিয়া নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াই—আর সেই আমি কিনা—রূঢ় ভাবে বলিলাম, জল আর নেই, যেটুকু আছে তা শিকারের জন্য রাখতে হবে—তোমাদের নিজেদের জল কি হ'ল? খগেন সোজা দাঁড়াইয়া নির্লজ্জের মত বলিল, সেগুলো তো গাড়ির ভিতর রয়েছে।—গাড়িতে নিজেদের জল রহিয়াছে, আর আমারটা লইয়া টানাটানি?

আমি এবার সত্যই রাগিয়া উঠিলাম; একটু চড়া গলায় উত্তর করিলাম, তার মানে তোমাদের জল রয়েছে যখন, তখন আমার পাত্রটি খালি করার জন্যে সকলে মিলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ কেন? খগেন অতি সহজ ভাবে উত্তর করিল, তাতে আর কি হয়েছে সার্, সামান্য খাবার জল তো, একটুকু দিন না?

কি স্পর্দ্ধা, আমি যেন বাবুর ইয়ার! তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, জল না পাইলে সে নড়িবে না। ক্ষোভে উদার হইয়া উঠিলাম—রাগিয়া জলপাত্রটি সুধু খগেন নয় সকলের জন্য রাখিয়া স্থানটি পরিত্যাগ করিলাম। বন্দুকে গুলি ভরিয়া ফিরিয়া আসিতে যেটুকু সময় লাগিয়াছিল, ইহারই ভিতর দেখি, আমার জলপাত্রটি উল্টাইয়া সযত্নে কোন ছেলে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দিয়াছে। দুষ্টু ছেলেদের প্রাণ ভরিয়া অভিশাপ দিয়া শূন্য ফ্লাস্ক ছিপি আঁটিয়া পকেটে পুরিলাম।

শ্রীযুক্তা তখন আহারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। অন্ন পরিবেশনের পর জলের পালা আসিল। জল তো যে, সে জল নয়, একেবারে ফিলটারড্-ওয়াটার (filtered water)। শ্রীযুক্তা সকলের সামনেই আমার কানের অতি নিকটে মুখ আনিতে লাগিলেন। আচরণ অদ্ভুত লাগিতেছিল। ব্র্যাণ্ডি খাইলাম আমি, আর নেশা হইল শ্রীযুক্তার! তবে. কি এত লোকের সামনেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে—ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীদের দল, উহাদের সামনে—

বহুদিন বাদে যদি জুটিল তো প্রকাশ্যে আর গোপনে কি-ই বা যায় আসে! আমি প্রস্তুত হইয়া মুখটি বাড়াইয়া দিলাম, তিনি সম্মুখ দিকে না আসিয়া কানের দিকে মুখ লইলেন। কানের দিকটা আবার ন্যাচারাল নহে—কৌতুহল দমন করিতে পারিতেছিলাম না। তাড়াতাড়ি কানটাই তাঁহার নিকট আগাইয়া দিলাম।

শ্রীযুক্তা অতি নিকটে আসিলেন এবং প্রায় কর্ণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তোমার কল না ছাই—ওটা চলছে না, এখন লোকদের জল দেবে কেমন ক'রে? এই কয়টি কথা বলিয়া

আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন—আমি অত্যন্ত দমিয়া গেলাম—চরম উচ্ছ্বাসের এ কি নির্দ্দয় প্রতিদান! তাঁহার সাংঘাতিক চাহনিতে আমি প্রায় সম্মোহিত হইয়া পড়িতেছিলাম। বাঘিনীর চোখে আলো পড়িলে এই ভাবেই জ্বলে বটে—কালবিলম্ব না করিয়া অধিক পরিমাণে নিট ব্র্যাণ্ডি শ্রীযুক্তাকে দেখাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। আহা পাশ্চাত্ত্য সুরার ক্রিয়াই আলাদা—গলা হইতে বুক পর্য্যন্ত তীব্র জ্বালার ঝাঁকুনি খাইলাম। তাহার পরই তেজীয়ান হইয়া উঠিলাম। Inner man ধমক দিয়া বলিল—কাপুরুষ! যে লোক হাঁটিয়া বাঘ মারে তাহার শ্রীযুক্তাকে ভয় কিসের? আমি গম্ভীর গলায় ধীরভাবে উত্তর করিলাম, কল খারাপ হয়েছে বাঁচা গেছে, পাতকুয়া থেকে জলের ব্যবস্থা কর।

শ্রীযুক্তা আমার উক্তি শুনিয়া 'অ্যাঁ' বলিয়া মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। আমি আরও জোর দিয়া বলিলাম, ও সব চলবে না। হিস্‌টিরিয়ার ফিটস্ এলে প্লায়ারস দিয়ে চিমটি কেটে দেব। পাতকুয়া থেকে জল আনতে বল। শ্রীযুক্তার হিস্‌টিরিয়ার ফিটস্ মাঝপথে বাধা পাইয়া থমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। শ্রীযুক্তা আমাকে তুচ্ছ ভাবিলেও মদকে গোখুরা কেউটের মতই ভয় করেন, এবং ততোধিক ভয় করেন মদ যে খায় তাহাকে। স্বচক্ষে দেখিয়াছেন আমি মদ খাইয়াছি—সুতরাং আমি যে মাতাল হইয়াছি সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মাতাল না হইলে শ্রীযুক্তাকে আমার মত ঘায়েলড্ হাস্‌ব্যাণ্ড আদেশের সুরে কথা বলিতে পারে? আর কিছুক্ষণ আমার সামনে থাকিলে অপমানিত হইবার- সম্ভাবনা থাকায় আমাকে ছাড়িয়া কলটার দিকে অগ্রসর হইলেন। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়ির পর নিশ্চিন্ত হইলেন, কলটা সত্যই বিগড়াইয়াছে। তখন আড়াল দিয়া বাড়ি হইতে আনা কুঁজাটি কোমরভাঙা অবস্থায় খাটের তলায় লুকাইয়া রাখিলেন। বৃহৎ একটি কুঁজা কত আর আড়াল দেওয়া চলে। আমি তাঁহার কীর্ত্তি সবই দেখিলাম। আড়ালের ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল না। পুত্রকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া কানে কানে কি বলিলেন। পুত্র দেখিলাম, মাথা নাড়িয়া তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে। মাতাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, পুনরায় দারুণ ভাবে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—পুত্র তাঁহার মত সমর্থন করে নাই নিশ্চয় তবু বাধ্য হইয়াই মানিল, দেখিলাম, জল খাইতেছে, তৃষ্ণা নাই, প্রয়োজন নাই, উদরে স্থানাভাব সত্ত্বে জল খাইয়া চলিয়াছে। পুত্র যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দেখি তাহার পেটটি বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। পুত্র আসিলে মিস্ Xকে ডাকিলেন। তাহার পর তাঁহার অতি নিকটে গিয়া কি বলিলেন। হয় তো পুত্রকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি। গোপনে জল খাওয়ার ব্যাপারটা আগেভাগেই সারিয়া লইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন আমাদের সহিত বসিলেন, তখন দেখিলাম, আমাদের জলপাত্রগুলি সামনে সাজানো থাকিলেও তাহাতে জল নাই।

আমি বেপরোয়া হইয়া চাকর ও পিয়নদের পাতকুয়া হইতে জল আনিতে বলিলাম।

আমরা পাতকুয়ার জল খাইতে বাধ্য হইয়াছি দেখিয়া শ্রীযুক্তা ও মিস্ Xএর চোখে চাওয়াচাওয়ি হইয়া গেল। ভাবটা কেমন জব্দ, যেমন টাকাগুলো জলে ফেলেছ তেমনই পাতকুয়ার পচা জল খাও। জল আসিল—আমরা পরম পরিতোষের সহিত জল পান পান করিলাম। সকলেই বলিল, আহা কি মিষ্টি জল! জলপানে তৃপ্তি প্রকাশটি শ্রীযুক্তা নিশ্চয় প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার রন্ধন-শিল্পের অবশ্যপ্রাপ্য প্রশংসা জলের মিষ্টত্বের জন্য চাপা পড়িয়া গেল। শ্রীযুক্তা যেমন আড়চোখে চাহিয়া মিস Xএর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমিও তেমনই খাটের তলে কুঁজার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এই গরমে এক কুঁজা জল তিনজনে আর কতক্ষণ চালাইবে! কুঁজাটি শেষ হইলেই দেখিব, বীজাণুবর্জ্জিত জল পাও কোথা হইতে!

খাওয়া শেষ হইলেই ছেলেমেয়ের দল হুল্লোড়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আমিও শিকারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। রাত তখন দশটা হইবে। সন্ধ্যার মওড়া তো নষ্ট হইয়াছে, মধ্যরাত্রিতে যদি কিছু পাই।

বাহির হইয়া পড়িলাম, সঙ্গে লইলাম বামাপদকে, দুইটি রাইফেল ও অন্যান্য সরঞ্জাম। গরুর গাড়ি কঁ্যাচর ম্যাঁচর করিয়া চলিতে লাগিল। চাকার আওয়াজ ও গাড়ির সহিত সংযুক্ত হ্যারিকেন আলোটা আমার ভাল লাগিতেছিল না—এইরূপ আওয়াজ ও তৎসহিত আলোতে যে কোন জন্তু ভড়কাইয়া পালাইবে। খাওয়ার পর তিন মাইল পথ হাঁটিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না। এত লোক থাকিতে বামাপদকে সঙ্গে লইবার কারণ ছিল—প্রথম ছেলেটা বোকা, সেই কারণে খুব বাধ্য। শিকারে ডিসিপ্লিন বিশেষ প্রয়োজন, সামান্য শব্দ অথবা অন্যমনস্কতায় সব আয়োজন বিফল হইয়া যাইতে পারে। প্রায় ১১টার সময় আমরা গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে বসিবার স্থানটি দেখাইয়া দিতে বলিলাম। গাড়োয়ানকে পাইয়াছিলাম ভালই, সে গাড়িও চালায় শিকারের ব্যবস্থাও করে। ঝোপটি নিজে হাতে অপরাহ্ণে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

বসিবার জায়গা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আমাদের নিকটেই দুই তিনটি ট্র্যাকের সঙ্গমস্থল, জল খাইবার জায়গা মাত্র ওই পচা ডোবাটা। ঠিক হইয়াছে, বাছাধনরা যাইবে কোথায়! একাদশীর চাঁদের আলো অস্পষ্ট হইলেও জানোয়ার সামনে পড়িলে silhouette দেখিতে অসুবিধা হইবে না—অধিকন্তু নিশানার জন্য টর্চ তো আছেই। সব গুছাইয়া লইয়া গাড়োয়ানকে বাতি নিবাইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। বাতি নিবাইতে সে কিছুতেই রাজি হইল না—তাহার ত্রাসের কারণ আমি জানিতাম, কিন্তু অন্তরের শিকারী ঘোরতর স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পাওনার অধিক তিন টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইলাম—কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। গাড়োয়ান বলিতে লাগিল—সম্বর হরিণ বরাহ না হয় এড়াইলাম, কিন্তু চিতা কিংবা ভাল্লুক

আক্রমণ করিলে কি করিব—আলো আমার সঙ্গে রাখিতেই হইবে। নিরুপায় হইয়াই তাহাকে তাহার মতে চলিতে দিলাম। বদ্‌মাইসটা গাড়ি চালাইবার আগে মোটা ঘুঙুর গরুর গলায় বাঁধিয়া দিয়াছে। কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঐ শব্দের পর কোন্ জন্তু এদিকে আসিবে ? গরুর গাড়ির চাকা ও ঘণ্টার শব্দ অল্প সময়ের ভিতর দূরে মিলাইয়া গেল।

বামাপদকে বলিলাম, প্রথম রাতটা আমি ঝিমাইয়া লইব। তুইটার পর আমি জাগিয়া থাকিব, তখন সে ঘুমাইতে পারিবে।

এতখানি উত্তেজনা লইয়া আসিয়াছি, ইচ্ছা করিলেই কি ঘুমানো যায়! রাইফেলটা পাশেই ছিল, তুলিয়া লইয়া দূরে আনুমানিক জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিলাম—তৎক্ষণাৎ গুড়ুম শব্দের সহিত গুলি বাহির হইয়া গেল।

ট্রিগার (বন্দুকের ঘোড়া) যে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা মনেই ছিল না। দূরের পাথরটির এক দিক ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। টিপ সম্বন্ধে বেশ আনন্দ পাইলাম—কিন্তু আশেপাশের জন্তুগুলি যে সব পলাইল, তাহাতে আর দ্বিমত থাকিবার কোন অজুহাত রাখিলাম না। মনটা খারাপ হইয়া গেল—ইহার পর যে কোনও শিকার পাইব না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম।

বন্দুক রিলোড করিয়া একটু আরামে বসিব ভাবিতেছি, এমন সময় ঘড়র্ ঘড়র্ ফরর্ ফরর্ আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল, অতি নিকটে। বহুদিন ধরিয়া শিকার করিতেছি, কিন্তু কখনও কোনও জানোয়ারের আওয়াজ শুনি নাই। শব্দ একই ভাবে চলিয়াছে। ঠিক এই সময়টিতে শুনিতে পাইলাম, বামাপদ ঘুমন্ত অবস্থায় এবং অস্পষ্ট ভাষায় কি সব বকিয়া চলিয়াছে। আমি তাহাকে খুব জোরে চিমটি কাটিলাম—সে "অ্যাংয়" বলিয়া উঠিয়া বসিল—সঙ্গে সঙ্গে অজানা জন্তুর অদ্ভুত শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণে বুঝিলাম শব্দটি মানুষের উদরাভ্যন্তর হইতে আসিতেছিল—বামাপদ উঠিয়া বসিতে আমি তাহাকে বলিলাম, "এই তোমার রাত জাগা ! তোমার পেট গরম হয়েছে, কাল একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রো।"

বামাপদ অর্দ্ধঘুমন্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিল, বাঘ এসেছিল নাকি ? ছাত্র এবং বোকা না হইলে নিশ্চয় কিছু অপ্রিয় ভাষা ব্যবহার করিয়া ফেলিতাম। বলিলাম, বাঘ আসে নাই বটে, তবে নিকটে থাকিলে তোমার অজীর্ণতার জ্বালায় বহুদূর পলাইয়া বাঁচিয়াছে।

ইতিমধ্যে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যেটুকু চাঁদের আলো ছিল, তাহা মেঘাবৃত হইয়া ঘোরতর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। বামাপদকে ম্যাকিন্টস্‌টা দিতে বলিলাম—অম্লানবদনে বলিল, ভুলে গেছি সার্। কথাগুলির উচ্চারণ কেমন যেন জড়িত।

একটু পরেই অনুভব করিলাম, আমার বড় শিকারের কোটটায় টান পড়িতেছে, প্রথমে আস্তে তাহার পর মাঝে মাঝে হেঁচকা টান—ঠিক নেকড়ে যে ভাবে মাংস ছিঁড়িবার চেষ্টা করে

সেই ভাবে। কালবিলম্ব না করিয়া মুহূর্ত্তে রাইফেল লইয়া প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিলাম—রাইফেল বগলে বসাইবার আগে বোটের ধরিবার স্থানটি (বোট—টোটা বহনকারী রাইফেল সংযুক্ত কল) সজোরে বামাপদর কপালে ঠুকিয়া গেল—বিকট শব্দ করিয়া বলিল, উঃ! নরকণ্ঠ হইতে নির্গত 'উঃ' শব্দটির ফলাফল যে কি হইবে, তাহা ভাবাও শিকারীর পক্ষে কষ্টকর। ইচ্ছা হইতেছিল, একটি ঘুষি মারিয়া বোকা বামাপদর মাথাটা ফাটাইয়া দিই; কিন্তু ভবিষ্যতে আরও দুঃখ দিবার জন্য নিরস্ত হইলাম। ঘুষি খাইলে আসল চেহারার এমন বিকৃতি হইতে পারে, যাহাতে তাহার বিবাহ অনিশ্চিত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমার মারের অপেক্ষা আরও সাংঘাতিক মারের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। তাহাকে অভিশাপ দিলাম, শীঘ্রই যেন তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের অভিশাপ দিয়া দয়া আসিল; বন্দুক নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেছে? বামাপদ উত্তর করিল, হুঁ, বড্ড শীত করছে, কোটটা ছেড়ে দিন না সার্ গায়ে দি।

কি দুর্ভোগ, এতক্ষণ কোট টানিতেছিল বামাপদ! রাগ দ্বিগুণ মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। ঘোর অন্ধকার—কপালে হাত দিয়া স্থানটি ঠিক করিয়া একটি ওস্তাদি চড় কসাইব ঠিক করিলাম, যেমন ভাবা অমনই চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল।

বামাপদর কপালে হাত দিতেই ছ্যাঁক করিয়া উঠিল। ছেলেটার পুরাদমে জ্বর আসিয়াছে—একেবারে কচুরিপানার বীজাণু, প্রমাণ সহ আক্রমণ করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতেছিল, সার্, চেপে ধরুন, চেপে ধরুন, বড্ড শীত। কোট দিয়া তাহার দেহ ঢাকিয়া দিলাম। কি আর করি, রাইফেল নামাইয়া ছেলেটাকে চাপিয়া ধরিলাম—কাঁপুনি তাহার আর থামে না। এই ভাবে বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। আমিও কেমন কেমন বোধ করিতেছিলাম। শ্রীযুক্তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া গোড়া হইতে নিট ব্রাণ্ডি খাইয়াছিলাম। একে পরিমাপের মাত্রাধিক্য, তাহার উপর নিট—উভয়ের যোগাযোগে আমি, একটু কি বলে—কেমন কেমন বোধ করিতেছিলাম। বামাপদকে যখন চাপিয়া ধরিয়াছিলাম, সেই সময় কেমন কেমন ভাবটা গভীরতায় তলাইয়া লইয়াছিল। একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই মনে হইল, বামাপদ প্রাণপণ শক্তিতে তাহার গলা হইতে আমার হাত সরাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মাঝে মাঝে মানুষের দম বন্ধ হইবার মত আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি—ঘূর্ণিপাক খাওয়া মাথাটা কেন বলিতে পারি না গোঙানি শুনিয়া প্রায় ধাতস্থ হইয়া আসিতেছিল। নেশার ঘোরালো অবস্থার কথা চিন্তা করিতেই মনে পড়িল তন্দ্রাবস্থায় একটি মৃগকে গুলি করিয়াছিলাম, পা জখম হইয়াছিল—তথাপি খোঁড়াইয়া পলাইতেছিল। আমি রাইফেল ফেলিয়া মৃগকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং

গলা টিপিয়া কাবু করিবার চেষ্টায় ছিলাম। কেমন কেমন অবস্থায় বামাপদকেই যে মৃগ ভাবিয়া কাবু করিতেছিলাম, সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভুল রহিল না।

সম্পূর্ণ যখন উপলব্ধি করিলাম যে গলা টিপিয়া বামাপদকে অসাড় করিয়া দিয়াছি, তখন নেশা আমার ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পাশে বসিয়াই ভাবিতে লাগিলাম, ছেলেটা মরিয়াছে—এই কারণেই আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। শ্রীযুক্তার কথা মনে আসিল; মনে মনে বলিলাম, তোমার সাধ এইবার পূর্ণ হইবে। প্রাণ ভরিয়া ট্যাঁসী কায়দায় বাঁচিয়া থাকিও—আর আমি ক্ষীরের নাড়ু হাত দিয়া তুলিয়া লইতে আসিব না। জীবন্ত অবস্থায় যেরূপ ব্যবহারই করিয়া থাক, ফাঁসিকাষ্ঠে আমার প্রাণ-বায়ু নির্গত হইলে আমার আত্মার কল্যাণের জন্য সাক্ষী রাখিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিও। দোহাই তোমার, দুই ফোঁটার বেশি চাই না। সিনেমা-তারকারাও চলন্ত ছবিতে ফাঁকি ভালবাসার জন্য দুই ফোঁটার বেশি চোখের জল নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি আসল ভালবাসার জন্য কেবল দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিবে না? তুমি আমার জীবিত কালের স্ত্রী, দুই ফোঁটা জলের অনুরোধ রাখিবে না? প্রেতলোকে পৌঁছাইলেও স্ত্রীলোকের মনের কথা জানিতে পারিব না, দুই ফোঁটা জলের দ্বারা শোকাতুরার demonstration রেকর্ড করিয়া রাখিও।

আমি জানি তুমি অন্যায় খরচ পছন্দ কর না, সেই কারণেই বলিতেছি—আমার শ্রাদ্ধে বাছিয়া বাছিয়া দেশী ও আধা-বিদেশী সমাজভুক্ত মানুষদের নিমন্ত্রণ করিও। নিমন্ত্রণপত্রের খামে মোটা কালো রেখার বর্ডার যেন থাকে; তাহা না হইলে খাওয়ানোটা মাঠে মারা পড়িবে। ভূরিভোজনের পর উদর স্ফীত করিয়া লোকগুলা বাড়ি ফিরিবে, একবারও বলিবে না—মানুষ খুন করিয়া ফাঁসি যাইলে কি হয়—অমন সদাশয় ব্যক্তি আর জন্মাইবে না?

বলিতে ভুলিয়াছি—নিমন্ত্রণ-পত্রে শুধু কালো শোকচিহ্ন থাকিলে চলিবে না—আমার কি কি গুণ উল্লেখ করিয়া তাঁহারা শোকসভায় দুঃখ প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবেন, তাহারও একটি তালিকা দিয়া রাখা ভাল।

শ্রাদ্ধবাসরে আমার সেই প্রতিমূর্ত্তিটা রাখিয়া দিও। আমার চেহারার সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। না থাকুক, মোটা অক্ষরে আমার নাম লিখিয়া দিলেই চলিবে। একান্ত শিল্পীর কাজ সম্বন্ধে কুকথা শুনিবার সম্ভাবনা থাকিলে গাঙ্গুলী এবং চাটুজ্জে মহাশয়ের নিকট হইতে পৃথকভাবে স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট ছাপাইয়া মূর্ত্তির গলায় ঝুলাইয়া দিও। দেখিবে, বেরসিক সাধারণের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার চেহারার সহিত মিল না থাকিলেও মর্ম্মরমূর্ত্তি আমার হইয়া কথা বলিবে (speaking likeness)। সার্টিফিকেট পড়িয়া সকলেই বলিবে প্রতিমূর্ত্তি একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পাষাণ জীবন্ত হইয়া কথা বলিতে থাকিলে ভয় পাইও না। আমি মরিয়াও তোমার পাশেই থাকিব। ওগো, তোমাকে যে বড্ড ভাল বাসিতাম—সেই কারণেই অনুরোধ করি মাথার সিঁদুর খসাও আপত্তি নাই, কিন্তু ঠোঁটের সিঁদুর অটুট রাখিও। ও সিঁদুর রসরাজ রাজশেখরের আবিষ্কার, রসই পুরাপুরি বাঁচিবার একমাত্র অবলম্বন। আর যাহাই কর, রসগ্রহণে বিমুখ হইও না। তবে বাড়াবাড়ি নয়—প্রথম দর্শনেই তোমাকে যেন বিধবা বলিয়া চেনা যায়। আমি বাস্তবিকই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম, সেই কারণেই আশা করিব, আমার মৃত্যুর পর যেন কিছুদিন তুমি বিধবা সাজিয়া থাক। অতি-আধুনিকাদের অনুকরণ করিও না। স্বামী নাই, অথচ আমার স্ত্রী সধবার বেশে সজ্জিতা—প্রেতলোকে বাস করিয়াও সহ্য করিতে পারিব না। আমি সাংঘাতিক ভাবে জেলাস। ওগো, জেলাসি যে আন্তরিক ভালবাসার ভিন্ন রূপ, এটাও কি বোঝ না? আধা-ঘুম আধা-জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ নানা কথাই ভাবিতে ভাবিতে নেশার প্রভাবে আবার জড়াইয়া পড়িলাম।

ভোর হইয়া গিয়াছে, অনেকগুলি লোকের কোলাহলে পুরাপুরি জাগিয়া উঠিলাম। প্রথমেই মনে আসিল বামাপদর কথা। দেখিলাম, সে একটু দূরে আমার মোটা কোটে সর্ব্বদেহ ঢাকিয়া হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে পিটির পিটির করিয়া তাকাইতেছে—বুঝিলাম গতরাত্রির ঘটনা তাহাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইতিমধ্যে সুশীল, কালী সব আসিয়া জড়ো হইয়াছে। কালী ছাত্রদের মধ্যে একটু ভারিক্কে ধরণের মানুষ। দেখি, বামাপদ কখন তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বামাপদ ছেলেটা শুধু বোকা নয়, একেবারে নষ্ট—গতরাত্রির সমস্ত ঘটনা কালবিলম্ব না করিয়া শচীনকে বলিয়া দিয়াছে। শচীনের সহিত মিস্ Xএর বন্ধুত্ব বেশি। সে বাংলোয় ফিরিয়াই অলঙ্কারসহ মিস্ Xএর নিকট পুনরাবৃত্তি করিয়াছে—মিস্ X যথাসময়ে শ্রীযুক্তার নিকট খবরটি রিলে (Relay) করিয়া দিয়াছেন।

বার্ত্তাবাহকরা কানাঘুষা করিয়াই আত্মতৃপ্তির ব্যবস্থা করিতেছিল—শ্রীযুক্তা জোর গলায় আমাকে শুনাইয়া মিস্ Xকে বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আগে থাকতেই জানতুম—শিকার না আর কিছু; ঐ ছাইভস্মগুলো খাবার জন্যই উনি শিকারে আসেন; আহা বেচারা বামাপদ আর একটু হলেই ছেলেটা মরেছিল—এখন এই কেলেঙ্কারি চার ধারে ছড়িয়ে পড়বে, ওঁর লজ্জা ব'লে কোন জিনিস আছে? আমার কিছু বলিবার নাই, লজ্জার মাথা বহুপূর্ব্বে চিবাইয়া খাইয়াছি। জঙ্গলে আসিয়া কেলেঙ্কারি! শিকার করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। আবার বলি—পথি নারী বিবর্জ্জিতা।

শিকারে ম্লাজসংসর্গ

ভোর না হইতেই হাতীর চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে পড়িল, গত রাত্রে বাঘের খবরের কথা। বিছানার পাশেই ব্রিচেস্ রাখিয়াছিলাম, পরিয়া রাইফেলের নল ও ঘোড়া পরীক্ষা করিয়া লইলাম। তাড়াতাড়িতে সিগারেটের টিন লইতে ভুল হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখি, টিনটি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে মনে আসিল দুশ্চরিত্র কেটার কথা। রূপার সিগারেট কেস, সোনার বোতাম—তাহার অত্যাচারে ব্যবহার করা ছাড়িয়া দিয়াছি। উক্ত দ্রব্যগুলির অন্তর্দ্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিত—চল্ গিয়া। জড়-পদার্থ ইচ্ছামত চলাফিরা করিতে পারে, অবিশ্বাস করিবার সাহস ছিল না—হয় সে চাকরি ছাড়িয়া দিবার ভয় দেখাইবে, নয় সময়মত চা খাইতে পাইব না। কত দিন তাহাকে জবাব দিবার জন্য মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হইতে পারি নাই। প্রতি দিনের সব কাজে তাহাকে না হইলে আমার চলিত না। দোষ যথেষ্ট থাকিলেও তাহার গুণও ছিল অনেক। কতবার সে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে। চায়ে ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি এবং সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময় কেটা এপয়েণ্টমেণ্ট-কার্ড দেখাইয়া ভদ্র আইনের দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে কতবার তাহাকে এক মাসের পুরা মাহিনা বকশিশ দিয়াছি, তথাপি অঙ্গার ধৌতকরণের ফলাফল এড়াইতে পারি নাই।

বাহারী কামিজ কিংবা জুতা বেশি দিন ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না। হঠাৎ যে-কোন সময় তাহার পছন্দমত একটি পরিয়া সেলাম ঠুকিলে আশ্চর্য্য হই না। জুতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবার পর সন্দেহ করিতেছি ভাবিলে সে নির্ব্বিকার চিত্তে বলিত, জুতা ফটুগিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি কায়দায় গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকিয়া সেলাম দিত। নিজের অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিত, কিছু বলিতাম না।

সামান্য ভৃত্য এতটা প্রশ্রয় পায় কেন—প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ ছিল যথেষ্ট।

প্রথম কারণ, আমাকে চালাইয়া লইতে পারেন এমন অভিভাবক কেহ ছিলেন না।

দ্বিতীয় কারণ, বিবাহের বাজারে আমার দাম উঠে নাই। কেন বলিতেছি। বাল্যকাল হইতেই শিকার, কুস্তি ও ফুটবলে শরীরটি এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যাহার খ্যাতি কাট-খোট্টার উপরে উঠিতে পারে নাই। তদুপরি সময়ের আগেই বয়স নোটিস পাঠাইয়াছিল—মাথার মধ্যস্থলে বিরাট টাকের দখল লইয়া।

বোতলের পর বোতল ভিটেক্‌স্‌ শেষ করিয়াছি, কিন্তু টাকের ন্যায্য দখল হটাইতে পারি নাই। দুই-এক গাছি নূতন চুল যে গজায় নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বন্ধুর দল অত অল্পসংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে রাজি হন নাই। আমি দোষ দেই না, কারণ তাঁহারা খালি চোখে দেখিতেন।

চুল আমার নিজের, সুতরাং উঠিতেছে কি না দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলাম—সামনে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো রাখিয়া পিছনে সাদা কাপড় ঝুলাইয়া তাহার পর ঈষৎ মাথা হেলাইয়া ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরিলেই যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক দেখিতে পাইতেন, নবদূর্ব্বাদলসম কচিরা আগমনীর আশ্বাস দিতেছে। কিন্তু এমন হতভাগার দেশ যে, কাহারও সহানুভূতি দেখাইবার সাহস নাই, পাছে কিছু একটা প্রস্তাব করিয়া ফেলি।

বানপ্রস্থ অবলম্বন কিংবা পণ্ডিচারীর আশ্রমে ঢুকিবার ইচ্ছা আমার কখনও আসে নাই। পাণিগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বাঙালী শুকনো তরুণদের উৎপাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অস্থিসার শরীর, সাহেবী অনুকরণে বাংলা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও সন্ধ্যাবেলায় ভোরের সুরের উপর অমানুষিক অত্যাচার তন্বীদের এমন ভাবেই আকর্ষণ করিত যে, আমার মত প্রাচীনপন্থীর সেখানে ভিড়িবার উপায় ছিল না। অগত্যা নিরুপায় হইয়াই কেটার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

বালিশের নীচে টাকা খুঁজিয়া না পাইলে কেটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়াছে—যদিও আমি নিশ্চয় জানিতাম, টাকার বেগবান গতি কোন্‌ দিকে ধাবিত হইয়াছিল। তথাপি কেটা ভিন্ন গতি নাই। তাহাকে মিনতি করিয়া বলিলাম, সিগারেটের টিন পাইতেছি না। যে ভাবে বলিয়াছিলাম, তাহাতে পাথর পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত—নেতারা এই টেক্‌নিক্‌ জানিলে রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজে লাগাইতে পারিতেন। উপস্থিত পাথর গলিল না বটে, কিন্তু কেটার মন ভিজিল। এদিক ওদিক তাকাইয়া টিনটি আমার সামনে রাখিয়া দ্রুত অন্য কাজে চলিয়া গেল। ভয়ে ভয়ে ঢাকনি খুলিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে—টিন প্রায় শূন্য। কিছু বলিলাম না; ইহার শোধ জঙ্গলে লইব ঠিক করিলাম। সেখানে বৎসকে বোলতার চাক, বিছুটি ও চোরকাঁটার সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করাইয়া দিব।

হাতীতে উঠিয়াই বলিলাম, মাইলং। ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় কেটা যাহাতে আছাড় খায়, কিন্তু সে অবলীলাক্রমে লেজ ধরিয়া নারিকেল গাছে উঠার মত পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিল এবং 'রামা' বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে পিছনে গুছাইয়া বসিল। দুঃখ হইল, এই অকালকুষ্মাণ্ডকে হাতী চড়া ঘোড়ায় চড়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর কত কি

অশোভনীয় বিষয় শিখাইয়াছিলাম কেন? অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, নিজের শখের নানা দ্রব্য আমার বিনা অনুমতিতে তাহাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি—অবশেষে নেশার সামগ্রীর উপরও তাহার দৃষ্টি! একটা ভাল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, পূর্ব্বদিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের সঙ্কেত করিতেছে, এমন সময় 'রোখ, রোখ' চীৎকার শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি, গৌরবাবু ক্ল্যারিয়নেটের বাক্স বগলদাবা করিয়া মাথার উপর এক হস্ত রাখিয়া প্রাণপণ শক্তিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সহিত মাত্র কয়দিনের আলাপ। শিকার-পার্টির তিনি একজন দর্শক। বয়স প্রায় আধ-পাকার দিকে—মুখের আঁকাবাঁকা রেখাগুলি তাহার প্রমাণ দিতেছে।

চুলের পারিপাট্যে তাঁহার অসামান্য দুর্ব্বলতা ছিল। মেমেদের মত পার্মানেণ্ট কার্ল্স্-এর সহিত অনেক দেশী ষ্টাইল যোগ লাগাইতেন। এক দিকে ময়ূরপঙ্খী পাখনা—যাহা ধীরে ধীরে পাতা কাটায় আসিয়া কপালের অনেকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অপর দিকে খানিকটা ব্যাক ব্রাশ্ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার পর ঢেউ-এর পর ঢেউ—যাহা কানের কাছে সমুদ্রতটের মত সমতল হইয়া গিয়াছে। সিঁথি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইত, কতখানি ধৈর্য্য ও সহজলব্ধ সময় থাকিলে মানুষ এতটা সাফল্য লাভ করিতে পারে। মহাশিল্পী বটিসেলিও তুলির সূক্ষ্ম কাজে এত ভাল effect আনিতে পারেন নাই। গৌরবাবু ছোট্ট একটি লাইন-টানা রুলার, এক পাত্র জল ও একটি মাত্র চিরুনির সাহায্যে এই অসাধ্য-সাধনে সফল হইয়াছিলেন। রাত্রে ঘুমাইবার সময় তিনি নাকি মাথায় গামছা বাঁধিয়া শুইতেন। কতকটা পাতিয়ালার যোদ্ধাদের মত।

দ্রুত অগ্রসরকালীন মাথায় হাত রাখিয়াছিলেন কেন অনুমান করিতে পারিলাম। ভদ্রলোক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হাতী থামিতে চায় না, কারণ সামনেই কুনকী চলিতেছিল। অবশেষে সামনের হাতী দাঁড় করাইতে বলিলাম। আমাদের হাতী ডাঙ্গস খাইয়া বসিল বটে, কিন্তু লেজের এমন উত্থান-পতন আরম্ভ হইল যে, পিছন হইতে উঠায় বিপদের আশঙ্কা ছিল। পাশ হইতে উঠিতে বলিলাম। বাঁশীর বাক্সটা আগাইয়া দিলেন, কিন্তু মাথা হইতে হাত নামাইলেন না। এক হাতের সাহায্যে উপরে উঠা অসম্ভব জানিয়া ভদ্রলোককে বাধ্য হইয়া ঝুলাইয়া তুলিলাম; দোদুল্যমান অবস্থাতেও তিনি চুল হইতে হাত নামাইলেন না। হাওদায় বসিয়া ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, এমন জানলে কে আসত?

জীবনে এই প্রথম তিনি হাতীতে উঠিলেন। জঙ্গল বলিতে ইডেন গার্ডেন্স্ ও কলিকাতার আশেপাশের বাঁশঝাড় ছাড়া আর কিছু দেখেন নাই। আমার হাতীতে অব্যবসায়ী

উঠাতে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। দাঁড়াইবার পূর্ব্বে হাতী সামনের দুই পা সোজা করিতেই এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, যাহা মুমূর্ষু রোগীর শেষ কথা বলিয়া ভ্রম হয়। সমস্ত পৃষ্ঠের ভার হাওদায় ঠেসানো থাকিলেও হেলান দেওয়া রাইফেল এবং আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। জঙ্গলে ঢুকিবার পূর্ব্বেই এই ঘটনা আমাকে দমাইয়া দিল; সেফটি ক্যাচ থাকিলেও গুলি-ভরা বন্দুক লইয়া ভদ্রলোকের সহিত কি ভাবে শিকার করিব, চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। হাতী দাঁড়াইতে ভদ্রলোক আমাকে ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন, একটু নিরাপদ বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জঙ্গলে তো বাঘ থাকে?

উত্তর করিলাম, বাঘ শিকারেই তো যাচ্ছেন।

কি ভাবিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, চিড়িয়াখানার বাঘের চেয়ে বড়?

বিরক্ত বোধ করিতেছিলাম, বলিলাম, কেমন ক'রে জানব, ঘর থেকে মানুষ টেনে নিয়ে গেলে বুঝতে হবে মানুষখেকো বাঘ আরও বড় হতে পারে।

বিরক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, নূতন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন মনে হইল। লক্ষণ খারাপ বুঝিয়া বলিলাম, যৌনপুরীটা বাজান। এখন রোদ ওঠে নি, জমবে ভাল। উত্তর না পাইয়া অনুমান করিলাম—অজানা বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার তালু শুকাইয়া গিয়াছে। কেটাকে সোডা খুলিতে বলিলাম। সোডা পান করিয়া তিনি অনেক সুস্থ বোধ করিলেন, তাহার পর জোর তাড়া দিতেই বাক্সের অভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রটি একটি পূর্ণাকার বাঁশীর রূপ পরিগ্রহ করিল। বাল্যকাল হইতেই দেশী রাগ-রাগিণী শুনিয়া আসিতেছি—বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও যান্ত্রিক আমাদের বাড়িতে বহুবার জলসা করিয়াছেন, সুতরাং আমার দেশী সুরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আসা স্বাভাবিক।

ডায়নামোর কল-কব্জার মত চাবিগুলির ঘাট বাঁধা থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে সুরের ক্রমবিকাশ হইবে বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ধীমার তিনি আলাপ ধরিলেন, তানগুলি নির্ভুল সুরের ঢেউ তুলিল। মুগ্ধ হইলাম, মন উধাও হইল বন্দী রাজকন্যার সন্ধানে। পাষাণপুরী ভেদ করিয়া দেখিলাম—মানসসুন্দরীকে প্রাণ ভরিয়া, প্রেমের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, ভুলিয়া গেলাম আমার গন্তব্যস্থান, ভুলিয়া গেলাম পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর কথা। প্রত্যক্ষ করিলাম—রাজকন্যার দেহের পূর্ণতা, নীলাভ ওড়নার সচ্ছলতা প্রকাশ করিয়া দিল, নিটোল স্তনাগ্রচূড়ার আভাষ, নিতম্বের অপূর্ব্ব লীলায়িত রেখা। ইতিমধ্যে কখন সোম আসিয়া পড়িয়াছে জানিতে পারি নাই। গৌরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন লাগল?

আমি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। কেমন লাগিল, ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করি কেমন করিয়া—তুলনায় ভাগ্যহীনা বাংলার কথা মনে আসিল। আধুনিক তথাকথিত মার্জ্জিতের দল কি ভাবে সংস্কৃতির এত বড় অঙ্গকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে!

কথার প্রাধান্য সুরের নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গীকে কি ভাবে নিস্তেজ করিয়া আনিতেছে, ফ্যাশানের প্রতাপ ছোটকে বড় করিবার জন্য কি ভাবে তার বিষাক্ত লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, মনে আসিল বাংলার কথা—যেখানে শক্তির অভাবে আর্টের আদর্শকে করে বীভৎস, সাধনার অভাবে সুরকে করে সোজা। শিল্পের ব্যভিচার সম্বন্ধে একের পর এক নির্লজ্জ আচরণ মনকে পীড়ন করিতেছিল।

গৌরবাবু ঠেলা মারিয়া বলিলেন, আমরা এসে পড়লাম যে। অত কি ভাবছেন?

তাঁহার কেশবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া কি ভাবিতেছিলাম বলিলাম না। দেখিলাম অদূরে একরাশ তাঁবু পড়িয়াছে—ছোট গ্রামের আয়তন জুড়িয়া।

হাতী বসিবার পূর্ব্বেই মনে পড়িল গৌরবাবুর আলিঙ্গনের কথা—এবার কিছু করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। এখানে মই ছিল, নামিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিলেন না। মাটিতে নামিয়া তিরস্কারের সুরে প্রশংসা করিলেন, ইস্, আপনার গায়ে ভয়ানক জোর তো, কাঁধটা ভেঙেছিল আর একটু হ'লে।

স্নান জলযোগ ইত্যাদি শেষ করিয়া আমরা রাজাবাহাদুরের ক্যাম্পে উপস্থিত হইলাম। মাটি হইতে উচ্চে প্ল্যাটফরম্, তাহার উপর তাঁবু চড়ানো হইয়াছে। চারধারে লোহার শিক-ঘেরা বারান্দা। তাঁবুটি ছোটখাট কাপড়ের বাংলো বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা বারান্দা পার হইয়া আসরে উপস্থিত হইলাম। কাঠের প্ল্যাটফরমের উপর পারস্যদেশীয় গালিচা। এই ধরনের এত বড় গালিচা সুলভ নয়। কারুকার্য্যে কি অপূর্ব্ব নিপুণতা! কার্‌পেটের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। সামান্য মাদুরের মত ব্যবহৃত হইতেছে। গালিচার উপর দুগ্ধফেননিভ ফরাশ পড়িয়াছে। মধ্যস্থলে তানপুরা, দীলরুবা, সারেঙ্গ, পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা ইত্যাদি যন্ত্র—একটি হারমোনিয়ামেরও স্থান হইয়াছে।

আতরের গন্ধে ঘর ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিন পরে জুঁইয়ের রু মনকে কাঁচা করিয়া আনিতেছিল। মোটা জরির আচকান পরিয়া খানসামারা আতর, সোনালী তবকযুক্ত পান ও সিগারেট সরবরাহ করিতেছিল। তাহাদের নম্রতায় প্রভুর পুরানো চালের পরিচয় পাওয়া যায়। তেল অথবা লোহা বেচিয়া হঠাৎ টাকাওয়ালাদের বাড়িতে সচরাচর এই ধরনের খানসামা চোখে পড়ে না।

আমার পাশেই বসিয়াছিলেন রাজ-মাতুল ও সদ্য-বিলাতপ্রত্যাগত এক তরুণ জমিদার।

রাজ-মাতুলের শিকারে কোন স্পৃহা নাই। ভাগিনা-বাহাদুরকে হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে আগলাইবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছেন। রাজাবাহাদুরের পিতা স্বর্গীয় মহারাজা জীবিত অবস্থায় তাঁবুতে বসিয়া এত মরা বাঘ দেখিয়াছেন যে, জঙ্গলে তাহাদের পিছনে ঘোরা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মামাবাবু আসলে লোকটি মন্দ নয়, কিন্তু নিরিবিলিতে কাহাকেও একবার

পাইলেই নিজের খায়েন-দায়েন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেন এবং একবার আরম্ভ হইলে তাহা থামানো যাইত না। আমি এই বিপদে একদিন পড়িয়াছিলাম, তাহার পর একলা তাঁহার সামনে আর আসিতে সাহস পাই নাই।

জমিদার-সাহেব বিলাতবাস-কালীন স্প্রিংযুক্ত কলের পারাবত মারিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন। ফলে লক্ষ্য এমন অব্যর্থ হইয়াছিল যে, বেগবান মোটরগাড়ি হইতে বিপরীত দিকে ধাবমান মৃগকে টেলিস্কোপিক রেঞ্জ হইতে বধ করিতে পারিতেন।

ফাঁকা রাস্তায় মোটরগাড়ি ঘণ্টায় অনায়াসে চল্লিশ মাইল ছোটে, মৃগের গতিও তদপেক্ষা কম নয়। হরিণ-মারা সাধারণ টোটা সেকেণ্ডে এক হাজার গজ অতিক্রম করিতে পারে। সব কয়টির একত্র মিলন করাইতে হইলে দশমিক ভগ্নাংশের নির্ভুল হিসাবে কুলায় কিনা সন্দেহ। তথাপি তরুণ জীবটি এদিক দিয়া বহুবার কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ভাবিতেছিলাম মহাভারতের অর্জ্জুনের অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা, ভদ্রলোক বাঁচিয়া থাকিলে জমিদার-সাহেবের নিকট আরও কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন।

এতক্ষণ সকলেই রাজাবাহাদুরের অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি প্রবেশ করিতেই আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিলেন না মহিলাটি। মিতাক্ষরা আইনের মত জন্মস্বত্ব লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, স্বত্বটি উপস্থিত সম্মানের দাবি। নির্বিবচারে নারীকে এই সম্মান দেওয়ার পিছনে অবলা অথবা দুর্ব্বলের প্রতি দয়া লুকাইয়া নাই তো?

নিমন্ত্রিতদের বসিতে বলিয়া রাজাবাহাদুর ওস্তাদকে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিতের পিছনে আদেশ ছিল না—ছিল সশ্রদ্ধ অনুরোধ।

সঙ্গীত আরম্ভ হইবার পূর্বে স্বহস্তে সোনার আতরদান শিল্পীর সামনে ধরিলেন। মেঘ রাগের সহিত পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর বোলে সমস্ত তাঁবু ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যাদুকরের সুর আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত করিয়াছিল। উপলব্ধি করিলাম, নোংরা আমোদের সহিত ধ্রুপদের যোগ নাই। ঠুংরি গজল মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী চঞ্চলতা মাত্র। ওস্তাদের গান থামিতেই তরুণ জমিদার কালবিলম্ব না করিয়া অত্যন্ত রসাল সুরে বলিলেন, এইবার মিস ক একটা গাইবেন। মিস ক স্থানীয় দেশী কলেক্টর-দুহিতা, তখন সবে বাগদত্তা। ফিয়াঁন্সে সহ শিকার দেখিতে আসিয়াছেন। প্রথমে তিনি দেহবস্ত্র যথাসম্ভব অসংযত করিয়া লইলেন, তাহার পর ভ্রূ উত্তোলন করিলেন। নিমিষে উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া উদয়শঙ্করের মত নাচিয়া লইল। বলিলেন, গান, দেখুন, আমি জানি না। আমি মানিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু যে ভাবে তিনি হারমোনিয়ামের দিকে হেলিতেছিলেন, তাহাতে বুঝিলাম ভদ্রোক্তিতে মহিলার নিজেরই বিশ্বাস নাই। গান অর্থে কতকগুলি শব্দের সমাবেশ ও শিল্পীর রসোপযোগী করিয়া প্রকাশ। শব্দ কি ভাবে দেখা যাইতে পারে বুঝিতে পারিতেছিলাম না,

তবে আধুনিক আর্টের স্রষ্টারা অনেক কিছুই নূতন করিতেছেন। প্রাচীন ও নূতনের টানা-পোড়েনে গান ও সুর প্রত্যক্ষ করা যাইবে তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কি আছে! আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। মহিলা গান ধরিলেন—'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে…'

খাস দিল্লীর তবলচি, আধুনিকাদের সহিত কখনও সঙ্গত করে নাই, বাজাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। রাজাবাহাদুর সঙ্কেতে প্রয়োজন নাই জানাইলেন, কিন্তু তবলচি সঙ্কেত বুঝিতে পারিল না। অথচ কি বাজাইবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে বেপরোয়া হইয়া কাহারবার আশ্রয় লইল। গানের প্রাণবান গতি ইচ্ছামত চলিয়াছে, মাত্রার বন্ধনে সে বন্দী হইতে চায় না। যদিও বা হঠাৎ গায়িকার অজ্ঞাতে তাল মিলিয়া যায়—পরমুহূর্ত্তে ভাব তেজিয়ান হইয়া উঠে, ফলে সুর, তাল ও কথার মাঝে বিপ্লব আসিয়া পড়ে, কেহ কাহাকেও অধীনে আনিতে পারে না।

একবার, দুইবার, তিনবার কপাল মুছিয়াও তবলচি সুর ও তালের দ্বন্দ্ব মিটাইতে না পারিয়া হতাশায় জিজ্ঞাসার সুরে বলিল, ইয়ে কেয়া সুর হ্যায়? তাহার পরই এক গ্লাস জল চাহিয়া বসিল।

মিস ক গানও থামাইতে চান না, আমিও উঠিবার ফাঁক পাই না।

সঙ্গীতে যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও শিকারে অভিজাত-সুলভ গোলমাল আমি কখনও পছন্দ করিতাম না। একটা বাঘ মারিতে পনেরটা হাতী, তাহার উপর যত রাজ্যের লোক, যেন বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছি। আমার মত বুনোর পক্ষে এই জাতীয় মৃগয়া সমর্থন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তথাপি রাজাবাহাদুরের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। মেঘ রাগ আমার হিংস্র প্রকৃতিকে প্রায় ঠাণ্ডা করিয়া আনিয়াছিল—বনের হরিণ শুনিতেই অন্তরের বুনো সজাগ হইয়া উঠিল। ওত পাতিয়া ছিলাম, একবার গান থামিলে হয়। হঠাৎ এক্‌সেলেণ্ট ইত্যাদি বিশেষণের বর্ষণ হইতেই বুঝিলাম, গান থামিয়াছে; কিন্তু ভয় ছিল, আবার ধরিতে কতক্ষণ! রাজাবাহাদুর অভ্যাগতদের লইয়া এত ব্যস্ত যে, তাঁহার নিকটে যাওয়া অসম্ভব। অগত্যা তাঁহার অনুমতি না লইয়া ক্যাম্পের বাহিরে আসিলাম। খবরী অপেক্ষা করিতেছিল। কেটা এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইব ঠিক করিলাম।

আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হাতীতে উঠিলাম। পিঠে গদি ছাড়া কিছু নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই জঙ্গল দেখিতে পাইলাম, অধিকাংশই শাল ও দৈত্যের মত বটগাছ, নীচে উলুঘাসের আগাছা। ঘাস শুকাইয়া একেবারে বাঘের গায়ের রং হইয়াছে। হাতীকে বেশিক্ষণ জঙ্গল ভাঙিতে হইল না, ভিতরে প্রবেশ করিতেই শকুনি উড়িতেছে দেখিলাম—বাঘে খাওয়া মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিল না। অর্দ্ধভুক্ত মৃত ব্যক্তিটি যে ভাবে ফাঁকায় পড়িয়া ছিল, তাহাতে বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ আসিল। বাঘ তো কখনও নিজের

শিকার শকুনি ও শিবার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বাহিরে রাখিয়া যায় না। তবে কি জঙ্গল ছাড়িয়া পলাইয়াছে ? অথচ খবরী বলিতেছে, কাল রাত্রে এখানকার লোক বাঘের গর্জ্জন শুনিয়াছিল। থাবার দাগ খুঁজিলাম, কিছুই দেখা যায় না—কাঠফাটা শুকনা মাটির জন্য। সবই কেমন অদ্ভুত লাগিতেছিল। যাহাই হউক, শবের নিকটে ডোবার দিকে মুখ করিয়া বসিবার জন্য একটি গাছ ঠিক করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম; তখন সকলেই মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছেন। এ দিকটায় বাদ পড়া ঠিক নয়, আমিও একটা কোণে বসিয়া পড়িলাম।

বেলা দ্বিপ্রহর হইবে, আমরা জঙ্গলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে শিকার-নীতি লঙ্ঘনের অপরাধ স্বীকার করার সুযোগ পাইলাম। রাজাবাহাদুর আমার দিকেই আসিতেছিলেন; সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনিই আসল শিকারী। তা দরকার হ'লে গাছেই থাকবেন; ও অভ্যাসটা তো আপনার অনেক দিনের পুরনো। আমি উত্তর করিলাম, রাজসংসর্গে আমার চরিত্র ও প্রকৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি নিতান্ত বালকের মত হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ কলেক্টর-দুহিতা দর্শনে যেন চাবুক খাইয়া নিজেকে সংযত করিলেন। কি দুরবস্থা, ভদ্র আইন প্রাণ খুলিয়া হাসিতেও দেয় না। রাজাবাহাদুর মিস ক-কে তাঁহার হাতীর দিকে লইয়া গেলেন। পাশ ফিরিয়া দেখি, গৌরবাবু ঠিক আমার পিছু লইয়াছেন। কি কারণে জানি না, আমার সম্বন্ধে অকপট বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। হয়তো ভাবিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আমি দৈহিক শক্তির সাহায্যেই বাঘকে কাবু করিতে পারিব, কিন্তু বাঘের এক থাবায় বুনো মহিষের স্কন্ধ যে দেহচ্যুত হইতে পারে এ খবর তিনি জানিতেন না। আমার নিকটে আসিয়া এমন গদগদভাবে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলাম—যদিও জানিতাম, গাছে উঠিবার সময় তাঁহার কবল হইতে মুক্তি পাইব।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁবুর নিকটেই আসল জঙ্গল। অল্প সময়ের ভিতর আমরা গন্তব্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জঙ্গল ভাঙার দরকার নাই—রাজাবাহাদুরকে আগেই বলিয়াছিলাম। তিনি নিজেও তাহা জানিতেন, তথাপি বহুদূর হইতে বিটিং-এর হুকুম দিলেন। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার দিকে তাকাইলাম। সোজা কথায় দাঁড়ায় বাঘ আমার জন্যই ছাড়িয়া দিলেন—জঙ্গল ভাঙা অপর নিমন্ত্রিতদের আমোদ দেওয়ার অছিলা মাত্র। মনে মনে রাজাবাহাদুরকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিলাম। তিনি নিজে ভাল শিকারী। শিকারীর মন জঙ্গলে ঢুকিলে কি হয় আমি জানি।

তথাপি এই উদারতা! নিজেকে স্বার্থপর মনে হইতেছিল। একবার ভাবিলাম, রাজাবাহাদুরকে ডাকিয়া আনি, তাঁহার জঙ্গলের বাঘ তিনিই মারুন; আবার ভাবিলাম, এখন সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের সময় নাই।

আমরা গাছের নিকটে আসিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—শব সেখানে নাই। ভূতুড়ে কাণ্ডের মত লাগিল। দুরবীন চোখে লাগাইয়া স্থানটি পরীক্ষা করিলাম, শবের পাশে উলুঘাস খানিকটা থেঁতলাইয়া গিয়াছে, অথচ বাঘের খাবার চিহ্ন নাই। আমি নামিতে যাইতেছিলাম, কেটা আমাকে স্পর্শ করিল, সে জানিত, উত্তেজনায় আমি কতটা মরিয়া হইতে পারি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিনের বেলা এত লোকের গণ্ডগোল সত্ত্বেও বাঘ খাদ্যের আশেপাশে ঘোরে, সে কোথায় লুকাইয়াছে তাহা বলা শক্ত। তাহার উপর আট-দশ ফুট খাড়াই ঘাস। মৃত মানুষটিকে কোথায় লুকাইয়াছে বাহির করিতে না পারিলে নির্দ্দিষ্ট গাছে উঠার কোন মানে হয় না। বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। জঙ্গল ভাঙা শুরু হইয়াছে, কিন্তু কোন ষ্টপ্‌স গাছে উঠে নাই। স্থানীয় লোকের ধারণা, নরখাদকটি নাকি যাদু জানে। দূরে ছোট গাছ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতেছে—মাহুতের লেলে, ধৎ ইত্যাদি আদেশ শুনিতে পাইতেছি, অথচ বাঘের সাড়া নাই। ভাল ঠেকিতেছিল না।

রাইফেল ভরিয়া দৃঢ়ভাবে গৌরবাবুকে কেটার সহিত বসিতে বলিলাম। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিনি আদেশ মানিলেন। কেটাও দো-নলা লইয়া প্রস্তুত হইল।

মাহুতের অভিজ্ঞতা ছিল, সে হাতীকে উলুখড়ের দিকে আগাইয়া দিল। সামান্য অগ্রসর হইতেই সে মাটিতে শুঁড় ঠুকিতে আরম্ভ করিল। তাহার সমস্ত দেহে কম্পন অনুভব করিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ করিয়া শুঁড় উঠাইল, তাহার পর পা ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। সামনেই দেখি মৃত ব্যক্তি পড়িয়া আছে; কিছুক্ষণ আগে উর্দ্ধ অঙ্গ প্রায় গোটা ছিল, এখন দেখি একদিককার পাঁজরা একেবারে নাই—কিছু আগেই বাঘ এইখানে খাইতেছিল। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া চারপাশ ভাঙিতে বলিলাম। অনতিবিলম্বে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হইয়া গেল, অথচ বাঘের কোন চিহ্ন নাই, হাতী কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাহার উপস্থিতির সঙ্কেত করিতেছে। ফিরিয়া আবার আমাদের নির্দ্দিষ্ট গাছের নিকট আসিলাম—সেখান হইতে পরিষ্কৃত জঙ্গল চমৎকার দেখা যায়। কেটাকে সব সরঞ্জাম লইয়া গাছে উঠিতে বলিলাম। সে বিনা দ্বিরুক্তিতে আজ্ঞা পালন করিল। উঠিবার সময় দেখিলাম, সে পুরানো কায়দায় অটোমেটিক পিস্তল ও কুরকি যথাস্থানে রাখিয়াছে। পিছনে মোটা ওভারকোট ও পানীয়, কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। গৌরবাবু তাঁহার বিরাট গোঁফ একেবারে আমার গালে ঠেকাইয়া শিশুর মত কাতর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও কি গাছে উঠবেন? এ কি কাণ্ড! আমাকে একলা ফেলে আপনারা কি করছেন? কিছু না।—বলিয়া হাওদা হইতে হোরাইজন্‌ট্যাল বারে ঝোলার মত ডাল ধরিয়া এক দোলায় যখন কেটার উপর ডালে উঠিয়া গেলাম, তখন গৌরীবাবু আমাকে কি ভাবিতেছিলেন জানি না, ডালে বসিয়া দেখি তাঁহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে—একটি

কথা উচ্চারণ না করিয়া হাওদার পাদানিতে নামিয়া বসিলেন। তাহার পর পাঞ্জাবি খুলিয়া মাথা ঢাকিলেন—হাতী একটু নড়িতেই কনে-বউয়ের মত মুখ নত করিলেন। আমার মজা লাগিতেছিল—রাজ-সংসর্গে আসিলে কতরকম জীবের সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা পাওয়া যায়। ইশারায় মাহুতকে লাইনে হাতী লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। অপর দিক হইতে তখনও জঙ্গল ভাঙার শব্দ শুনিতে পাইতেছি। ইতিমধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে—ঝড় উঠিবার পূর্বলক্ষণ। দিনের শেষ আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারী আমাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিতে আরম্ভ করিল। ভরসা ছিল, শীঘ্রই পূর্ণিমার চাঁদ উঠিবে। মাঝে মাঝে জোনাকির ক্ষীণ আলো ; দাদুরী জ'লো হাওয়ার সুরে সুর মিলাইয়াছে। জঙ্গল ভাঙার শব্দ আর শুনিতে পাইতেছি না। হঠাৎ ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক থামিয়া গেল, শুকনা পাতার উপর মসমস আওয়াজ। উভয়ে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বামে তাকাইলাম—একজোড়া খরগোশ। কিছুক্ষণ বাদে আবার খসখস শব্দ -পাতার উপর গুরুভার জানোয়ারের পদবিক্ষেপ—রাইফেল ঠিক করিতে দেখি প্রকাণ্ড বরাহ, বিরত হইলাম। কেটা জানিত, আমরা বরাহ শিকারে আসি নাই।

দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কেটা আমার ওভারকোট আমার পিঠে ফেলিয়া দিল, সঙ্কেতে জানাইলাম, এখন নড়া-চড়া ভাল নয়। চাঁদের আলো ও কুয়াশায় একটি ঘোলাটে পর্দ্দার সৃষ্টি হইয়াছে। চলন্ত জানোয়ার দেখিবার পক্ষে ইহা মস্ত সহায়। আমরা একভাবে বসিয়া রহিলাম। বাঘের আচরণ ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কেটাকে বলিলাম যে, সমস্ত রাত গাছে থাকিতে হইবে, পালা করিয়া জাগিতে হইবে। যে ঘুমাইবে, সে ডালের সহিত নিজেকে বেল্ট দিয়া বাঁধিয়া লইলে অনেকটা নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা আছে। সময় ক্রমে রাত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছে ; শীতকালের ঠাণ্ডা হাওয়া গরম শার্ট ভেদ করিয়া কাঁপুনি লাগাইতেছিল। কেটাকে ইশারা করিতেই ফ্লাস্ক খুলিয়া ব্র্যাণ্ডি দিল। তাহাকেও খাইতে বলিলাম। হঠাৎ কেটা সজোরে আমার পিঠে এক চড় মারিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব ভাবিলাম। সে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া আমার পায়ের তলার ডাল দেখাইল—প্রকাণ্ড সাপ—ছিপছিপে আকার দেখিয়া অনুমান করিলাম লাউডগা। কেটার চড় খাইয়া আমার পিঠ হইতে ছিটকাইয়া নীচের ডালে পড়িয়াছে এবং তথা হইতে নীচের দিকে নামিবার চেষ্টা করিতেছে।

ভয়, উত্তেজনা ইত্যাদির একত্র যোগে সময়ের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নিকটবর্ত্তী গাছের নীচু ডালে একটি পেচক বসিতে গিয়া উড়িয়া পলাইল ; পাখার আওয়াজে নিস্তব্ধতায় ব্যাঘাত পড়িতেই মনে হইল, শেয়ালের সহজ ডাক শুনি নাই। খটকা লাগিল, তবে বাঘ নিকটেই আছে নাকি ? সন্দেহ হইল, থাকিলে নিশ্চয় এতক্ষণ আসিয়া পড়িত, কারণ জল

খাইবার একটি মাত্র ট্র্যাক—আমরা সেই মহড়াই আগলাইয়া আছি। বাঘের অদ্ভুত চরিত্র আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, কেটাকে আর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দিতে বলিলাম। সমস্ত জঙ্গলে একটি পোকার পর্য্যন্ত সাড়া নাই—ঝিঁঝি হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। অতি নিকটে ফেউয়ের ডাক শুনিলাম, কেটা আমার গাত্র স্পর্শ করিল, দেখিলাম পাশের আগাছা ভীষণভাবে নড়িতেছে। কই, কিছু তো দেখা যায় না। নীচের দিকে মুখ নামাইতে দেখিলাম, বাঘ একেবারে আমাদের গাছের তলায় আসিয়াছে—কখন কি ভাবে এবং কোন্ দিক দিয়া আসিল ভাবিবার সময় ছিল না। চোখ দুইটি যেন জলন্ত টিকা, উপর দিকে তাকাইয়া আছে। বুঝিলাম, গন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই, আমাদের উপস্থিতি অনেক আগেই জানিতে পারিয়াছে। এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভাইটাল পার্ট আন্দাজ করা শক্ত। শবের দিকে অগ্রসর হইলে সমস্ত শরীরটা দেখিতে পাই, কিন্তু ওদিকে তার চেষ্টামাত্র নাই। হঠাৎ সামনের দুই পা গাছের উপর তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, মনে হইল উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ আঁচড়াইয়া নীচে নামিল। গাছটি একবার প্রদক্ষিণ করিল। ইহার ভিতর এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে সুবিধামত পাইলাম না। হয় গাছের ডাল আসিয়া বন্দুকের নলের সামনে পড়ে, নয় এক গুলিতে শেষ করিবার মত উপযুক্ত স্থান দেখিতে পাই না। ভুল জায়গায় গুলি করিয়া এত বড় বাঘকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ সমস্ত জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করিয়া বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহার পরই লাফ মারিয়া সামনের ঝোপে চলিয়া গেল। এই বিচিত্র আচরণের কারণ অনুমান করিতে পারিলাম না।

সাপ দেখিয়া বাঘ ভয় পায় না তো!—লাউডগা সাপটিই হইবে। দুই-এক মিনিট এই-ভাবে কাটিল। ভাবিলাম, বাঘ আর এদিকে আসিবে না। অকস্মাৎ বজ্রনাদের মত হুঙ্কার দিয়া বাঘ ঝোপ হইতে লাফ মারিল। এবার তাহার থাবা কেটার পায়ের ঠিক এক হাত তলায় পড়িল। আবার নিমেষে কোথায় লুকাইল। অনেক মানুষ-খেকো বাঘ দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার চরিত্রের সহিত তাহাদের মিল নাই। আমরা ছাড়া আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নাই—আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছিল, গোড়া হইতে গাছে উঠা পর্য্যন্ত সব কিছুই সে দেখিয়াছে, অথচ দুপুর-বেলা আক্রমণ করে নাই কেন? অমন সুবিধা পাইয়া ছাড়িয়া দিল কেন? আবার সামনেই ফেউ, উত্তেজনায় উন্মাদের মত হইয়া উঠিলাম। বাঘের পিছু লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কেটা জোরে হাত ধরিল। আমি সজোরে তাহার গণ্ডে এক চড় বসাইয়া দিলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্য বেহুঁশের মত হইয়াছিল, সামলাইয়া লইয়া আমার পা ধরিল—সেদিকে দৃকপাত করিলাম না, মাটিতে নামিব ঠিক করিলাম। হয় বাঘ মরিবে, না হয় আমি মরিব। কোন কথা না বলিয়া নামিবার সময় কেটার কোমর হইতে পিস্তল ছিনাইয়া লইলাম। এবার আপত্তি করিল না। সে জানিত, কোন ফল হইবে না। নিজেও দো-নলা লইয়া আমার সহিত মাটিতে নামিল। এক

সেকেণ্ডও অতিবাহিত হয় নাই, দেখিলাম সামনের ঝোপ নড়িয়া উঠিল—বাঘ আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া—তাহার গর্জ্জনে সমস্ত জঙ্গল কম্পিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, বধির হইলাম, হৃদয়ের স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইবার মত হইল, চক্ষুর পলক পড়িবার পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিলাম, বাঘ মাটিতে নাই—শূন্যে উঠিতেছে।

এই সব ঘটনা মুহূর্ত্তের ভিতর ঘটিতেছিল। বাঘ লাফ মারার সঙ্গে সঙ্গে কেটা পরের পর দুই-নলার গুলি চালাইল। লক্ষ্য করিবার অবস্থা আমার ছিল না, সম্পূর্ণ যে জ্ঞান ছিল তাহাও বলিতে পারি না, যতটুকু মনে পড়ে, তাহাতে পিস্তলের ঘোড়া বহুবার টিপিয়াছিলাম, তাহার পর কল্পনাতীত ওজনের ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই। অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তখন রৌদ্র উঠিয়াছে, আমি ক্যাম্প-খাটে শুইয়া আছি, পাশে চেয়ারে আসীন ডাক্তার ও রাজাবাহাদুর। রাজাবাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন? প্রশ্নটা অদ্ভুত লাগিল—আমার হইয়াছে কি যে, কেমন আছি! পাশ ফিরিতে গিয়া পিঠে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলাম। ধীরে ধীরে গত রাত্রের ঘটনা মনে আসিতে লাগিল। কেটার জন্য মন অস্থির হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, কেটা কোথা—সে কেমন আছে?

রাজাবাহাদুর উত্তর করিলেন, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—জখম গভীর না হ'লেও সেপ্‌টিক হবার ভয় থাকায় এখানে রাখা হয় নি। প্রথমটা মন বিশ্বাস করিতে রাজি হইল না। ভাবিলাম, আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গল্প বানাইয়া বলিলেন—কেটা হয়তো বাঁচিয়া নাই। রাজাবাহাদুরের দুই হস্ত নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম, সে বেঁচে আছে তো?

উত্তর দিলেন, আমি মিথ্যা বলি নি, তবে সে হাতে আঁচড় খেয়েছে। এখানে ফার্ষ্ট এড সব দেওয়া হয়েছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাহার পর কি ভাবে মৃত ব্যাঘ্রসহ আমাদের জঙ্গল হইতে আনিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন। বাঘের ঘন ঘন গর্জ্জনের সহিত একাধিক বার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া রাত্রেই সার্চ পার্টি লইয়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। কোন্ গাছে উঠিয়াছিলাম মাহুত জানিত, দিক্‌ভ্রম হয় নাই। সঙ্গে অনেক উজ্জ্বল সার্চ লাইট থাকায় অল্প সময়ের ভিতর আমাদের বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। বিবরণ শেষ করিয়া বাঘ আনিতে আদেশ করিলেন। প্রায় আট-দশজন লোক তিনটি বাঁশে ঝুলাইয়া বাঘকে আনিল, দেখিলাম মৃত রাক্ষসের অসাড় মূর্ত্তি। আমাকে থাবার মধ্যে পাইলেও অক্ষত অবস্থায় ছিলাম কেন—অনুমান করিলাম। লাফ মারিবার সময় শূন্য পথেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল; যে ধাক্কায় আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, তাহার পিছনে ছিল মাত্র প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের অকর্ম্মণ্য বেগ।

এত বেলা পর্য্যন্ত ছাল ছাড়ানো হয় নাই কেন—জিজ্ঞাসা করিতে রাজাবাহাদুর হাসিয়া উত্তর করিলেন, আপনার নিজের হাতের শিকার, সম্পূর্ণ জন্তুটি আপনাকে না দেখিয়ে খালপোষ করাতে পারি নি। কোথায় গুলি লাগিয়াছে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলাম। বাঘের দেহটা নিকটে আনিতে দেখিলাম, বন্দুক ও পিস্তলের গুলি মাথার তিন-চার জায়গায় এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিয়াছে, পিছনের একটি পা প্রায় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন—কেবল চামড়ায় ঝুলিতেছে। লক্ষ্য করিলাম, কেটার কুকি প্রভুকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টার প্রমাণস্বরূপ তখনও বাঘের পিঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অস্থি ভেদ করিয়া সমস্ত অস্ত্রটি আমূল প্রবেশ করাইতে কতখানি মরিয়া হইতে হইয়াছিল, বোঝা শক্ত নয়। প্রাণের প্রতি সামান্য মমতা থাকিলে কেহ এতটা সাহস দেখাইতে পারিত না। নিজের অজ্ঞাতে চোখে জল আসিয়া পড়িল। চক্ষু মুদিত করিলাম—ক্লান্তিও বোধ হইতেছিল।

তিন-চার দিনের বিশ্রামে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কেটার সংবাদ রাজাবাহাদুর সওয়ার দ্বারা আনাইয়াছিলেন। সে ভালই আছে। আজ তার স্বহস্তে লিখিত চিঠি পাইয়াছি, আমাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—আমি যে বাঁচিয়া নাই, একথা সে লিখিতে পারে নাই; কিন্তু সন্দেহের আভাস অনেক স্থলেই সুস্পষ্ট।

সপ্তাহ প্রায় শেষ হইতে চলিল, রাজাবাহাদুর ক্যাম্প উঠাইতে আদেশ দিয়াছেন। এক দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট শেষ করিয়া আমরা হাতীতে উঠিলাম। এবার হাওদা ছিল না—সেগুলি গরুর গাড়ীতে পাঠানো হইয়াছে—সাথী হইলেন গৌরবাবু ও তৎসহ তরুণ জমিদার। হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি, সুতরাং সংস্কারগুলি বাদ দিয়া শিক্ষা পাই নাই। যত অঘটনের জন্য গৌরবাবুকেই নিমিত্ত করিলাম। পিছু-ডাক কোন সমাজে মঙ্গলজনক মনে করে না। গৌরবাবু ইচ্ছা করিয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন। শিকারে বাহির হইবার সময় এক ঘণ্টা ধরিয়া চুল আঁচড়াইতে কে মাথার দিব্যি দিয়াছিল? প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলাম।

সন্ধ্যার প্রারম্ভেই আমরা রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। আর কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারিলেই জলার পচা পাঁক অতিক্রম করিয়া পাকা রাস্তায় উঠিতে পারি—এমন সময় সামনের হাতীর সহিত আমাদের হাতীর কি মনোমালিন্য ঘটিল। দুই হাতী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই আমাদেরটা এমন গা-ঝাড়া দিল যে, তরুণ জমিদার ও গৌরবাবু চারজামা (নীচু তক্তপোশের মত বসিবার আসন) হইতে ছিটকাইয়া পাঁকে পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে পিছনে পড়িয়াছিলেন, তাহা না হইলে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যে অপর হাতী রণে ভঙ্গ দিয়া লাইনে যোগ দিল। আমাদের হাতী ঠাণ্ডা হইয়াছে। ফিরিয়া দেখি, ডুব জল না হইলেও গৌরবাবু হাবুডুবু খাইতেছেন, আর তরুণ জমিদার 'বাঁচান বাঁচান' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। আমি বেশ খুশি হইয়া উঠিলাম। এই জাতীয় মরা তরুণদের উপর জাতক্রোধ তো ছিলই, অধিকন্তু গৌরবাবু

পাঁকে হাবুডুবু খাইতেছেন দেখিয়া ভারী একটা পাশবিক আনন্দ বোধ করিতেছিলাম। বেশিক্ষণ এই ভাবে রাখা সুবিধার নয় ভাবিয়া মাহুতের পাগড়ী পাক দিয়া নীচে নামাইয়া দিলাম। উহার সাহায্যে দুইজনকেই পরে পরে ঝুলাইয়া তুলিলাম। গৌরবাবু হাওদায় উঠিয়াই তরুণ জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার চুলটা ঠিক আছে তো? আমি দেখিলাম, চুল যে অবস্থাতেই থাক, উহা ডেকরেশন হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম, গৌরবাবু, আপনার মাথায় জোঁক। বলিতেই তিনি প্রায় অজ্ঞান হইবার যোগাড় করিতেছিলেন। আমি পাগড়ীর সাহায্যে সেগুলি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর গৌরবাবু কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, নাক এবং কানও জোঁক বাদ দেয় নাই; জিজ্ঞাসা করিলাম, বড্ড জ্বালা করছে? তিনি উত্তর করিলেন, জ্বালা! জ্বালা না মশাই, এই নাক কান মলছি, আর কখনও আপনাদের সঙ্গে শিকারে আসব না। আমি বলিলাম, আপনার আসা উচিত নয়, কারণ জঙ্গলের মধ্যে চুল সামলান কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তরুণকে বাহিরে কিছু বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম, তোমরা চিড়িয়াখানায় আরাম কেদারায় বসিয়া শিকার অভ্যাস কর না কেন?

কণ্ডনুপল্লীর জঙ্গল (বেজওয়াডা)

শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাত গভীর অরণ্য ; নিস্তব্ধ রজনী। আমি একা। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি বনস্পতির আড়ালে। আহত শার্দ্দুল অনতিদূরে আমারই সন্ধানে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্কেত পাইতেছি শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনিতে। গতি কখনও চঞ্চল, কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত। মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে গুরুগম্ভীর বজ্রনিনাদের মত, তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে মনে হয়, পাহাড়ের অটল পাথরগুলি এখনই বুঝি ধ্বসিয়া পড়িবে। তাহার পর অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা, পরক্ষণেই দারুণ যন্ত্রণা-মিশ্রিত গোঙানি, যেন অভিশাপের অন্তর্ভেদী বাণী।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে গুলি চালাইয়াছিলাম। ছোট ৩০০'২৫ বোর রাইফেলের টোটা মাথায় কিংবা হৃদয়ে লাগিলে এরূপটি ঘটিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গুলি এমন কোন একটি স্থানে লাগিয়াছিল, যাহা মারাত্মক জখম ছাড়া আর বেশি কিছু করিতে পারে নাই। হরিণ-শিকারে আসিয়াছিলাম, সুতরাং বড় রাইফেলের বোঝা বহন করা প্রয়োজন বোধ করি নাই। বীটারেরা যখন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া পশু তাড়াইয়া আনিতেছিল, তখন ভাবিতে পারি নাই, বিরাটাকার কুলীনবংশোদ্ভব বাঘের সহিত অকস্মাৎ এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটিবে। যে মহড়া লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা একাধিক পশুর পথের সঙ্গমস্থল। এ রকমটি ক্বচিৎ দেখা যায়। কারণ জঙ্গলে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকায় প্রত্যেক জন্তু জাতি হিসাবে স্ব স্ব গন্তব্যপথ স্বতন্ত্র করিয়া থাকে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। হরিণ, শূকর, চিতার গম্যস্থল এক। কুলীন শার্দ্দুলের চরিত্রে আভিজাত্যের অভাব কখনও দেখি নাই। উক্ত ভয়াবহ জন্তুটির পদচিহ্ন না পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। আত্মরক্ষা ও শিকারের সফলতা সম্বন্ধে ৩০০'২৫ বোরই যথেষ্ট। ধূর্ত্ত ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন লেপার্ড যদি আসিয়াও পড়ে, তাহা হইলে তাহার অভ্যর্থনার উপযুক্ত সম্মান দিতে আমার হস্তস্থ রাইফেল পিছাইয়া যাইবে না। পাঁচ ফার্লং স্থান পরিধি লইয়া বীটারেরা অর্দ্ধচক্রাকারে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমি ছোট্ট এবং নিরীহ-দৃশ্য আগ্নেয়াস্ত্রটি লইয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলাম। ইতিপূর্ব্বে বহু জঙ্গলে ঘুরিয়াছি, কিন্তু প্রশস্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া কখনও শিকার করি নাই। মাইলের পর মাইল সরলরেখাযুক্ত রাস্তাটি ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্যবেধী হিসাবে আমার সুনাম আছে। তথাপি অসুবিধা বোধ করিতেছিলাম ; কারণ ডাইনের দিকে মুখ করিয়া রাইফেল ধরিলে হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরিয়া এক মুহূর্ত্তে টিপ করা সোজা নয়। সেইরূপ বাঁয়ের দিকে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে ডাইনে ঘোরায় অসুবিধাও সমান। যাহা হউক, রাইফেল চালানো সম্বন্ধে নিজের

প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা এক রকম ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অতি ক্ষীণ হইতে বীটারদের চীৎকার ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। আমি দক্ষিণ স্কন্ধে রাইফেলের বাঁট রাখিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। নিবিড় উত্তেজনায় আমার অন্তর থরথর কাঁপিতেছে। জঙ্গলের গভীরতা ভেদ করিয়া কখন কি বাহির হইয়া আসিবে ঠিক নাই। এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা সব কিছুর চেষ্টাই পণ্ড করিয়া দিতে পারে। প্রতিটি মুহূর্তে হৃদ্‌স্পন্দন দ্বিগুণভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলাম খস্‌খস পদশব্দ। অভিজ্ঞতায় বুঝিলাম, জানোয়ারটি ছোট। তথাপি প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। অতি নিকটে ঝোপটি নড়িয়া উঠিল। ঘোড়া টিপিয়াছিলাম প্রায়। হতাশ হইয়া গেলাম। পদশব্দ জানোয়ারের নয়, একটি ময়ূর রাস্তা পার হইয়া গেল। শিকারে এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। দমিলাম না। কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম, এতখানি স্থান সম্মুখে রাখিয়া আর ভবিষ্যতে শিকার করিতে আসিব না। পাল্লার বাহিরে শিকার দেখিব, অথচ মারিতে পারিব না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? হতাশার কারণ অনুসন্ধান করিতেই মনে পড়িল, মাকুন্দ সেই লোকটির কথা। অযাত্রাকে প্রাণ ভরিয়া অভিশাপ দিলাম। প্রাতঃকালে করজোড়ে "গুড মর্নিং" করিয়া ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট-এর মিলন আমার সামনে না ঘটাইলে কি আমি তাহার পাকা ধানে মই দিতাম?

অযাত্রার কথা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। এই অবসরে একটি চতুষ্পদীয় আমাকে অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিবাদে সামনের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। জন্তুটি বৃহদাকার নেউল। দুঃখের কারণ ছিল না। তথাপি নিজের অপ্রস্তুত অবস্থাকে ক্ষমা করিতে পারিলাম না। আবার সেই পারাবতবক্ষ, দীর্ঘকেশযুক্ত, ক্ষীণকলেবর কবিকে মনে পড়িল। মনকে দৃঢ় করিলাম। তাঁবুতে ফিরিয়াই, খাই বা না খাই প্রথমেই সেই জীবটিকে তাড়াইব। প্রয়োজন হইলে নিতান্ত বিনীত ও ভদ্র ভাষা ব্যবহার করিব এবং তৎসহিত প্রথম শ্রেণীর ভাড়া হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিব, তুমি অপয়া। অর্থের বিনিময়ে মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা নিতান্তই বোকার কাজ হইবে। কেন? আমার শিকার-ব্যাধি তাড়াইবার জন্য পিসীমাই তো স্বস্ত্যয়নের স্রষ্টা গৃহপুরোহিতকে যথেষ্ট টাকা দিয়া থাকেন। আমি না হয় প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বহন করিলাম!

সময় ইতিমধ্যে সন্ধ্যার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দুই দণ্ড উত্তীর্ণ হইতে চলিল, একটিও সিগারেট খাইবার অবসর পাই নাই। নেশার দুর্দ্দমনীয় মোহ আমাকে প্রায় কাবু করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু বন্দুক ছাড়িয়া সিগারেট ধরাই কেমন করিয়া? রেডি ট্রিগার অসাবধানতাবশত যদি ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে হরিণ অন্য দিকে পলাইবে।

এই সব কিছুর জন্যই দায়ী সেই আধ-মরা কবি। রজকের বাড়িতে ঢাকাই শাড়ি

দেখিয়া যে কল্পিত স্বত্বাধিকারিণীর প্রেমে পড়ে, সে আর যাহাই হউক, ভেজালহীন অপয়া না হইয়া যায় না। এখান হইতে ফিরিয়াই কবিকে বেধড়ক মার দিব ঠিক করিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, কি সর্ব্বনাশ! সত্যই যদি মারিয়া বসি তো জঙ্গলের ভিতর অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ি পাইব কোথা হইতে? অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। জীবন্ত অপয়া, তাহাকেও ঠ্যাঙাইবারও উপায় নাই।

দ্বিপ্রহর হইতে বন ঠ্যাঙানো চলিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কিছু পাইলাম না, এবং যদি বা কিছু পাইলাম, তাহাও আবার ময়ূর ও নেউল। উহারা গেলে আবার অন্যমনস্ক হইলাম। সর্ব্বোপরি একটিও সিগারেট জোটে নাই। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে। এতগুলি অঘটনের যোগাযোগ ঐ অপয়াটাকে সঙ্গে না আনিলে ঘটিত না। পুনরায় এক ছাঁচে ঢালা কঙ্কালসার ওয়ান-ডাইমেনশনাল তন্বীদের সেই কবিকে মনে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস সহ নিজের দৃঢ়পেশীবহুল উলঙ্গ বাহুটি নানাভাবে ঘুরাইয়া দেখিলাম। তাহার পর আত্মাকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলিয়া, উহারা বোঝে না। না বুঝুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁবুতে ফিরিয়া ঐ কবিকে মারিবই ঠিক করিলাম। একান্তই যদি প্রয়োজন হয়, মারের পর ফার্ষ্ট এড প্রয়োগ করিলেই চলিবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শিকারের ব্যর্থতায় মন দমিয়া গিয়াছিল। 'ত্নত্তোর' বলিয়া পার্শ্বে রাইফেলটি রাখিতে যাইব, অমনই কানের অতি নিকট দিয়া বোঁ করিয়া গুলি বাহির হইয়া গেল। অজ্ঞাতে ট্রিগার টিপিয়া ফেলিয়াছিলাম।

পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দের প্রতিধ্বনিতে বার্ত্তা জীবন্ত ও সচেতন অবস্থায় শুনিলাম। গুলি ও আমার মাঝে আনুমানিক অর্দ্ধ ইঞ্চির ব্যবধান না থাকিলে আজ এই শিকারকাহিনী লিখিতাম না।

প্রতিধ্বনি এখন আর নাই। কিন্তু তাহার রেশ হৃদয়কে দারুণভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। শিকারীর এই জাতীয় দুর্ব্বলতা শোভনীয় নয়। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিবার সাহস নাই। বাঘের সামনে বহুবার পড়িয়াছি, এবং বহুবার তাহাদের আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছি। কিন্তু সজ্ঞানে কখনও মৃত্যুকে এই ভাবে উপলব্ধি করি নাই।

আবার গুলি ভরিয়া লইলাম। এই ঘটনার পর বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া গিয়াছে। অদূরে বীটারদের চীৎকারের পরিবর্ত্তে তাহাদের অস্পষ্ট গলা শুনিতে পাইতেছি। হঠাৎ চীৎকার থামাইবার কারণ কি? অস্পষ্ট মন্ত্রণাই বা কেন? অনুমান করিলাম, একটা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে। কি হইতে পারে? হয়তো বা লেপার্ড দেখিয়া থাকিবে। হউক না লেপার্ড, তাহাতে অতগুলি লোকের ভীত হইয়া পড়িবার কারণ কি আছে!

আরও কয়েক মিনিট সময় কাটিল। ভাবিলাম, এই সুযোগে একটা সিগারেট ধরাইয়া

লই। কোনও প্রকারে এক হস্তে সিগারেট মুখে পুরিয়া বাজিকরের ভঙ্গিতে দিয়াশলাই জ্বালাইতে যাইব, এমন সময় দক্ষিণ দিকের জঙ্গল ভীষণভাবে নড়িয়া উঠিল। তাহার পরেই দেখিলাম একটি ছোটখাটো খড়ের ছাউনিযুক্ত কুটিরের চালা শূন্যে উড়িতেছে। চকিতে দিয়াশলাই সিগারেট ফেলিয়া রাইফেল তুলিয়া ট্রিগার টিপিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ু—ড়্—ড়্— ম্ শব্দে গুলি বাহির হইয়া গেল, এবং পর-মুহূর্ত্তে বন্দুকের আওয়াজকে নিষ্প্রভ করিয়া শার্দ্দুলের হুঙ্কার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী কম্পিত করিয়া তুলিল। দেখিলাম এক লম্ফে বাঘ রাস্তা পার হইয়া সামনের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যবশত শার্দ্দুল আমাকে দেখে নাই। বনের রাজা আহত হইয়াছে। এ অবস্থায় ঘন কণ্টকময় ঝোপের ভিতর তাহার পিছনে যাই কেমন করিয়া ?

গুলি যখন চালাইয়াছিলাম, তখন এমন সময় ছিল না যে, জন্তুটি আসলে কি, দেখিয়া লই। সম্বর-হরিণও অনেক সময় লাফ মারিয়া শূন্যে উড়িয়া থাকে। গুলি চালাইবার পর হুঙ্কার শুনিয়া বুঝিলাম, বাঘ মারিয়াছি। এখন একটি মাত্র টোটা সম্বল। সাধারণত আমি পাঁচটি কামরায়ই টোটা ভরিয়া লইয়া থাকি। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। খোলা তিনটি গুলি বাহিরে ছিল, সেই কারণে নূতন প্যাকেট খুলিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। তাহা ছাড়া উপরি টোটা যখন মাল-বাহক কুলির নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তখন প্রয়োজন হইলে টোটার অভাব মোচন করিতে পারি। পিছন ফিরিয়া গুলির সন্ধান করিতে দেখিলাম, কুলি ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়াছে।

আমি একা। দিনের আলো শেষ হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের বিরাট ছায়ার অন্ধকারে আমি ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইতেছি। সব কিছুর অদ্ভুত সমাবেশে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। বীটারদের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। নিশ্চিত বুঝিলাম, উহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল এখন একটিমাত্র টোটা। ইহা লইয়া শিকারের পিছনে ধাওয়া করা চলে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মাঝে মাঝে বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। গাছে উঠিয়া রাত্রিটা যে কাটাইয়া দিব তাহারও উপায় নাই। ঘোরতর সামরিক প্রথায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছি। দুইজনের সাহায্যে পোশাক পরিয়াছিলাম। সুতরাং অন্তত একজন হাত না লাগাইলে কঠিন চামড়ার লেগিং ও বুটজুতা খোলা অসম্ভব। পরিচ্ছদকে স্মার্ট করিতে গিয়া যে চওড়া বেল্ট ও কষা ব্রীচেস পরিয়াছিলাম, তাহাতে মাথা নত করিবার উপায় নাই। সর্ব্বত্র লৌহবেষ্টিত বুট, একটু নড়িলেই মসমস আওয়াজ করিয়া উঠে। এই শব্দই শার্দ্দুলকে আহ্বান করিয়া আনিবার পক্ষে যথেষ্ট। যদি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে অন্ধকারে তাহার মর্ম্মস্থল (বুক ও মাথা) সন্ধান করিব কেমন করিয়া ? উপায়ান্তর না দেখিয়া একটি নাতিদীর্ঘ গাছের পিছনে আশ্রয় লইলাম।

কতক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম মনে নাই। অকারণ চলন্ত মোটা দড়ির ভীতিপ্রদ চাপ ও গতি কোমর হইতে বুক পর্য্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলাম। নিশ্চিত বুঝিলাম, কোন সরীসৃপ আমাকে বেষ্টন করিয়া গাছে উঠিতেছে। আমি পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেলাম। নিশ্বাসও বুঝি তখন রোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সাপটি হয় ঢেমনা, নয় অতি প্রাচীন রাজ-গোখরো। গাছের উপর পাখির বাসার সন্ধানে চলিয়াছে। ডিম্ব উহাদের উপাদেয় প্রিয় খাদ্য। একটির পর একটি কুণ্ডলী মুক্ত হইতেই স্থানত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কারণ সন্ধানের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, পদহীন জীবটি কিছুক্ষণ পরে যে পথে উঠিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া আসিবে এবং আমাকে বেষ্টন করিয়াই নামিবে।

এক পা অগ্রসর হইয়াছি, অমনই জুতা ও লেগিঙের ঘর্ষণে এমন একটি কর্কশ শব্দ হইল, মৃত্যুর নির্ভুল সঙ্কেত ছাড়া আর কিছু তাহাকে ভাবা চলে না।

এখন বুট না খুলিতে পারিলে বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কিন্তু খুলি কেমন করিয়া? কোন প্রকারে ছেলেবেলায় মার্বেল খেলার অনুকরণে মাটিতে বসিতে পারিলে, তবেই এই সামরিক পাদুকার কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কারণ হস্তিপৃষ্ঠে হাওদায় আসীন কোন রাজপুরুষের এই চেষ্টার পর ব্রীচেসকে দর্জ্জী-বাড়ি পাঠাইতে হইয়াছিল। দর্জ্জীর সহায়তায় আপত্তি নাই, হাওদার আড়াল তো আমার নাই। তথাপি বেপরোয়া হইয়া পাদুকার উপর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলাম। জুতা খুলিল। কিন্তু লেগিং দুইটা আঁকড়াইয়া রহিয়া গেল। অনভিজ্ঞ কুলি কি ভাবে ফিতা বাঁধিয়াছিল বুঝিবার উপায় ছিল না। বেশটি দাঁড়াইল কতকটা পট্টিদার পোস্টাল পিয়নদের মত।

এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইতেছি, আবার থামিতেছি। কি জানি, যদি গতিশীল জীব দেখিয়া বাঘ সন্দেহ করিয়া বসে। হিংস্র জন্তুর সন্দেহ জিনিসটা সব সময়ই বিপজ্জনক। ক্রমে বড় গাছটার পাশে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি। অকস্মাৎ একই সঙ্গে একাধিক মানুষের দীর্ঘনিশ্বাস শুনিলাম। তাহার পর সেই আওয়াজ হাঁপানির টানের মত লাগিল। সব কয়জনই যেন শ্বাসরোধ হইয়া মরিতে বসিয়াছে। আমার দেহের রক্ত-চলাচল স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। ভাবিলাম, অবশেষে অশরীরীর আক্রোশে পড়িলাম না তো? যে বাঘটিকে আহত করিয়াছি, তাহার সহিত ঐ জাতীয় গল্প জড়িত আছে। তবে কি বাস্তবিক বাঘ নয়? নিশ্চয় নয়। এতক্ষণ সাহস করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। এইবার সর্ব্বদেহে কেমন একটা শিথিলতা বোধ করিতে লাগিলাম। পিসীমা কোন্ দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতেন জানা ছিল না। তথাপি ভগবান অন্তর্য্যামী ভাবিয়া কায়মনে স্মরণ করিলাম। ফল হইল বোধ হয়। মনে বল পাইয়া যুক্তির আশ্রয় লইলাম। স্থির করিলাম, শব্দ জঙ্গলের হরিজন কঙ্কালখাদক হায়েনার। আহারের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলমা,

বাঘ নিকটে নাই। কারণ বাঘে হায়েনায় সম্বন্ধ তেমন মধুর নয়। কিন্তু হায়েনাও যদি সদলে আসিয়া পড়ে; তাহাদের আক্রমণ হইতে বাঁচিব কেমন করিয়া? টোটা তো মাত্র একটি। আসলে উহারা প্রায় নেকড়ের জাতি। অন্য বিষয়ে যেটুকু পার্থক্যই থাকুক, হিংস্র প্রকৃতি উভয়ের সমান। সুযোগ পাইলেই সদলে আক্রমণ করিয়া উহারা জীবন্ত প্রাণীরও মাংস ছিঁড়িয়া খাইয়া থাকে।

গাছে উঠিবার উপায় নাই। কারণ কোন ডালই নাগালের মধ্যে পাইলাম না। ফাটলের আশ্রয় লইয়া উঠিব, সে সাহসও নাই। তাহাদের অস্তিত্ব স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিতে গেলে হয়তো কেউটে অথবা আর কোন বিষধরের মাথায় হাত বুলাইয়া ফেলিব। বাঘকে দেখিলে অন্তত শেষ সম্বল টোটার সাহায্য লইতে পারিব, কিন্তু সর্পের ছোবল হইতে মুক্তি নাই।

জীবনের শেষ সময় যে অতি নিকট, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। যে কয়টি জীব আমাকে ঘিরিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে যে কেহ আমার সন্ধান পাইলেই ভবলীলা সমাপ্ত হইতে সময় লাগিবে না। আমি উহাদের এত নিকটে যে, সন্ধান না পাওয়াটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পিসীমার অবাধ্য হইয়াছি বলিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার আসিতে লাগিল।

হঠাৎ সমস্ত পর্ব্বতচূড়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল বাঘের রোষ-মিশ্রিত কঠোর আহ্বানে; আততায়ীকে সে বধ করিতে চায়। সামনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অন্ধকার অপসারিত হইয়াছে। রাস্তাটি জ্যোৎস্নাপ্লুত, কি ভাবে গভীর রাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি অনুমান করিতে পারিলাম না। আসন্ন মৃত্যুকে এইবার সহজভাবে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ক্ষুদ্র অস্ত্রটির সর্ব্বদেহ প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিলাম। হয়তো এখুনি তাহার নিকট চিরবিদায় লইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক দামী ও শক্তিশালী রাইফেল কিনিয়াছি এবং তাহাদের হারেমে স্ত্রী-ভোগের মতই ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু এই ৩০০`২৫ বোরকে নিরবিচ্ছিন্ন ভোগের বস্তু ভাবি নাই। নিতান্ত আপনার এবং পরম বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছি, ভালবাসিয়াছি, ঠিক যে ভাবে আমার স্ত্রীকে অতি আপনার এবং পরম বন্ধু বলিয়া ভাবি। ৩০০`২৫ বোর বন্দুকটি যে আমার বাংলার সাথী! হাতে খড়ি ইহার নিকটই হইয়াছিল। ওস্তাদের সুনামও ইহার নিকটই পাইয়াছিলাম। জঙ্গলের বিপদে এই অস্ত্রটি আমাকে কখনও অসহায় ভাবিতে দেয় নাই।

অস্ত্রটি হৃদয়ের অতি নিকটে টানিয়া লইলাম, নিতান্ত শিশুর মত নিবিড়ভাবে! কেমন করিয়া বুঝাইব, সেই মুহূর্ত্তে বাল্যসখী শিকারের সহধর্ম্মিণী ব্রোঞ্জমিশ্রিত কঠিন ইস্পাতের স্পর্শে কতটা সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম। কিন্তু আদরের সময় ইহা নয়। পরক্ষণেই বন্দুককে সংহারোপযোগী করিয়া স্কন্ধ ও বগলের মধ্যস্থলে বসাইলাম। ইহার ঠিক পূর্ব্বের ঘটনা প্রথম ছত্রে লিখিয়াছি।

* * * *

গোঙানি শুনিয়া বুঝিলাম, হয়তো ব্যাঘ্র এইবার কাবু হইয়াছে। আর একবার গাছে উঠিবার চেষ্টা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় খস-খস-খস-খস-খস শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল। প্রতিটি পদক্ষেপ মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া সেন্ট্রির মত প্রস্তুত হইলাম। হঠাৎ শুষ্ক পত্রের সাঙ্কেতিক ক্রিয়া থামিয়া গেল—অতি নিকটে। এইবার আমাদের বোঝা-পড়ার পালা। রাইফেল তুলিতেই দেখিলাম, বাঘ রাস্তার ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁড়াইবার ভঙ্গি সহজ নয়, নিশ্চয় প্রথম গুলিতে মাজা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ঝাপ্সা আলোয় কোন প্রকারে মাথা আন্দাজ করিয়া ট্রিগার টিপিলাম।

নিস্তব্ধ অরণ্য বিকট শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র লম্ফপ্রদান করিল। আমাকে লক্ষ্য করিয়া নয়, যেদিক দিয়া আসিয়াছিল সেই দিকে। সামনের ঝোপ ভাঙিয়া তছনছ হইয়া গেল। বাঘের বিচিত্র আচরণে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

রাত্রি ক্রমশই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নার আলোকে সব কিছুই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর দেখিতেছি। বাঘের আওয়াজ আর শুনিতে পাইতেছি না।

এই নিস্তব্ধতার পরের ঘটনা কি ঘটিবে অনুমান করিবার উপায় নাই। কারণ যে জঙ্গলে আসিয়াছি, তাহা অনাবৃত বাঘ ছাড়া, চিতা লেপার্ড প্যান্থার নেকড়ে হায়েনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবল পরাক্রমশালী অজগরের নিবাস-স্থল।

শরীর ঝিমঝিম করিতেছিল, তথাপি প্রাণের মায়ায় রাইফেল উল্টাইয়া লাঠির মত ধরিলাম। সেই মুহূর্তে মাথার ঠিক মধ্যস্থলে মনে হইল বিষধর দংশন করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই অনুভব করিলাম, মুখে গ্যাঁজলা জমিয়া উঠিতেছে এবং লালা আঠার মত কঠিন ও চটচটে হইয়া আসিতেছে। মাথাও যেন নেশায় টলিতেছে, আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, বসিয়া পড়িলাম। ঠেকা ব্যতীত বসিবার শক্তিও তখন নাই, বেহুঁসের মত নিজেকে এলাইয়া দিলাম।

নিশ্চয় বেশিক্ষণ এই ভাবে ছিলাম না। জনমানবহীন অরণ্যে অকারণ বহু লোকের চীৎকার ও তীব্র আলোকরশ্মিতে তন্দ্রাবেশ কাটিয়া গেল। সন্দিগ্ধভাবে চোখ রগড়াইয়া দেখিলাম, বীটাররা মশাল জ্বালাইয়া আমার সামনে কোলাহল করিতেছে।

দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই মাথাটা টলিয়া গেল। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় অল্প সময়ের ভিতরেই কতকটা সুস্থ বোধ করিলাম।

অদূরে গোযান অপেক্ষা করিতেছিল। মনুষ্যস্কন্ধে ভর দিয়া উঠিতে যাইব, এমন সময়ে দেখি কাঁটাযুক্ত একটি গাছের ডাল আমার কোটে আটকাইয়া ঝুলিতেছে।

থাক, তাহা হইলে সর্পাঘাত হয় নাই! কণ্টকপূর্ণ নীরস তরুশাখাই মস্তকে বিদ্ধ হওয়ায় সর্পদষ্টের মত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আতঙ্ক কাটিতে সাহস পাইলাম। কোন

প্রকারে দুইজনের স্কন্ধে ভর করিয়া গরুর গাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং প্রতি পদে দুর্গন্ধ কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া অবর্ণনীয় তৃষ্ণা ক্ষণে ক্ষণে নিবারণ করিলাম।

* * * *

আজ আমি সুস্থ ও সবল। ভয় পাইলে মানুষ যে অযথা মরিতে পারে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি কাঁটাযুক্ত নির্বিষ ডালের ছোবলে। এই অকারণ ভীতির জন্য মনস্তাত্ত্বিকদের নিকট:

কোন প্রকারে ভর দিয়া উঠিলাম

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। এই সঙ্গে আরও একটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা হইতেছে—অপরিস্রুত জল পান করিলে সুস্থ ও শক্তিসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা সব সময় থাকে না। আমার স্ত্রীর সহিত সশরীরে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বসবাস করিতেছি, তথাপি এই সত্যটি তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাইতে পারি নাই।

গভীর অরণ্যে একটি রাত্রি

সন্ধ্যা আগত প্রায়। জনমানবহীন মেঠো পথ। গরুর গাড়ী চলিয়া দুই ধারে ফুটখানেক করিয়া গভীর হইয়া গিয়াছে। গাড়ী চলিলে রেলের লাইনের মত সোজাই চালাইতে হয়, মোড় ফিরাইবার উপায় নাই। পাড় ওঠার মত স্থানটি ঘাসে আচ্ছাদিত থাকিলেও মাঝে মাঝে এখনও পাথরের কুচি দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও সময় ইহা রাজপথ ছিল। ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার হস্তান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে এমন একটি গোষ্ঠীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাঁহাদের নিকট বৎসরান্তে কয়েক ঝুড়ি মাটীর বেশি প্রত্যাশা করিবার উপায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ত্তাদের নেকনজর যে এদিকে আকর্ষিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ নূতন ফেলা মাটি মাঝে মাঝে ঢিপির আকার ধারণ করিয়াছে। লেভেল করা হয় নাই—হইবেও না। সকলে জানে উপযুক্ত সময় গরুর গাড়ীর চাকাই এই সামান্য ত্রুটি ঠিক করিয়া লইবে। সাধু হইলেও কীর্ত্তিটি কর্ত্তাদের হৃদয়হীনতার পরিচায়ক হইয়া আছে। প্রমাণ আমার নাসিকা এবং টাকযুক্ত মাথা। ইতিমধ্যে যে কয়বার হেঁচকা খাইয়াছি, তাহাতেই উক্ত অঙ্গের স্থানবিশেষ স্ফীত ও চিক্কণ হইয়া উঠিয়াছে এবং যে কয়টি হেঁচকা বাকী আছে, তাহাতে যে রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে সন্দেহ করি না। শুক্‌না বাখারির ছাউনির সহিত সজোরে সংঘর্ষিত হইলে মানুষের চামড়া আর কত সহ্য করিতে পারে।

সরকারী কাজ। গভীর অরণ্যে মন্দিরের ছবি পরীক্ষা করিয়া ফিরিতেছিলাম। গাড়োয়ান ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাম্পে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তার-যোগে উপরওলা তাড়া দেওয়ায় সকলেই না খাইয়া ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়াছিলাম। সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়াছে, তাহার উপর রাত্রেও যদি অভুক্ত থাকিতে হয় তাহা হইলে সময়মত রিপোর্ট লেখা আর সম্ভব হইবে না। গো-যানে নাসিকার সামান্য বিকৃতি মারাত্মক নয়, কারণ আমার তাহাতে সৌন্দর্য্যহানির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু রিপোর্টের বিলম্ব হইলে কর্ণ ও প্রাণ পর্য্যন্ত দলিত হইতে পারে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে আহার ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম, কিন্তু আহার সম্বন্ধে আমার শুচিবাই ছিল। পাশাপাশি দুইটি গ্রামের মাঝে একটিমাত্র পুষ্করিণী; তাহাতেই স্থানীয় লোকেরা অবগাহন স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় কাচা, থালা ধোয়া এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে মনকে দৃঢ় করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আমরা চলিয়াছি। ঈশান কোণে তখন বিক্ষিপ্ত ধূসরবর্ণ মেঘের টুক্‌রা ক্রমান্বয়ে ঘোর-তর কৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। ঝড় ও বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি ঠাণ্ডা বাতাসে মাঝে

মাঝে দম্‌কা হাওয়ায় শুক্‌না খাড়াই ঘাসগুলি দুলিয়া উঠিতেছে। রাস্তার দুই ধারে পানের বরোজ। মাঝে মাঝে খাড়াই ঘাস, নারিকেল, খেজুর ও বট গাছ। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে তখন আট মাইল পথ বাকি। পথের মাঝে দুই মাইল প্রস্থ ত্রিশ মাইল দীর্ঘ জঙ্গল। তাহার পর হিন্দুপুরের মাঠ। মাঠ উত্তীর্ণ হইলে গ্রাম। কোন প্রকারে জঙ্গলটা পার হইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মেঠো পথ, বাদলা হাওয়া, চাকার কঁ্যাচর কঁাচর খট্‌ শব্দ, ঝিল্লি পোকা এবং ভেকের ডাকে যে ঐকতান সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কেমন একটা বয়স-কমান প্রভাব ছিল। অজানা প্রিয়া এবং ছোট্ট একটি নিরিবিলি ঘর যে মনে মনে গড়িয়া তুলি নাই বলিতে পারি না। ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আমি একজন ডিসিপ্লিন্‌ড সরকারী অফিসার। সরকারী কর্ত্তব্য সাধনই আমার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রিয়ার স্থান সেখানে নাই। চমক ভাঙ্গিল হঠাৎ গাড়ীটা একদিকে কাৎ হইয়া যাওয়ায়। ধাক্কা সাম্‌লাইয়া নাসিকার গঠনের পরিবর্ত্তন হস্তের দ্বারা অনুভব করিতেছিলাম—বহু দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। চারপাশে তাকাইয়া দেখিলাম গোধূলির শেষ দীপ্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। অদূরে বনানী গভীর হইয়া আসিয়াছে এবং তাহার গাঢ় ছায়ায় ঘোরতর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই গর্ভে আমাদের রাস্তাটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সামনেই ভাঙ্গা পোল। তাহার জন্ম-ইতিহাস জানিতে হইলে সুদূর অতীত অনুসন্ধান করিতে হয়। খিলানগুলিতে বালির চিহ্ন মাত্র নাই, ইটগুলিও গলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ভীতিপ্রদ ফাটল সরীসৃপের আবাসস্থান হইয়া আছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়—পোলটি এখুনি বুঝি ধ্বসিয়া পড়িবে। পোলের তলায় নালাটিও ভয়াবহ। ফাটলের প্রতিবিম্ব নানা রূপ ধরিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। গাড়োয়ান অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া গরু দুইটাকে ঢিপি অতিক্রম করাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জেদী জন্তু দুইটা—কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। কান খাড়া করিয়া পাশের খাড়াই ঘাসের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। আতঙ্কের কারণ অদৃশ্য হইলেও বলদ দুইটার কাছে তাহার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত।

আমারও কান খাড়া করা ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকিতেছিল না। গত বৎসরই ত ঠিক এই ঘটনার পরমুহূর্ত্তে বাঘের মুখ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। খানসামাটা ঠিক সময় দেখাইয়া না দিলে এবং তৎক্ষণাৎ রাইফেলের ট্রিগার না টিপিলে আজ আমার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিত। পাঁচ-ছয় হাত তফাতে নয় ফিট ব্যাঘ্রের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। টিপ করিবার পর্য্যন্ত সময় ও সাহস ছিল না। চোখ কান বুজিয়া ঘোড়া টিপিয়াছিলাম মাত্র। ৪:৫ বোর্‌ হইতে নির্গত ঘূর্ণায়মান গুলি বাঘকে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া পিছনের গাছে প্রায় তিন ইঞ্চি ঢুকিয়া গিয়াছিল। অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনার যোগা-যোগ ভাবিতেই অজানা প্রিয়া ও গোপন ঘর উধাও হইয়া গেল। অভ্যাসমত বসিবার স্থানটি হাতড়াইতে লাগিলাম—রাইফেল নাই। মোটা কোটের পকেট খুঁজিলাম—রিভল্‌বার নাই।

হেড আপিসের তাড়ায় দুইটি অস্ত্রই সঙ্গে লইতে ভুলিয়াছি। ড্রইংরুমে তর্ক উঠিলে সব সময় চার্ব্বাককে সমর্থন করিতাম। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিরাকারে বিশ্বাস তো দূরের কথা, শিব, দুর্গা, কালী সব কয়টি দেবদেবীর আরাধনা একযোগে সুরু করিয়া দিলাম। হৃদয় ঘোরতরভাবে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্রাহি মধুসূদন ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা অন্তরে নাই। ভয় যে পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিবারও উপায় নাই। হাজার হোক্ লোকে ভাবে আমি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, আমার অধীনে···

ভাবিলাম, গাড়োয়ানটার গা ঘেঁষিয়া বসি। হোক্ না সে গাড়োয়ান, তবু মানুষ তো। বিপদের সময় মানুষ মানুষকেই সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু গোলামির জাত্যভিমান আমার বাহ্যিক প্রকাশকে ভিন্নমুখী করিয়া দিল। আমি গদিয়ান চালে তাহাকে দ্রুত গাড়ী চালাইতে হুকুম করিলাম। সুদূর পল্লীগ্রামের নিরীহ গাড়োয়ান বন্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষা রাজকর্ম্মচারীকে বেশি ভয় করে। বিশেষ করিয়া আমার মত একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে। উঠিতে বসিতে জম্‌কালো পরিচ্ছদভূষিত আরদালীকে সে সামরিক প্রথায় সেলাম ঠুকিতে দেখিয়াছে। কখন কিসে আমি বিগ্‌ড়াইয়া যাইব ঠিক নাই। সে চাবুক ও পদাঘাত করিয়া জন্তু দুইটাকে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু গাড়ী চলিল না। চলিবে কেমন করিয়া—বলদ নড়িলে তবে তো গাড়ী চলে ?—জন্তু দুইটা সেই যে কান খাড়া করিয়াছে তাহা আর নামাইবার নাম নাই। ইচ্ছা হইতেছিল চাবুকটা কাড়িয়া লইয়া কানের উপর বসাইয়া দি। কান নিচু দিকে ঝুলিলে অন্তত ভয় কিছু কমিতে পারে।

হঠাৎ দেখিলাম বলদের দ্রষ্টব্য স্থানটি নড়িয়া উঠিল। উঁচু ঘাস উপরের দিকে দুলিতেছে। ইহাতে ধানের উপর ঢেউ খেলার কবিতা নাই। খাঁটি ধাবমান জানোয়ারের একটি নির্দ্দিস্ট গতি—তাহারই দোলা উপরে সঙ্কেত করিতেছে। গরু দুইটা ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিল। গাড়োয়ান হঠাৎ তারস্বরে গান ধরিল ;—তামাকের সরঞ্জামের টিনের বাক্সটা লইয়া মরিয়া হইয়া তবলা বাজাইবার অনুকরণে পিটিতে আরম্ভ করিল। তাল নাই, সুর নাই—তথাপি সঙ্গতের সহিত তাহা সঙ্গীত বলিয়া মানিয়া লইলাম। পদমর্য্যাদা তখন ভুলিয়াছি, ত্রাসে জিহ্বা শুকাইয়া গিয়াছে। আমিও গাড়োয়ানের ভাষায় বিকট চীৎকার করিয়া গান ধরিলাম। কোন্ সুর গাহিয়াছিলাম মনে নাই, তবে তাহা কোন রাগ-রাগিণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। অনু-প্রাণিত হইয়া গাড়োয়ানের পিঠে যে প্রচণ্ড দুইটি সম্ ঠুকিয়াছিলাম তাহা মারাত্মক অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিনা লাইসেন্সে যে বে-আইনী করিয়াছিলাম তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। ভয় আমাকে গ্রাস করিয়াছিল। অন্তরে যে বিভীষিকা দেখিতেছিলাম তাহারই প্রকাশ হইয়াছিল গাড়োয়ানের পিঠে সমের দ্বারা।

উৎকট সম্—গাড়োয়ানের গান—বলদের লাঙ্গুলমর্দ্দনের মাঝে কখন গাড়ীটা ঢিপি পার হইয়া আবার সমতল মাটির উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা

আমিও গাড়োয়ানের ভাষায় গান ধরিয়া দিলাম

নালাটার একেবারে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। আর কয়েক হাত অগ্রসর হইলেই পোলের উপর গাড়ীটি উঠিবে, এমন সময় বাম দিকের খিলানের তলায় দেখিলাম একটি জন্তু ঢুকিয়া পড়িল। সম্পূর্ণ দেহ আবৃত হইল না। লেজ ও পিছন অংশ বাহিরে থাকিয়া গেল। লেজটি কুকুরের নয়, শৃগালের নয়, আকার তাহার মোটা বোড়া সাপের মত, দুলিতেছে। অকস্মাৎ বাম দিকের বলদটা বিকটভাবে ফোঁস্ ফোঁস্ আওয়াজ করিতে করিতে এমন ভাবেই মাথা ঝাড়া দিল যে, জোত খুলিয়া গাড়ীটা কাৎ হইয়া পড়িল। গাড়োয়ানের হাত হইতে দড়ি তখন স্খলিত হইয়াছে। বলদটি বন্ধনমুক্ত হইয়া সামনের রাস্তা ধরিয়া ছুট্ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, আর একটি জন্তু বাঘের মত লাফ দিয়া বলদটাকে তাড়া করিয়াছে। সমস্ত শরীর ক্ষণিকের জন্য

হিম হইয়া আসিল। কেন বলিতে পারি না খিলানের তলায় নিজের অজ্ঞাতে চোখ চলিয়া গেল। সেখানে লুক্কায়িত জন্তুর লেজ অদৃশ্য হইয়াছে। হঠাৎ মনে আসিল আগুনই এখন প্রাণ বাঁচাইতে পারে। গাড়োয়ানটাকে ঝাঁকুনি দিলাম, কিন্তু সে কেমন জড়ভরতের মত হইয়া গিয়াছে। অগত্যা নিজেই আমার বসিবার স্থান হইতে খানিকটা খড় লইয়া মশালের আকারে বাণ্ডিল করিলাম। দিয়াশলাই খুঁজিতে গিয়া দেখি কোনখানে তাহার অস্তিত্ব নাই। বসিবার স্থানটি তচ্‌নচ্‌ করিয়া ফেলিলাম। কোন জায়গায় দিয়াশলাই খুঁজিয়া পাইলাম না। মৃত্যুর বিভীষিকা তখন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মাত্র আর কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর বুকে আমার স্থান। তাহার পর একটি থাবায় প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যাইবে। স্ত্রী-পুত্রের কথা মনে আসিল, তাহাদের সংস্থানের কথা ভাবিলাম। তাহার পরই মনে হইল সবই মায়া। কে কাহার! যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই রক্ষা করিবেন। আমি তো উপলক্ষ মাত্র। এই অল্প সময়ের ভিতরেই কেমন একটা ঝিমান ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। কাঠ-পিঁপড়ার কামড় খাইয়া বেদনার স্থানে হাত দিতেই অনুভব করিলাম দিয়াশলাইটি আমার মুঠার মধ্যেই রহিয়াছে। তবে চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে! উত্তেজনা ও ভয়ে কখন তাহা সজোরে চাপিয়া ফেলিয়াছি! যাহা হউক, দুই-চারিটি সম্পূর্ণ কাঠি পাইতে বিলম্ব হইল না। মশাল জ্বালাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। গাড়োয়ানটাকে মশাল ধরিতে বলিলাম। কিন্তু তখন তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। এখন করি কি? তাহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া গাছেও ওঠা যায় না। আবার ঝাঁকুনি দিলাম, কোন সাড়া নাই। এমন সময় অনতিদূরে যেদিকে বলদটা পলাইয়াছিল, সেই দিক হইতে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ আসিল—চিতা বাঘের শিকার ধরার মত আওয়াজ। কালবিলম্ব না করিয়া প্রজ্বলিত মশালটা ফেলিয়া নিকটবর্ত্তী নারিকেল গাছটার দিকে ছুটিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পা দুইটা কে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যতই দ্রুত চলিবার চেস্টা করি ততই গতি মন্থর হইয়া আসে। যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। তথাপি প্রাণের মায়ায় জোর করিয়া গাছটার দিকে আসিলাম। তলায় যে ঝোপ জমিয়াছে তাহাতে গাছের গোড়ায় যাওয়াও শক্ত। কোনপ্রকারে বাধা ঠেলিয়া ফিট দুই উঠিয়াছি, এমন সময় শুনিলাম ফোঁস শব্দ! একেবারে জাত সাপ ছোবল মারিয়াছে। লক্ষ্য আমার পায়ের দিকেই ছিল। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্ত্তে ছোবলটি মারিয়াছিল সেই সময়ই ভাগ্যগুণে আমার পা দুইটা দুই ফুট উপরে উঠিয়াছিল। ঘটনাটি স্মরণ করিতেও আজ শিহরণ আসে। প্রাণপণ শক্তিতে দেহটাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া উপরে উঠাইতে লাগিলাম। ডগায় পৌঁছাইতে বেশিক্ষণ সময় লাগিল না। দুই-চারিটি পাতার গোড়া জোর করিয়া একত্রিত করিয়া তাহার উপর বসিলাম এবং দুই হাতে অন্য পাতার গোড়া চাপিয়া ধরিলাম। গাছটি উঁচু না হইলেও বাঘ সম্বন্ধে নিরাপদ বলা চলে।

বুকের ভিতর স্পন্দন এমনভাবেই চলিয়াছিল যে, ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম—হয় তো

শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া এখুনি বন্ধ হইয়া যাইবে। তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে মাথাটা ঘুরিয়া উঠিতেছিল। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।

মেঘলা জ্যোৎস্নায় দেখিলাম মশালটি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ঝটিকার সহিত বারিপতনে আমি সিক্ত হইয়া গিয়াছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। দৃষ্টি তখন ঝাপ্সা আলোয় অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রথমেই মনে আসিল গাড়োয়ানটার কথা। তাহার বসিবার স্থানটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। সে ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে। বলদ নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া। অনুমান করিলাম—ভয় বলদটাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার দৃষ্টি তখনও সন্দিগ্ধ স্থানের দিকে। তবে কি বিপদ কাটিয়া যায় নাই! পলাতক গরুটির পিছনে যে একটি বৃহৎ আকারের চিতাবাঘ ছুটিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ চিতাবাঘের শিকার ধরার পর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শুনিয়াছি। চিতা বড় না হইলে একটি পূর্ণবয়স্ক বলদকে তাড়া করিত না। বলদটা মরিয়াছে এবং সদ্যলব্ধ শিকার ছাড়িয়া চিতা এদিকে আসে নাই। তবে কি আর একটি মাংসাশী ওৎ পাতিয়া আছে। অনুমান সত্য হইলে পলাইবার সময় আমাকে আক্রমণ করিল না কেন? ধাবমান শিকারকেই ব্যাঘ্র-জাতীয় জন্তুরা আগে আক্রমণ করিয়া থাকে। সব কেমন গোল পাকাইয়া যাইতেছিল।

নালাটার দিকেই মুখ করিয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনিলাম। ঝাপ্সা আলোয় যতটা দেখা যায় তাহাতে মনে হইল প্রায় গোটা বার বন্য-বরাহ জল খাইতে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে গুণ্ডাটি মাঝে মাঝে সচকিতভাবে বলদের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেছে। আবার নাসিকার অগ্রভাগের সাহায্যে মাটি খোঁচাইতেছে; পুনরায় খাড়াই ঘাসের দিকে তাকাইতেছে। হঠাৎ গুণ্ডাটি যুদ্ধং দেহির মত ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইল, তাহার পরই সদলে যে দিক দিয়া আসিয়াছিল সেদিকে চলিয়া গেল। ইহার পর মুহূর্ত্তে হঠাৎ দ্বিতীয় গরুটাও দড়ি ছিঁড়িয়া নালার দিকে বেগে ছুট দিল। গাড়ীটার অবলম্বন না থাকায় সামনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়া পড়িল, গাড়োয়ানও গড়াইতে গড়াইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অদ্ভুত দৃশ্য! একটি জীবন্ত মানুষকে কুমড়ার মত গড়াইতে দেখিলাম। যে-কোন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য দানব বাহির হইয়া আসিতে পারে এবং আসিলেই গাড়োয়ানকে অক্লেশে লইয়া যাইবে, আমি কিছুই করিতে পারিব না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অবর্ণনীয় আতঙ্কের মধ্য দিয়া কাটিতে লাগিল।

রাত গভীর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দাদুরীর কোলাহলে কোন জন্তুর পদশব্দ শুনিবার উপায় নাই। মনে মনে হাসিলাম। কিছুকাল আগে এই দাদুরীর ডাকই আমার মনকে কি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। একদৃষ্টিতে গাড়োয়ানটার দিকে তাকাইয়া আছি। ভাবিতেছিলাম —যদি লোকটার জ্ঞান ফিরিয়া আসে তখন কি করিব। করিবার আছে কি—ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছিলাম না। এমন সময় একটি বিরাট বাদুড় আসিয়া পাশের বট গাছটায় আশ্রয়

লইল। তাহার পর আর একটা ; দেখিতে দেখিতে অসংখ্য বাদুড়ের ভিড় লাগিয়া গেল ; দুই-একটার ডানা ঝাপ্টাও খাইলাম। তাহাদের কিচির মিচির শুনিয়া কতকটা অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। রাত পলে পলে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ঝড় ও বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। আকাশের মেঘাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যাওয়ায় শুভ্র জোৎস্নার আলোয় নিকটবর্ত্তী সব কিছুই প্রায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। গাড়োয়ান বেচারার পায়ের দিকের খানিকটা অংশ বৃষ্টির জলে ডুবিয়া গিয়াছে। একটা হাত মুচ্‌ড়াইয়া আছে। মুখটা বোধ হয় মাটির দিকে। ঘন কাদায় নাক পড়িলে দম বন্ধ হইয়া মারা পড়িবে। চাকাটা উহার উপর পড়ে নাই তো! পোলের নালার স্রোতের কল্ কল্ মৃদু শব্দ শুনিতে পাইতেছি। মেঘ গর্জ্জন ও বৃষ্টির পর রহস্যপূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একটা সন্দেহজনক শব্দ শুনিলাম—বাঘের আওয়াজের মত—অতি নিকটে। ফাঁপা স্থানে রক্ষিত বড় শিলে নেড়া ঘষার শব্দের সহিত ইহার মিল নাই। নিশ্চিত হইলাম—শব্দটি চিতার নয়, অভিজাত কুলোদ্ভব দুর্দ্দান্ত শার্দ্দুল তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। তাহার পর রাস্তার পাশের ঘাস নড়িয়া উঠিল। ঘাসের দোলা ক্রমান্বয়ে আরও নিকটে আসিল। আবার গুরুগম্ভীর সঙ্কেত—যেন এখনি বজ্র-নিনাদে সমস্ত বনানীর নিস্তব্ধতা আলোড়িত হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা হইল না—ঘাস নাড়া থামিয়া গেল। একদৃষ্টিতে সম্মোহিতের মত গাড়োয়ান ও খাড়াই ঘাসের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মনের অবস্থা তখন কি রকম হইয়াছিল প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরে একটা কম্পন অনুভব করিতেছিলাম। যদি শিথিলতাবশত নীচে পড়িয়া যাই তাহা হইলে আমাকেও—। আর ভাবিতে পারিলাম না। কিন্তু গাড়ীর ছাউনির উপর, ওটা কি—জাহাজ বাঁধিবার বিরাটাকার দড়ির মত, 'ওটা নড়ে না যে! ডগাটা ফুটখানেকের উপর মাথা খাড়া করিয়াছে'। আবার নীচু হইল। পরমুহূর্ত্তে মড় মড় করিয়া ছাউনীর পিছন দিকটা মুচড়াইয়া গেল—ঠিক যেভাবে দিয়াশলাইটা আমার হাতে নিষ্পেষিত হইয়াছিল। নিশ্চয় উহা ময়াল, দৈত্যের আকার লইয়া আসিয়াছে। গাড়ীর গোটা ছাউনিটির পরিধি যে জীবদেহের দ্বারা আবেষ্টন করিতে পারে তাহার পূর্ণশরীর কত বড় হইবে অনুমান করিতে পারিলাম না। ক্রমান্বয়ে বিশাল সরীসৃপ ছাউনির পিছন দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। দেহভার সম্পূর্ণ মাটিতে পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গাড়ীটা প্রায় সোজা হইয়া আসিল। সরীসৃপ দেহের অনেকটা অংশ মাটির তলায় ঝুলাইয়া দিয়াছে। গাড়ীটা তখন দাঁড়িপাল্লার মত উঠিতেছে ও নামিতেছে। সমস্ত দেহটা মাটির সংস্পর্শে আসিতেই গাড়ীটা আবার সামনের দিকে সশব্দে পড়িয়া গেল। মনে হইল বলদ জুতিবার জায়গাটা গাড়োয়ানের পায়ের উপরই আঘাত করিয়াছে। অজগরের কুণ্ডলায়িত দেহ ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত হইতে লাগিল ; তাহার পর গাড়ীর ছাউনির উপর যেভাবে মাথা তুলিতেছিল ঠিক সেইভাবে পুনরায় মাঝে মাথা দুলাইয়া খুঁজিতে লাগিল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে। হঠাৎ বিকট

গর্জ্জনে কানে প্রায় তালা লাগিয়া গেল। মনে হইল সহস্র বজ্রাঘাত একই সঙ্গে আকাশ ফাটাইয়া ধরিত্রীর বুকে পড়িয়াছে। পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল ; তাহার পর আমার হস্তের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে। প্রাণপণ শক্তিতে পাতাগুলি আরও ভাল করিয়া ধরিলাম। এইটুকু শক্তিকেই আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। পরক্ষণেই দেখিলাম মহাপরাক্রমশালী
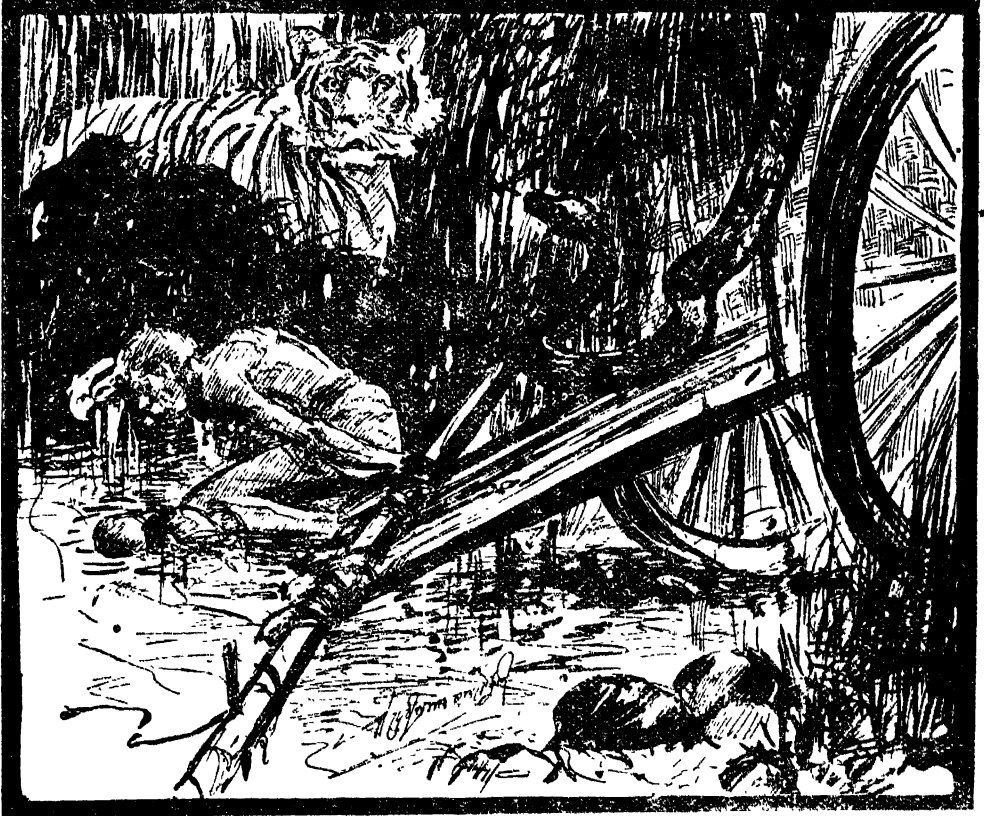
এমন সময় দেখিলাম গাড়ীর ছাউনির উপর সেই বিরাট অজগর

অরণ্যের অধিপতি শার্দ্দূল খাড়াই ঘাস সজোরে সরাইয়া একেবারে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কি বিরাট দেহ! পূর্ণবয়স্ক বাংলার গরুর মত, কিন্তু পিছনকার পা-টা ভাঙ্গা। সোজা চলিবার উপায় নাই ;—হেঁচড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে এবং মাঝে মাঝে ত্রস্তভাবে ফিরিয়া তাকাইতেছে। মানুষ তাহার সামনে পড়িয়া আছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। আততায়ীর নিশ্চিত আক্রমণ তাহার গতি সংযত করিয়াছে। ইতিমধ্যে বাঘ গাড়ীর চাকার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন একটু নিশ্চিন্ত ভাব। একবার ঘুরিয়া মানুষটি দেখিল, তাহার পর আবার কি ভাবিয়া মাটি শুঁকিতে আরম্ভ করিল। শত্রু সেখানে নাই। বুভুক্ষের আহার রাজভোগের

মত সামনে রক্ষিত। বাঘ গাড়োয়ানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। গাড়ীর ছাউনি তখন মাথার উপর মৃদুভাবে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস নাই অথচ ছাউনি দুলিতেছে কেন ? অনুমান করিলাম হয় তো বাঘের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া থাকিবে। বাঘের লাঙ্গুলের তখন উত্থান-পতন চলিয়াছে ; লম্ফ প্রদানের পূর্ব্ব সঙ্কেত। বাস্তবিকই বাঘটা লাফাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লম্ফ হইল না। সর্ব্বদেহে একটা ঝাঁকুনি দেখিলাম মাত্র। যখন সে উঠিয়া গাড়োয়ানের দিকে অগ্রসর হইবে ঠিক করিয়াছে, এমন সময় লক্ষ্য করিলাম গাড়ীর ছাউনির উপর সেই বিরাট অজগর। মুখটা নিচের দিকে ঝুলাইয়া দুলাইতেছে। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তের ভিতরে সমস্ত দেহটাকে বাঘের উপর ফেলিয়া দিল এবং সার্কাসে ঘোড়ার খেলার লম্বা চাবুকে যেভাবে ঢেউ খেলিয়া থাকে ঠিক সেইভাবে অজগর দৈত্যের বিরাট দেহ বাঘের পিঠে ঢেউ খেলিতে লাগিল। এই সময় যে কয়টি গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম তাহার বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না। একটি পাক পুরাপুরি দিবার আগেই চকিতে বাঘ নিজেকে মুক্ত করিয়া সামনের পা দিয়া থাবা মারিল। তৎক্ষণাৎ বারুদ-বিস্ফুরিত হাউই বাজির মত সম্মুখের দেহের খানিকটা অংশ সোজা প্রায় উড়াইয়া সাপ বাঘের মুখে ছোবল মারিল। চোখের উপর ছোবল মারে নাই তো ? হইতেও পারে। বাঘ যেন বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রণে ভঙ্গ দিয়া আবার ঘাসের দিকে অগ্রসর হইল। অরণ্যের আদি প্রবৃত্তি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধে একজন আর একজনকে সম্পূর্ণ বিনাশ না করিয়া থামিবে না। সরীসৃপ বাঘের পিছু লইল। বাঘ তখন খাড়াই ঘাসের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে।

আমি গাছের উপর স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছি। ইহার পরের ঘটনা কি হইবে অনুমান করা শক্ত। গাড়োয়ানের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি, কারণ যুদ্ধের পর একজন—যে কেহ আসিয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে। নানা চিন্তা মনে আসিতেছিল ; এমন সময় রাস্তা হইতে একটু দূরে ঘাসের আড়ালে অকস্মাৎ বাঘের উপর্য্যুপরি গর্জ্জন সুরু হইল, যেন সৃষ্টি এখন ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেখান হইতে শব্দ আসিতেছিল তাহার অনেকখানি পরিধি লইয়া ঘাসগুলি দারুণ ভাবে আলোড়িত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে বাঘের চীৎকার গোঙানিতে পরিবর্ত্তিত হইল ; যে শব্দ আসিতেছিল তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘাসের আলোড়ন নাই। অনেকক্ষণ বাদে একটা দমবন্ধ হওয়ার মত আওয়াজ কানে আসিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বাবস্থায় আছি।

একটির পর একটি করিয়া কতগুলি প্রহর কাটিয়া গিয়াছে জানিবার উপায় ছিল না। হাতে পায়ে খিল ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। একটু নড়িয়া বসিবার সাহস নাই। নিস্তব্ধতা যেন গুরুভার কঠিন বস্তুর মত আমার মনের উপর ভর করিয়াছে।

প্রভাতের আগমন-বার্ত্তা দূরে পাখীর কাকলিতে শুনিতে পাইতেছি। দিকভ্রম হইয়াছে। কোন্ দিক পূর্ব্ব, কোন্ দিক পশ্চিম স্মরণ করিতে পারিতেছি না। আস্তে আস্তে আকাশ ফরসা হইয়া আসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নবজাত অরুণকিরণ গাছের ডালপালার পাশ কাটাইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। গাড়োয়ানটার কথা মনে আসিতেই স্মরণীয় ঘটনাস্থানটি লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম বেচারা ঠিক সেইভাবেই পড়িয়া আছে। মাথার নিকটে খানিকটা স্থান জমাট রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

শিহরিয়া উঠিলাম! তবে কি বাঘ লোকটিকে থাবা মারিয়াছিল? কই, যতদূর মনে পড়ে বাঘকে তো অত নিকটে আসিতে দেখি নাই। হইতেও পারে। মনের অবস্থা তখন এমন ছিল না, যাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা চলে। একটু নড়িয়া বসিবার ইচ্ছা আসিল। চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। হাতে খিল ধরিয়াছে। মুঠা দুইটা কে যেন রজ্জু দ্বারা পাতার গোছার সহিত দৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে। নিরুপায় হইয়াই পথিকের আসার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সকাল হইয়া গিয়াছে। অনতিবিলম্বে দেখিলাম সদলবলে জঙ্গলীর দল শুক্না কাঠ কুড়াই বার জন্য আমার দিকে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইতে তাহাদের দৃষ্টি আকষণ করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে ডাক দিলাম। সকলে আমার নিকট ছুটিয়া আসিল, কিন্তু গাড়োয়ানের অবস্থা দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। গত রাত্রের বাঘের গর্জ্জন নিশ্চয় তাহারা শুনিয়াছিল। গাড়োয়ানকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, অনুমান করিল বাঘ নিকটেই আছে। তাহাদের মধ্যে প্রাচীন ও অভিজ্ঞব্যক্তি ইতিমধ্যে বাঘের থাবা আবিষ্কার করিতে গিয়া অজগরের অস্তিত্বও জানিয়া ফেলিয়াছে। খবরটি সকলের গোচর হইতেই একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহার পরই একত্রিত হইয়া কাঠে কাঠে ঠুকিয়া বিকট খটাখট শব্দ আরম্ভ করিয়া দিল। বুড়াই যে দলপতি,—বুঝিলাম। সে সাপের গতি ও বাঘের থাবা লক্ষ্য করিয়া গত রাত্রের ভয়াবহ স্থানটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিছনে দলের লোক তখন চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। বেশীদূর যাইতে হইল না। তাহাদের ভিতর অনেকের মাথা দেখিতে পাইতেছিলাম। একটি স্থানে আসিয়া সকলেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে নিচু হইয়া কি দেখিতেছে। বুঝিলাম, অনুসন্ধানের ফল শুভ। তাহার পর বেশিক্ষণ সময় কাটে নাই। দেখিলাম—দশ-বার জন মিলিয়া বহুকষ্টে রাত্রের অজগরকে লইয়া আসিতেছে। বিশাল শক্তির মৃতরূপ। মাথার অস্তিত্ব যেটুকু আছে তাহাতে জীবিত অবস্থায় কি ছিল জানিবার উপায় নাই। একটা চোখ একেবারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অজগরের মৃত দেহটা গাড়ীর নিকটে আনিতে গাড়োয়ানের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম—লোকটা যেন পাশমুড়ি দিবার চেষ্টা করিতেছে। দিনের বেলা এবং অত-

গুলি লোক উপস্থিত না থাকিলে আমি কি করিতাম বলিতে পারি না। নিশ্চিন্ত হইলাম, লোকটা মরে নাই। মরিলে রিপোর্টের ভিতর এতবড় ঘটনাটা বাদ দিতে পারিতাম না। লোকটাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। I have the honour to submit-এর গোলামি মন্ত্রে চার পাতা লেথার কর্ত্তব্য হইতে সে আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে।

সদর আপিসে গর্দিয়ানি পোষাক পরিয়া আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কিনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় ডাক আসিল। তহসিলদার লিখিয়াছেন, মানুষ খেকো বাঘ মারার জন্য কালেক্‌টার জঙ্গলী-দের পুরস্কৃত করিয়াছেন এবং বাঘের আসল ধ্বংসকারী অজগর নিজে মরিয়া জঙ্গলীদের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিল! শেষের দিকে গাড়োয়ানের বলদ দুইটার জন্য সুপারিশ করিয়া-ছেন—যেন গরীব সম্বন্ধে আমার উদার মনে কলঙ্কের ছাপ না পড়ে। কলঙ্কের বোঝা যথেষ্ট আছে, উপরি ফাউ বহন করিবার ইচ্ছা ছিল না। পরের ডাকেই বক্‌শিস সহ শার্দ্দুলভুক্ত ও পলাতক বলদের দাম মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

বলিয়া রাখা ভাল, টি-এ বিলে এই বাড়্‌তি খরচের অঙ্ক সরকারকে লিখিতে ভুলি নাই।

মালকোণ্ডা পেণ্টার জঙ্গল, করনূল

১৯৪৪ সালের ৮ই মে কিছুকাল স্মরণীয় থাকিবে। ১০৩ ডিগ্রী জ্বর লইয়া ট্রেনে উঠিয়াছিলাম। গম্যস্থল পাঁচ শত মাইল দূরে, গভীর অরণ্যে। ভয়াল আবেষ্টনীর আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি নাই। জীবহিংসার আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থতার নিমিত্ত অরণ্য আমাকে টানিতেছিল। প্রথম, স্ত্রীর নিকট হইতে বাধা আসিয়াছিল কিন্তু আমার দারুণ উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত জ্বর লইয়াই যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বাধা দিলে জ্বর অপেক্ষা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিয়া যাইবে।

আরজি মঞ্জুর হওয়াতে মাঝপথ হইতে দুই বার তারে স্বাস্থ্যের খবর জানাইব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে পিয়ন ছিল, ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তাহাকে সুস্থতার সংবাদসহ দুইটি পৃথক টেলিগ্রাম দিয়া দিলাম—আদেশ ছিল যথাস্থান হইতে কাজটা সারিয়া ফেলিবে, আমি কি রকম থাকি তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া দেখি দুইটি গোরা এক দিক্‌কার গদি দখল করিয়া বসিয়াছে—কাঁধের উপর ধাতুনির্ম্মিত অনেকগুলি তারকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অনুমান করিলাম সামরিক বিভাগের কোন হোমরা-চোমরা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইবে। গোরার অবাঞ্ছনীয় সান্নিধ্যের সম্ভাবনা হইলেই আমি সময় থাকিতে আস্তিন গুটাইয়া প্রস্তুত হইতাম, ইহা আমার বাল্যকালের স্বভাব; পূর্ব্বাভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই, আস্তিন গুটাইবার চেষ্টা করিলাম—বাহু উপযুক্তভাবে নড়িল না, গাঁটে গাঁটে বেদনা—প্রতি অঙ্গের জোড়গুলি অচল হইয়া গিয়াছে।

গাড়ীতে আমার দিক্‌টায় বিছানা পাতা ছিল—যাঁহারা ষ্টেশন পর্য্যন্ত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া সটান বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরেই বম্বে মেল ছাড়িয়া দিল। জ্বরও রেলচক্রের দ্রুত গতির সহিত পাল্লা দিয়া বাড়িতে লাগিল। প্রায় বেহুঁসের মত হইয়া আসিতেছিলাম। যাহাদের দেখিয়া কিছু পূর্ব্বে ভিন্ন উদ্দেশ্যে বাহু নাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাদেরই দিকে কোন প্রকারে হস্ত প্রসারিত করিয়া জল ভিক্ষা চাহিলাম। তখন আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই।

সাহেব আমাকে উঠাইয়া সামরিক জলের পাত্র হইতে জল খাওয়াইলেন। তাহার পর নিজের রুমাল লইয়া আমার কপালে জলপট্টি দিয়া দিলেন। অপরিচিত পরদেশীর কৃপায় অনেকটা আরাম বোধ করিলাম, ধীরে ঘুম আসিতে লাগিল। পরের দিন বেলায়

ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। কপালে বিদেশী দরদীর রুমাল শুকাইয়া গিয়াছে। বন্ধুকে হয়ত জীবনে আর দেখিতে পাইব না, দেখিলেও চিনিতে পারিব না—কিন্তু তাহার জলপট্টির শীতল অনুভূতি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পণ্ট্ ফাল জংশন হইতে ট্রেন বদল করিয়া পাহাড়ী পথের যাত্রী হইলাম। গোড়ার দিক্‌টা উপত্যকার মত ধূ ধূ করিতেছে, দিগন্তব্যাপী অনুর্ব্বর শুষ্ক মাঠ, মাঝে মাঝে দেখা যায় চটা-ফাটা অতিকায় প্রাচীন পাথর অজানা অতীতের নিশ্চল প্রহরী, জীর্ণ অস্তিত্ব লইয়া প্রখর রৌদ্রে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পুড়িতেছে। বেশীক্ষণ প্রকৃতির এই অগ্নু্যত্তপ্ত রূপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যায় না, চোখ ঝল্‌সাইয়া উঠে।

গাড়ীতে কেহ ছিল না, সব কয়টি খড়খড়ি বন্ধ করিয়া নিজেকে এলাইয়া দিলাম। অনেকটা সময় বোধ হয় এই ভাবে কাটিয়া গিয়াছিল—আমার গন্তব্য স্থলে আসিয়া পড়িয়াছি জানিতে পারি নাই। দরজা ঠেলাঠেলিতে তন্দ্রাবেশ কাটিয়া গেল। জানালা খুলিয়া দেখি ডিগুভামেটায় আসিয়াছি। স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটারমনী তাঁহার এলাকার রেঞ্জার ও অন্যান্য লোক ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—তাহাদের সাহায্যে মাল নামাইতে কোন অসুবিধা হইল না। ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস ষ্টেশন হইতে নিকটে নয়। বেলা তখন চারটা হইবে; রৌদ্ররশ্মির অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম—সবুজের চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যায় না পাকা রাস্তার পাশে ঘাস শুকাইয়া পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, দগ্ধ পাথরের উত্তাপ সাধারণ টেনিস জুতার রবারকে প্রায় গলাইয়া ফেলিতেছিল। মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ হইতেছে। কোন প্রকারে দেহটা টানিয়া হেঁচড়াইয়া বাংলোয় টানিয়া তুলিলাম। ডি. এফ. ও. আমার অভ্যর্থনার জন্য বারন্দাতে দাঁড়াইয়াছিলেন—ভদ্রতার অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইতেই বলিলাম—আমার জ্বর বাড়িতেছে, বিশ্রামের প্রয়োজন।

তিন দিন জ্বরভোগের পর স্থানীয় ডাক্তারের কৃপায় চতুর্থ দিনে পথ্য পাইলাম। পথ্যের পরেই শিকারে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ডি. এফ. ও. স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন—গতিক সুবিধার নয়; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে না। সুতরাং কথাটা তখনকার মত চাপিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে লেপার্ডে ছোট মহিষ ও কুকুর মারার খবর আসিতেছিল—আমি গোপনে সংগ্রহ করিতেছিলাম; কিন্তু বড় বাঘের থাবার চিহ্ন কেহ দেখিয়াছে বলিল না।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, এ তল্লাটে বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। ডি. এফ. ও. সাহেবও ট্যুরে বাহির হইয়া গিয়াছেন—অবশ্য রেঞ্জ অফিসার বোপাইয়কে আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খবর নাই, কাজ নাই, অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলাম।

এক দিন প্রাতে অপ্রত্যাশিতভাবে রেঞ্জার আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন—শুভ সংবাদ! মালকোণ্ডা পেণ্টা হইতে খবর আসিয়াছে—ওখানে এক বিরাট আকারের বাঘ নাকি রোজ পেণ্টার (ক্ষুদ্র জলাশয়) দিকে জল খাইতে যায়।

রেঞ্জারকে বলিলাম, আর কাল-বিলম্ব নয়, এখুনি রওনা হইবার ব্যবস্থা করুন। তিনি উত্তর করিলেন—এখন রওনা হইলে মালকোণ্ডা পেণ্টায় পৌঁছতে বেলা একটা বাজিয়া যাইবে—এই রৌদ্রে কোন গাড়োয়ান ১০ মাইল পথ যাইতে রাজি হইবে না। কাল সকালে অন্ধকার থাকিতে রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতেছি।

অগত্যা তাঁহার কথা মানিয়া তখন হইতেই পরের দিনের ভোরের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম—যাহোক একটা কাজ পাওয়া গেল—প্রস্তুত হওয়ার সহিত জঙ্গলের নানা কাল্পনিক রূপ মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলাম।

১৬ মে অন্ধকার থাকিতেই ওয়েষ্টলী রিচার্ডের ৪২৫ বোর এবং কেলনারের ৩৫৫ বোর রাইফেল দুইটা পরিষ্কার করিলাম—ফরাসী দোনলা বন্দুকের ভিতরটা তাচ্ছিল্যের সহিত দেখিয়া লইলাম। দোনলাটা মাল-বাহকের হাতে তুলিয়া দিয়া রাইফেল দুইটা নিজের কাছে রাখিলাম। হাজার হোক রাইফেলের জাতিগত আভিজাত্য আছে, তাহা ক্ষুণ্ন করি কেমন করিয়া। জড়কেও জাতির অন্তর্ভুক্ত করায় ফলাফল সুবিধার হয় নাই। পরের ঘটনায় তাহা জানা যাইবে।

আমরা যখন মালকোণ্ডা পেণ্টায় উপস্থিত হইলাম তখন দুপুর বারটা, অসুস্থ শরীরের কথা ভুলিয়াছি; রৌদ্রের উত্তাপে আবেষ্টনী তখন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—সেদিকে লক্ষ্য নাই, বলিলাম পাগ মার্ক দেখিতে যাইব। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—এখন সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এখান হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ, পৌঁছিতে বেলা দুইটা বাজিয়া যাইবে—ফিরিতে চারটা। তৎ-পরিবর্ত্তে কাল সকালেই মওড়ায় মাচান তৈয়ারী করিয়া রাখিব। আপনি বৈকালে বাঘের পদচিহ্ন দেখিয়া মাচানে বসিতে পারিবেন। ও রাস্তায় মানুষ চলে না। প্রস্তাবটা মন্দ লাগিল না। মাচানে বসার আশু সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

এখানকার রেষ্ট-হাউসে কোন জমকালো ভাব নাই। মাত্র দুইটি ঘর, কোনটারই কবাট বন্ধ করা যায় না—যে কোন হিংস্র জানোয়ার নির্ব্বিবাদে ঝড়বৃষ্টিতে আশ্রয় লইতে পারে। আশ্রয় না লউক শিকারের সন্ধানে হরিণ অথবা শূকরের পিছনে ধাওয়া করিয়া ব্যর্থ হইলে এমন একটি অন্ধকার-পূর্ণ আস্তানা পাইলে খানিকটা জিরাইয়া লইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? ভাবিলাম ডি. এফ, ও, রায়-মহাশয় পশুরাজ শার্দ্দুলের দর্শন নিজের টেবিলের তলায় পাইয়াছিলেন, কুকুর ভাবিয়া তাড়াইতে গিয়া একেবারে রাজ-

দর্শন! তিনি জাগিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘ যদি অভ্যর্থনা করিতে আসে তখন বন্দুক চালাইবারও অবসর পাইব না।

রাত্রির কথা, যৎসামান্য আহার করিয়া রেষ্ট-হাউস-সংলগ্ন স্বল্পপরিসর খোলা বারান্দার মেঝেতে সকলের শুইবার ব্যবস্থা হইল। মিঃ জন আমার পাশে শুইলেন—উভয়ে বন্দুক ভরিয়া পাশে রাখিলাম। সবে নিদ্রা আসিতেছিল এমন সময় দেখিলাম সামনের জঙ্গল আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—চার ধারে পোড়া গন্ধ ও বাঁশ ফাটার দারুন আওয়াজ, কতকটা কুচ্ কাওয়াজে একসঙ্গে অনেক বন্দুক চালানর মত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জনকে জাগাইলাম। সে দৃশ্যটি দেখিয়াই রেঞ্জারের নিকট ছুটিল। আমি বারান্দা হইতে নামিয়া ঘরের পিছন দিকে গেলাম—দেখি জঙ্গলে আগুন লাগিয়াছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশ ঠেলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বগ্রাসী আগুন আমাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। মহাশক্তিমান রাক্ষস ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তারিত করিয়া চলিয়াছে—আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে রেঞ্জার দলবল সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আগুনের রূপ দেখিয়াই প্রায় সামরিক কায়দায় হুকুম দিলেন—"কাউন্টার ফায়ার!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লোকগুলি সার বাঁধিয়া শুকনা ঘাসে রেষ্ট-হাউসের গা ঘেঁসিয়া আগুন লাগাইয়া দিল। অল্পক্ষণের ভিতর আমাদের দিক্‌কার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং পূর্ব্বের অগ্রগামী অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিপরীতমুখী আগুনের গতি একত্রে মিলিত হইতেই হাওয়ার গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমান্বয়ে আগুনকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম।

পরের দিন পেণ্টার মওড়ার নিকট মাচানে গিয়া বসিলাম। মাচানটি ঠিক মনঃপূত হইয়াছিল বলিতে পারি না—প্রথম বাঘের লাফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, তদুপরি আড়াল হইতে নজরে পড়ে। সহজে মাচানে উঠিয়া এক পার্শ্বে খানিকটা জায়গা খালি রাখিয়া দিলাম,—ঠিক নীচে বাঘ আসিলে যাহাতে সহজেই গুলি চালাইতে পারি। ইহার প্রয়োজনীয়তা অভিজ্ঞতা হইতে বোধ করিয়াছিলাম। মামুন্তরে (চিতুর জেলা) মাচানের তলায় বাঘ বাঁধা মহিষকে মারিবার জন্য প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। গুছাইয়া বসিয়া মাল-বাহকদের জোরে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম।

ধীরে গোধূলির ক্ষীণ আলোক তিরোহিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার আমাদের ঘিরিতে লাগিল। সাংঘাতিক গুমট, হাওয়া নাই, শব্দ নাই, অরণ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে। জনকে রাত্রি জাগিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলাম—পরে তাহার রাত্রি

জাগিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিতও হইয়াছিলাম। উভয়েই নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছি—সামনের জঙ্গলে শুকনা পাতার উপর একসঙ্গে অনেকগুলি জন্তুর পদশব্দ শুনিলাম। অনতিকাল পরেই বুঝিলাম জন্তুগুলি একপাল বন্য বরাহ—মিনিট পনর এদিক ওদিক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া সদলবলে চলিয়া গেল।

বরাহগুলি চলিয়া যাইতে কাল্পনিক বাঘকে বাঁধা মহিষের নিকট দাঁড় করাইয়া ৪২৫ বোরের রাইফেল দিয়া টিপ করিবার চেষ্টা করিলাম। বন্দুকের দৈর্ঘ্য অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল—মাচানের ভিতর ইচ্ছামত নাড়াইবার উপায় নাই। তাহার উপর মাচান এমন খাড়াই স্থানে বাঁধা হইয়াছে যে, বাঘের শিরদাঁড়া ছাড়া আর কিছু ভাল ভাবে দেখিতে পাইব না। যাগ্ গতস্য শোচনা নাস্তি,—এখন আর ত্রুটির কথা ভাবিয়া লাভ নাই। নিস্তব্ধতার মাঝে চিন্তাস্রোত বাঘকে কেন্দ্র করিয়াই আবদ্ধ ছিল না। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিতে লাগিল—ক্লান্ত ও অসুস্থ শরীর লইয়া বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। জনের দেহে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক স্পর্শ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ জন প্রায় নখী জন্তুর মত খামচাইয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। শিকারের অভ্যাস অনুসারে সন্তর্পণে উঠিলাম—বসিবার পূর্ব্বেই শুনিলাম ঠিক আমার মাথার পাশে পূর্ব্ববর্ণিত খালি জায়গাটায় হুড়ামুড়ি চলিয়াছে, জনের দেহ সাংঘাতিক ভাবে দুলিতেছে। পকেটেই ছোট টর্চ ছিল, সুইচ টিপিতে দেখি জন তাহার বন্দুকের বাঁট খোলা জায়গাটার ভিতর চালাইয়া দিয়া কোন একটি জন্তুকে ধপাধপ পিটাইতেছে—যথাস্থানে আলো ফেলিয়া আবিষ্কার করিলাম একটি প্রকাণ্ড ভালুক মাচানের এক হাত নীচে আমার সোলার হ্যাটটা কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে আর জন বন্দুকের বাঁট দিয়া সেটাকে নীচে নামাইবার জন্য পিটিতেছে। আলো ভিন্ন দিকে ঘুরাইতে দেখি প্রথমটার নীচে আর একটা, তাহার পর আরো একটা এবং গাছের গোড়ায় চার-পাঁচটা জড় হইয়াছে—একেবারে ভালুকের পল্টন!

মাচানের উপর যে ধস্তাধস্তি হইয়া গেল তাহাতে বাঘ ত্রিসীমানায় থাকিলে ভৌতিক গুণসম্পন্ন বৃক্ষের নিকটে আর আসিবে না। স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল—"ভালুক পেলে তাই মেরো—বাঘের আশায় ভালুক ছাড়া চলবে না, ওর চামড়ায় ড্রইংরুমের সামনে খাসা পা-পোষ হবে।" ক্ষিপ্রতাসহ বড় রাইফেলটা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, অস্ত্র ঘুরিল না, অধিকন্তু তৎসংযুক্ত আলোর তার ছিঁড়িয়া গেল। নিরুপায় হইয়া পাশেই দাঁড়-করান দোনলা বন্দুকটা খালি জায়গাটার ভিতর ঢুকাইলাম, পণ্ডশ্রম হইল, ইতিমধ্যে সব কয়টা ভালুক গাছের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। শুকনা পাতার আওয়াজ শুনি নাই, ভাবিলাম নিকটেই আছে। বন্দুক রেডি করিয়া জনকে মাচানের উপর দাঁড়াইয়া টর্চ

জ্বালিতে বলিলাম, তাহার পর আলোর সাহায্যে চার ধার খুঁজিলাম, কোন দিকে তাহাদের দেখিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ভালুক তো মানুষের নিকট প্রহার খাইয়া অত সহজে পলাইবার পাত্র নয়! তাছাড়া পলাইল কোন্ দিক দিয়া ?—জঙ্গলের দিকে পলাইলে পাতার শব্দ শুনিতাম; তবে পাকা সড়ক দিয়া পলাইয়াছে। ভয় না পাইলে পাকা সড়ক ধরিবে কেন ? ভয় পাওয়া অশোভনীয় নয়, যে ভাবে টর্চের আলো ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে ভড়কানই স্বাভাবিক।

ইহার পর ইসারা অথবা চুপি চুপি কথা বলার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। বড় বাঘ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেও লেপার্ড ভোরের দিকে আসিতে পারে ভাবিয়া ছোট রাইফেলটা 'গন রেষ্টে' সাজাইয়া রাখিলাম। দুই একবার আলোটাও পরীক্ষা করিয়া লইলাম। তাহার পর সিগারেট ধরাইয়া মনের সুখে ধূম পান করিলাম। সিগারেটের শেষ অংশ ভিজা কাপড়ের সংস্পর্শে আনিয়া নিভাইতে যাইব এমন সময় অতি পরিচিত পদধ্বনি ঠিক মাচানের পাশে শুনিলাম। জনকে টিপিয়া সাবধান হইতে বলিলাম; সে সঙ্কেতের অর্থ বুঝিল না, সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—"কি?" আমি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলাম—"বাঘ আমাদের অতি নিকটে আসিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে মহিষটার উপর লাফ মারিতে পারে। আমার দোনলাটা লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।"

কথাটা শেষ করিয়াছি এমন সময় আর এক পা চলিবার শব্দ স্পষ্ট শুনিলাম। তখন আমি রাইফেল বগলে তুলিয়া লইয়াছি এবং লক্ষ্যের আনুমানিক স্থানের দিকে নল ঠিক করিয়া ধরিয়াছি। গোলমালের পর বাঘের আগমন—ভাবিয়াছিলাম হয়ত বা মামুনডুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হঠাৎ মহিষটা ছটফট করিয়া উঠিল, দু-এক সেকেণ্ডের ঝটাপটি, তাহার পর ভারী ওজন মাটিতে ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল-সংযুক্ত টর্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম, সামনেই প্রকাণ্ড বাঘ অত নিকটেও খুব স্পষ্ট দেখিতেছি না—বাঘ ও মহিষের ঝটাপটিতে যে ধুলা উড়িয়াছিল তাহাতে ঘন ধোঁয়ার মত পর্দ্দা সৃষ্টি করিয়াছে, বাঘের মাথাও বিপরীত দিকে ঘোরান, বুক লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিলাম। গুলি খাইয়া বাঘ খাড়া ভাবে লাফাইয়া উঠিল। মাটিতে পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আর একটা গুলি চালাইয়া শিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে চাহিয়াছিলাম। ম্যাগাজিন রাইফেলে গুলি ভরিয়া নিশানা করিবার পূর্ব্বে বাঘ জনের দিকে গড়াইয়া গেল।

জনকে অনবরত টিপিতেছি গুলি চালাইবার জন্য, সে বন্দুকের নলটা একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। ইতিমধ্যে বাঘ তাহারই দিকে আবার আছাড় খাইয়া পড়িল, তাহার পর আমাদের মাচানের পিছনে চলিয়া গেল। বেশী দূর যাইতে পারে নাই—

আবার পড়িয়া গেল। ইহার পর বার তিন গোঙানি শুনিলাম—পরে কিছুক্ষণের জন্য বনানী অসম্ভব নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দূরে একটি শুক্‌না পাতা পড়িলেও তাহার আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি—থাকিয়া থাকিয়া হৃদয় ভয়মিশ্রিত উত্তেজনায় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। বেশীক্ষণ এই ভাবে কাটিল না, পাতার শব্দে স্পষ্ট বুঝিলাম বাঘ আবার উঠিয়াছে এবং চলিতেছে। ধীরে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল কিন্তু শব্দ বিলীন হইবার পূর্ব্বে পুনরায় পতনধ্বনি শুনিলাম—এবার আর সন্দেহ থাকিল না বাঘ মারিয়াছি। জনের দিকে হেলিয়া বলিলাম—"বাঘ মরিয়াছে।"

আমাদের মধ্যে কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্‌ এবং থ্যাঙ্ক-এর আদান-প্রদান হইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে শুইলাম। উত্তেজিত হইয়াছিলাম, ঘুম আসিতেছিল না। প্রিয়ার জন্য বাঘের নখ ও দন্তের সাহায্যে নূতন রকমের গহনার ডিজাইন্‌ মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। আমার কারুশিল্পের দক্ষতা রুচিসম্পন্ন নারীমহলে কিভাবে প্রচার লাভ করিবে তাহাই ভাবিতেছিলাম। ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী যে শিকারে আমায় বাধা দিবেন না—সে বিষয়েও কতকটা নিশ্চিন্ত যে হই নাই তাহা বলিতে পারি না। চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া আছি, ঘুমও আসিতে চায় না, ভোরও হয় না। আন্দাজ তিন ঘণ্টাকাল অর্দ্ধনিদ্রা এবং অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় কাটিয়া যাইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল—অর্থাৎ যখন গুলি চালাইয়াছিলাম তখন রাত দুইটা হইবে।

অসহিষ্ণু ভাবে সকালের আলোর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। তখন ভোর ৬টা হইবে, দূরে মাল-বাহকদের গলা শুনিলাম। রাত্রে গুলি চলিয়াছে, কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া সময়ের আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জনকে চিৎকার করিয়া বলিতে বলিলাম জখুমি বাঘ পড়িয়া আছে, রোদ না উঠিলে যেন এদিকে না আসে। জন মাচানের উপর দাঁড়াইয়া চারধার ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর বিমর্ষভাবে বলিল—'কৈ বাঘ তো নাই।' আমি বলিলাম—"পিছন দিকে একটু দূরে পড়িয়াছে, খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।" বাঘ মরিয়াছে সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, সেই কারণেই অতটা জোর দিয়া বলিতে পারিয়াছিলাম।

সামান্য রোদ উঠিতেই আমি ডবল ব্যারেল গান-এ তিন ইঞ্চি এল-জি গুলি পুরিয়া নামিয়া আসিলাম,—জন আমার ছোট রাইফেল লইয়া নামিতেছিল। বারণ করিলাম রাইফেল কোন কাজে আসিবে না। বাঘ যদি এখনও বাঁচিয়া থাকে এবং আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে তো উড়ন্ত স্নাইপ পাখী মারার মত হঠাৎ গুলি চালাইতে হইবে, রাইফেল দিয়া টিপ করিবার সময় পাওয়া যাইবে না। যুক্তিটি বোধগম্য হইতে রাইফেল রাখিয়া নিজের বন্দুকটিরও টোটা বদল করিয়া ফেলিল। জনকে উপরে থাকিতেই বলিলাম

দূরবীন ছাড়া জলটুপি ইত্যাদি কিছু সঙ্গে না লইতে। প্রয়োজন হইলে চোঁচা দৌড় মারিতে হইবে।

আমি জানিতাম বাঘ নিকটেই পড়িয়াছে, ১৫।২০ মিনিটের ভিতর খুঁজিয়া পাইব। মাচানের সাম্‌নে পতনের স্থানগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—রাইফেল নিজের জাতের মান রাখিয়াছে, যেখানে বাঘ গুলি খাইয়াছিল ঠিক তাহার নিকটে একটি নাতিবৃহৎ পাথরের চাঁই টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। পদ-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে পিছন দিকে গেলাম—যেখানে জন্তুটা বেশ খানিকক্ষণ পড়িয়া ছিল। এই স্থান হইতেই রক্তস্রাব সুরু হইয়ছিল—প্রায় ঘটিখানেক রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমাদের মাচানের গাছকে কেন্দ্র করিয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা ছিল, তাহার পরই খাড়া শুক্‌না ঘাস—একেবারে বাঘের গায়ের রং—উহার ভিতর বড় বাঘ দুই গজের মধ্যে আত্মগোপন করিলে, দিব্য দৃষ্টি না থাকিলে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য কর্ম্ম। রক্তের দাগ ঐ খাড়া ঘাসের দিকেই চলিয়া গিয়াছে।

মাল-বাহক লামবার্ডিরা নিকটে ছিল। আমাদের পিছন হইতে ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম—আর আমরা একপা দুইপা করিয়া রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ ঘাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ঘাসের নিকটে আসিতে অবর্ণনীয় আতঙ্কে প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলাম। অশুভ লক্ষণ, জোর করিয়া নিজেকে টানিয়া লইয়া চলিলাম; খানিকটা পথ অতিক্রম করিতে খাড়া ঘাসে রক্তচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রায় তিন ফুট উচ্চ সরল রেখার ন্যায় রক্তের দাগ রাখিয়া গিয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইতে আবার খানিকটা খোলা জায়গা সামনে পড়িল—এইখানে লামবার্ডিরা দুই একদিন আগে রান্না করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল, শুক্‌না ছাই ও পোড়া কাঠের টুক্‌রা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাঘ এইখানে বসিয়াছিল, নরম ছাইয়ের উপর তাহার চলার ভঙ্গী জনকে দেখাইলাম। বাঁ দিক্‌কার পা একেবারে জখম হইয়াছে অর্থাৎ তাহার অস্থি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত পা-টাই মাংসপেশী অথবা চামড়ায় ঝুলিতেছে। চলিবার পথে সামান্য একটি পোড়া কাঠের টুক্‌রা পড়িয়াছিল তাহাও পায়ের সহিত ঘষ্‌টাইয়া খানিকটা চলিয়া গিয়াছে—এইখানেই আমার খট্‌কা লাগিয়া গেল।

জন আমার আগে ছিল তাহাকে থামিতে বলিলাম, লামবার্ডিদের ঢিল ছুঁড়িতে বারণ করিলাম। জন নিকটে আসিতে দেখাইলাম হৃদয়ে গুলি লাগে নাই—বাঘ কাঁধের নিকট জখম হইয়াছে। যে জানোয়ার এতটা হাঁটিয়া আসিয়াছে তাহার শক্তিকে অবিশ্বাস করা বাতুলতা, তদুপরি তাহার গন্তব্যস্থান অনতিদূরে পেণ্টার দিকে, ওখানে

যেরূপ ঘন বাঁশের ঝোপ তাহাতে এই কয়টি লোক লইয়া অগ্রসর হওয়া ঠিক হইবে না। জনকে বলিলাম জঙ্গলী চঞ্চুদের ডাকো। জনের নিকট হইতে দূরবীন লইয়া আনুমানিক সন্দেহের স্থান লক্ষ্য করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ঝোপের তলায় যেখানে আলো পাইতেছি সেখানেই পরীক্ষা করিতেছি যদি তাহাকে পাওয়া যায়।

বাঘের স্বভাব তাড়া খাইলে অনেক সময় কোন একটি আড়ালের পিছনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহার পর নিরাপদ ভাবিলে এক ঝোপ হইতে অপর ঝোপে বুকে হাঁটিয়া চলিয়া যায়। আমাদের গতি থামিয়া গিয়াছিল—ভাবিলাম এই বার হয়ত নড়িবে—অনুমান ভুল হয় নাই, পুনরায় দূরবীন লাগাইতেই দেখিলাম আন্দাজ তিন ফারলং দূরে বাঘ দাঁড়াইয়াই চলিতেছে এবং বাঁ পা-টা ঝুলিতেছে। রাইফেল নিকটে থাকিলে এবং শুধু চোখে অতটা দূরে নিশানা সম্ভব হইলে এইখানেই বাঘ পাইয়া যাইতাম। মনে মনে হাওদায় চড়া শিকারীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলাম। এখন হাতীর দ্বারা 'বীটিং' করিলে শিকার কি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিত? তিনটি লোক চঞ্চুদের ডাকিতে চলিয়া গেল, আমরা জঙ্গলের পাকা রাস্তার ফাঁকায় আসিয়া বসিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল পরে তিনজনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল সব চঞ্চু বাঁশ কাটিতে কুপে চলিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় বাঘকে ছাড়িয়া গেলে আর উহাকে পাওয়া যাইবে না। জনকে বলিলাম—"আমরা যদি এই কয়জনে বাঘের পিছনে যাই তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুব বেশী। তুমি আমার সঙ্গে যাইতে রাজী আছ?" জন নিজে একটি বাঘ মারিয়াছিল, তাহার অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত আমাকে বার তিনেক শুনাইয়াছিল, বলিল—"মাচান হইতে বাঘ মারিয়াছি সত্য, কিন্তু এ যে জখুমি বাঘ আর মাত্র দুইটা বন্দুক…"

তাহার কথা শুনিয়া আমিও দোমনা হইয়াছিলাম—কিন্তু অত বড় বাঘ সচরাচর দেখা যায় না, মারিতে পারিলে…! ভাবিলাম—দিনের বেলা আমার নিশানা ভুল হইলে বন্দুক ধরাও উচিত নয়।, লক্ষ্য-ভেদের অহমিকা আমাকে তেজীয়ান করিয়া তুলিল, উত্তর দিলাম—"আমার নিশানা রেস্ট-হাউসে দেখ নাই? তা ছাড়া সঙ্গে দোনলা রহিয়াছে—তোমার কাছে আর একটা বন্দুক, বাঘ তিনটা গুলি হজম করিয়া ফেলিবে?"

আমার তাগমারীর কথা স্মরণ করাইয়া দিতে সত্যই জন মনে বল পাইল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন।

সড়ক দিয়াই চলিতে লাগিলাম, কিন্তু জনকে পাশের খাড়া ঘাসের দিকে নজর রাখিতে বলিলাম। অনেক সময় বাঘকে সামনে দেখা গেলেও শিকারীর অলক্ষ্যে কেমন করিয়া পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং আক্রমণ করে। বলিয়া দিলাম, পাশের খাড়া ঘাস দূরে অথবা নিকটে নড়িতে দেখিলেই বুঝিবে বিপদ সন্নিকট।

পূর্ব্ববর্ণিত ঝোপের নিকটে আসিতে বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছিল। ক্রমান্বয়ে হৃৎ-কম্পন দারুণ ভাবে বাড়িয়া চলিল—আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িতেছিলাম পাছে মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে।...ঝোপের আরো নিকটে যাইতে উভয়ে প্রস্তুত হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম। যে ঝোপ দূরবীন দ্বারা পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলাম সেইখান হইতে বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার পরই ঝোপের বিপরীত দিক মৃদু দুলিতে দেখিলাম—বাঁচা ও মরার মীমাংসা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়া যাইবে—আমি ঝোপের দিকে তাকাইয়া আছি এমন সময় জন গুলি চালাইয়া দিল—ফিরিয়া দেখি কতকটা আমাদের পিছন দিকে খোলা জায়গায় একটি উঁচু টিলার অপর পার্শ্বে বাঘ গড়াইয়া পড়িয়া গেল। জন ও বাঘের মাঝে যে ব্যবধান ছিল তাহা দুই শত গজের উপর হইবে তো কম হইবে না। জন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল—নিকটে আসিয়া বলিল—তাহার গুলিতে বাঘ মরিয়াছে। আমিও খুশী হইয়া উঠিয়াছিলাম—বাঘটা শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল!

খানিকটা অগ্রসর হইতেই সাধারণ এল-জি টোটা ও বন্দুকের পাল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম, জনকে হাতছানি দিয়া তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিতে বলিলাম। আমার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দেখিয়া লোকগুলি কি ভাবিয়াছিল জানি না—জন নিকটে আসিতে বলিলাম—"তোমার গুলিও লাগে নাই বাঘও মরে নাই। সাধারণ এল. জি-র পাল্লা অতটা হইতে পারে না—গুলি যদি ওখানে পৌঁছাইয়া থাকে তো মাটিতে গড়াইয়া গিয়াছে। বাঘ তিন পায়ে চলিতেছে কোন কিছুতে ঠোক্কর খাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে—এখন ফের।" জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। আমাকে একজন পরশ্রীকাতর ব্যক্তিও ভাবিয়া থাকিতে পারে।

বেলা এগারটার কাছাকাছি। ইতিমধ্যে রাস্তা তাতিয়া উঠিয়াছে। পেণ্টা হইতে রেস্ট-হাউস প্রায় চার মাইল পথ পাড়ি দিতে হইল। রেস্ট হাউসে ফিরিতেই অনুভব করিলাম মাথাটা বেশ ধরিয়াছে—তথাপি নিজ হাতে মারা বাঘের লোভ সামলাইতে পারিলাম না, রেঞ্জারকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি লোকজন সংগ্রহ করিয়া বিকালে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বেলা বাড়ার সহিত শরীর উষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, ম্যালেরিয়া যে ধূম করিয়া আসিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। বৈকালে আমার যাওয়া হইল না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রেঞ্জার আমার দোনলাটা ও জনকে লইয়া সদলবলে চলিয়া গেলেন। বেলা পড়িয়া আসিতে দুই বার বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম, জঙ্গলে গুলি চলিলে চার-পাচ মাইল দূর হইতে শব্দ শোনা যায়। উদ্‌গ্রীব হইয়া খবরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সন্ধ্যার আগেই সকলে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে বাঘ নাই। কোথায় গুলি লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিতে রেঞ্জার

সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তিনি বাঘকে গুলি মারেন নাই, শূন্যে আওয়াজ করিয়াছিলেন—জন্তুটাকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য। বাঘ বাহির হয় নাই, তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিয়া সব লোক পলাইয়া আসিয়াছিল। পরে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কাল অফিসার ভাল থাকিলে নিজে গিয়া চেষ্টা করিতে পারেন।

আজকালকার দিনে দুইটি তিন ইঞ্চি এল. জি. টোটা শূন্যে উড়াইয়া দেওয়া! তদুপরি অম্লান বদনে যাহাকে বাঘের পিছনে ধাওয়া করিবার প্রস্তাব করিলেন সে তখন জ্বরে ধুঁকিতেছে! সকালে চক্ষুদের পেণ্টায় পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—বাঘ পলাইয়াছে। বাঘের বুদ্ধির তারিফ করিতে হইল।

দুই দিন জ্বরের সহিত বোঝাপড়া করিয়া তৃতীয় দিনে 'হেড কোয়ার্টার্সে' ফিরিয়া আসিলাম। দেহ মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—মাদ্রাজে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছি। ইহারই ভিতর একটি সুখবর আসিয়া পৌঁছিল—বড় বাঘ ডিগুভামেটার নিকটেই সরকারী রাস্তার উপর কয়দিন ধরিয়া চলাফেরা করিতেছে। সঙ্গে দুইটি বড় বাচ্চাও আছে। স্থানীয় শিকারী উপদেশ দিল একটু দূরে গেলে তিনটি রাস্তার সঙ্গমস্থল, ঐ মওড়ায় মহিষ বাঁধিলে—যে দিক দিয়াই বাঘ চলুক-না কেন মহিষকে মারিবেই। প্রস্তাবটি ভালই লাগিল, অনিশ্চিত 'লাইভ বেট' (Live bait)-এর উপর বসিবার উৎসাহ অথবা ক্ষমতা ছিল না, বলিলাম—মহিষ ঐখানেই বাঁধা হউক, যদি মারে তো 'কিল্'-এর উপর বসিব—এখন মাচান বাঁধার কোন দরকার নাই।

যেরূপ কপাল লইয়া শিকারে আসিয়াছিলাম, তাহাতে কোন আশাই পোষণ করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। দুই দিন কাটিয়া গেল, বাঘ মহিষকে মারিল না, বিরক্ত হইয়া রেঞ্জারকে বার্থ রিজার্ভ করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলাম—দুই দিন পরেই রওনা হইব। ভাবিতেছিলাম আমার ব্যর্থতার অজুহাত লইয়া বেদরদীরা বলিয়া বেড়াইবে বাঘ শিকার একটা বাজে কথা—আসলে লেখার সখ মিটাইবার জন্য জঙ্গলে যায়! গভীর অরণ্যে রাতের বেলা বাঘের সামনে মুখোমুখি হইয়া গুলি চালান চারটিখানি কথা! বেদরদীরা কি জানে আমি যেভাবে শিকার করি তাহা নিরবচ্ছিন্ন ভাগ্যের ব্যাপার। এ দিক দিয়া হাওদায় চড়া শিকারীরা কতটা বেশী সুবিধা পায় তাহা অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রেই জানেন। এ বিষয়ে বেশী লিখিয়া নিজের দুর্ভাগ্য অধিকতর পীড়াদায়ক করিয়া তুলিতে চাই না।

পরের দিন সকালে বসিয়া আছি এমন সময় একটি লামবার্ডি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাঘ মহিষকে মারিয়াছে এবং বাঁধন ছিঁড়িয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া রেঞ্জারকে ডাকিতে বলিলাম। তিনি আসিতে, লোকজন দিয়া মহিষটাকে পুনরায় যেখানে মারিয়াছিল সেখানেই আবার ইস্পাতের নমনীয় তার দিয়া বাঁধিতে বলিয়া দিলাম এবং মরা মহিষের নিকটেই মাচানের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার জানাইয়া দিলাম।

বেলা পড়িতে ছোট রাইফেল এবং দোনলা বন্দুক লইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিলাম। গম্যস্থল নিকট হইলেও হাঁটিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

মণ্ডড়ায় পৌঁছিয়াই মরা মহিষটাকে কি ভাবে বাঘ খাইয়াছে পরীক্ষা করিলাম। পিছন দিককার একপাশ সব নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, সন্দেহ রহিল না যে বাঘেই মারিয়াছে—(লেপার্ড সামনের দিক হইতে খাইয়া থাকে)। কিন্তু মাচানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দমিয়া গেলাম, অত্যন্ত নীচু। আক্রমণকালীন বাঘকে কষ্ট করিয়া লাফাইতে হইবে না, সামনের পা বাড়াইয়া সমস্ত মাচানটা মাটিতে নামাইতে পারে; একেবারে পল্‌কা গাছ। এখন আর ওকথা ভাবিয়া লাভ নাই। জনকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহাকে জল ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া আগে উঠিতে বলিলাম। আড়ালের জন্য পাতাগুলি যথাসম্ভব ঠিক করিয়া লইয়া বেলা থাকিতেই মাচানে গিয়া বসিলাম।

বৈকাল হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমিতেছিল। হাওয়ার গতিও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—ঝড়ের পূর্ব্বসঙ্কেত। অল্পক্ষণ পরেই জোর হাওয়া থামিয়া গিয়া গুমট আসিয়া পড়িল। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ হনুমান আতঙ্কের ডাক সুরু করিয়া দিল। এবার আর রাইফেল নয়, দোনলাটা লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাঘ গর্জ্জন করিয়া অভুক্ত খাদ্যের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না কাঠ মচকাইয়া যাইবার মত মহিষের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। বাঘ মহিষটাকে ধরিয়াই টান মারিয়াছিল, তারের দড়ি ছিঁড়িতে পারে নাই, হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পরক্ষণে টর্চের সুইচ টিপিতেই তীব্র আলোকে চক্ষু দুইটি অগ্নি-গোলার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—মাথাটা সামনেই পাইয়াছিলাম—মধ্যস্থল লক্ষ্য করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। গুলি খাইয়াই বাঘ আগের মত লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর বার বার আছাড় খাইতে খাইতে জনের দিকে কোন কঠিন বস্তুর উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। তাহার সহিত দীর্ঘ গোঙানি শুনিলাম। একটু সময় কাটিতে যেখানে বাঘ পড়িয়াছিল তাহার অতি নিকটে হনুমানগুলি জড় হইয়া অনবরত ডাকিয়া চলিল। সন্দেহ রহিল না বাঘের চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছে; না মরিয়া থাকিলেও বেশীক্ষণ আয়ু নাই।

রাত বাড়িয়া চলিয়াছে, গুমট কাটিয়া শীতল জলীয় হাওয়ার আভাস পাইতেছি। ক্রমে হাওয়ার বেগ ঝড়ের আকার ধারণ করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া যে দমকা আসিতেছিল তাতে নাগর-দোলার মত মাচানের উত্থান-পতন সুরু হইয়াছে,—গতিক সুবিধার নয়। জনকে বলিলাম তোমার বন্দুকের ট্রিগার ঠিক করিয়া রাখ। জন উত্তর দিল তাহার বন্দুক মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। আর একটি ফাঁড়া কাটিয়া গেল। পতনকালীন রেডি ট্রিগার কোন কিছুর সহিত সংঘর্ষিত হইলে টোটা ফাটিত এবং নলের মুখ আমাদের দিকে থাকিলে—বাঘের সহিত আমাদের মধ্যে কেহ শিকার হইয়া যাইত! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি এমন সময় দূরে বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ

শুনিলাম। বায়ু দারুণ বেগে আমাদের নিকটে চলিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে মাচান যেন গাছের উপর মোচড় খাইতে লাগিল। কপালগুণে মাচানের ভিতরেই একটি মোটা ডাল ছিল তাহা আঁকড়াইয়া না ধরিতে পারিলে ঝাঁকুনিতে নীচে পড়িয়া যাইতাম। ঘোর অন্ধকার, অনতিদূরে আহত শার্দ্দুল, তাহার সামনে মানুষ নিরস্ত্র অবস্থায় পড়িলে ঘটনাটি কি রকম দাঁড়াইত সহজেই অনুমেয়। কিছুকাল পরে ঝড় কাটিয়া গেল--আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে ক্ষীণ চাঁদের আলো পাইলাম।

ভোর হইতেই জন পাশের পাতা সরাইয়া ফেলিল। সুপ্রভাত, বাঘিনীর ভয়াল মূর্ত্তি অসাড় ভাবে পড়িয়া আছে, অধিকতর হিংস্রজীবকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য। নীচে নামিয়া লক্ষ্যের স্থান পরীক্ষা করিতে আবিষ্কার করিলাম, আমার নিশানার জয়টীকা চক্ষু দুইটির ঠিক মধ্যস্থলে রক্ত রঙে রঙীন হইয়া আছে। বাঘিনীর আসিবার পথে বাচ্চার পায়ের দাগ খুঁজিলাম--পাওয়া গেল না। ফরেস্ট আপিসে রিপোর্টের নিমিত্ত বাঘিনীর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপিলাম---লম্বায় নয় ফুট ছয় ইঞ্চি, লেজের ডগা হইতে নাকের ডগা পর্য্যন্ত ; উচ্চতা তিন ফুট চার ইঞ্চি। মহিলার পক্ষে আকারটি ছোট নয়।*

---

* এবারকার শিকারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা অস্ত্র সম্বন্ধে নতকথা। নিকট হইতে বাঘ ভালুক শূকর সম্বর ইত্যাদি নরম চামড়ার জন্তু মারিতে হইলে রাইফেল অপেক্ষা দোনলা বন্দুক অধিকতর সুফলদায়ী। রাইফেলের গুলি মাথায় অথবা হৃদয়ে না লাগিলে—বাঘ আঘাত পাইয়াও আক্রমণ করিতে পারে ; কিন্তু lethal bal'-এ কখন এরূপ ঘটনা ঘটে না। দ্বিতীয়, শিক্ষিত বাঘ না হইলে মানুষের কথা, আলো, গোলমাল, কিছুই ভয় করে না এবং তাহার শিকারের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ও নাই।

ডিগুভামেটার জঙ্গল, করনূল

শিকারের নেশায় ঘুরিতে ঘুরিতে মান্দ্রাজ হইতে পাঁচ শত মাইল দূরে করনূল দেশে ডিগুভামেটা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। এই দুর্দ্দিনে শিকার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠা আসার কথা, কারণ উহা লোকমতে বিলাসিতার একটি অঙ্গ। শিকার আমার নিকট ঠিক বিলাস নহে, বাঁচিয়া থাকার একটি অবলম্বন; প্রকৃতিগত ধর্ম্ম—যাহা অহরহ সভ্যতার নানা উৎকর্ষের সংস্পর্শে আসিয়াও কিছুমাত্র সংস্কৃত হয় নাই, আদিম বুনো অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে।

সংস্কারান্ধ ধর্ম্মান্ধ পুণ্যার্থে যেভাবে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অনেক সময় অনাহার ও অনিদ্রা সহ্য করিয়া শার্দ্দুল দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দেশে গভীর অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াই। ভয়ঙ্করের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হই, বধ করিতে পারিলে অবর্ণনীয় আনন্দ পাইয়া থাকি। অহিংসাবাদী এই আনন্দকে বলিবেন পৈশাচিক হিংস্র প্রবৃত্তি। বলুন, তাঁহার আত্মতৃপ্তিতে বাধা দিব না। আমার বক্তব্য বিষয় শিকার, ধর্ম্মনীতি অথবা দর্শনতত্ত্বের গবেষণা নহে। সুতরাং ঘটনাগুলি লিখিয়া যাই।

স্থানটি মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি বিখ্যাত মৃগয়াভূমি। এইস্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি নূতন রকমের মানুষ আবিষ্কার করিলাম। ভদ্রলোক স্থানীয়, রেঞ্জ অফিসার, নাম শ্রীযুক্ত পি, চিঙ্গেল রেডি। তিনি অযথাচিতভাবে পরোপকার করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বলিয়া বসেন, ত্রুটি থাকিলে মার্জ্জনা করিবেন। প্রগতির যুগে প্রকাশ্যে এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া তিনি একঘরে না হইয়া কেমন করিয়া সুস্থভাবে টিকিয়া আছেন জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া বুঝিলাম তাঁহাকে চালাকের সমাজ হইতে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তিনি বেপরোয়া ধরণের মানুষ, তাহার উপর মিথ্যা কথা পারতপক্ষে বলিতে চান না। রেডি মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিলাম, কারণ এই কাহিনীর সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ আছে।

ষ্টেশনে আসিতেই দেখিলাম তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সদলবলে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। পোষাকে সনাক্তের চিহ্ন ছিল, চিনিতে অসুবিধা হইল না। ট্রেন হইতে নামিয়া আমার সহযাত্রী শ্রীযুক্ত আনসারি পাতসার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম। পাতসা সাহেবকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, জঙ্গলের নানা অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায়, কারণ তিনিও জঙ্গল দেশের লোক, ভিন্ন স্থানের রেঞ্জ অফিসার।

ষ্টেশনের বাহিরেই গোযান অপেক্ষা করিতেছিল—রাইফেলের গাদা ও অন্যান্য ভারী মাল

তাহাতে তুলিয়া দিয়া আমরা হাঁটিয়া ফরেস্ট বাংলোর দিকে চলিতে লাগিলাম। বেলা তখন পাঁচটা হইবে।

প্রথমেই কাজের কথা পাড়িলাম—ইতিমধ্যে বাঘ কোন গরু অথবা মহিষ মারিয়াছে কিনা। উত্তর আসিল, "না"। কুড়ি দিনের ছুটি মজুত ছিল—দমিলাম না। পরে কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম—আমার শিকারের জন্য ক্রীত তিনটি মহিষ বিভিন্ন মওড়ায় গত চারদিন ধরিয়া বাঁধা হইতেছে, কিন্তু জন্তুগুলি জাবর কাটা ছাড়া অন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। ইহার পর পথে শিকার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আর কোন কথা হয় নাই। ফরেস্ট বাংলো স্টেশন হইতে অতি নিকটে, পৌঁছাইতে সময় লাগিল না, চতুষ্পার্শ্বে জঙ্গল, আবেষ্টনী ভাল লাগিল।

অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলাম—প্রশ্ন করিলাম, আজ মাচানে বসা চলে না? রেডি মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "সমস্ত রাত, সমস্ত দিন ট্রেনে গেল, আজই মাচানে বসবেন? আজ ক্লান্ত হয়ে আছেন বরং বিশ্রাম করুন।" মনে মনে ভাবিলাম, হায়রে, আমি কেন দুর্মুখ G. B. S-এর মত বলিতে পারি না—গড়াইল গাড়ীর চাকা, আর ক্লান্ত হইলাম আমি। অনুমান করিলাম, মাচান তৈয়ারী হয় নাই। সন্দেহ ভঞ্জন নিমিত্ত সলজ্জ ভাবে উত্তর দিলাম, ট্রেনে বসিয়া বসিয়া ভ্রমণ করিলে আমার ক্লান্তি আসে না। ভদ্র সন্তানের পক্ষে, এমন একটি উক্তি শোভনীয় হইবে না জানিয়াই কৃত্রিম লজ্জার অবগুণ্ঠন টানিয়াছিলাম।

আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। রেডি মহাশয় বলিলেন, মাচান তো তৈরি নেই, বেলা পড়ে গেছে, সন্ধ্যার আগে যদি কোনপ্রকারে দাঁড় করান যায় তো আপনাকে live baitএর উপর বসতে হবে। এদিকটা আবার সবই 'স্ট্রাইপ্‌স্‌' (বড় বাঘ) গুলি না লাগলে ক্ষতি নেই কিন্তু ঠিক জায়গায় তাগ না হলেই বিপদ। বাঘ জন্তুটা বড় বটে, কিন্তু vital part তো বড় নয়। নিশানাটা খুব পাকা হওয়া দরকার, কারণ বাঘ যখন পশু আক্রমণ করে তখন অত্যন্ত সতর্ক থাকে। তাড়াহুড়ায় ভুল জায়গায় গুলি লাগলে সে পশুকে ছেড়ে শিকারীকেই তাড়া ক'রে বসে। এদিককার এলাকায় সব দিকেই মহিষ বাঁধা হয়ে গিয়েছে, এখন সান্দ্রাপাড়ুর পথে চেষ্টা করা চলে, কিন্তু সেখানে গাছগুলো বেজায় নিচু, তার উপর পল্‌কা। জীবন্ত মহিষ রেখে বসা ঠিক হবে না। কয়েক দিন অপেক্ষা করুন একটা-না-একটা মহিষকে ঠিক মেরে দেবে, তখন ধীরে সুস্থে মাচান বেঁধে মারবেন। বসে বসে খাবে, টিপ করবার অনেক সময় পাবেন।

পূর্ব্ব হইতে মাচান না বাঁধার ত্রুটি সামলাইতে গিয়া রেডি-মহাশয় অযথা পাকেপ্রকারে আমার লক্ষ্যভেদনৈপুণ্যের উপর কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িলেন না। ইচ্ছা হইল রাইফেল বাহির করিয়া তখনই লক্ষ্যভেদের ভেল্কিবাজী দেখাইয়া দি, কিন্তু বিরত হইলাম এই ভাবিয়া, হয়ত ভদ্র-লোক অনেক নামকরা শিকারীর টিপ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়া থাকিবেন। সেই কারণেই নিশানা

সম্বন্ধে তিনি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না, তা ছাড়া, আমি ডিগুভামেটায় আসার দরুন তাঁহার অভিভাবকত্বের দাবিও জন্মাইয়াছিল, যাহা আমার মত পরমুখাপেক্ষী অস্বীকার করিতে পারে না।

গল্প করিতে করিতে তিনি জানাইয়া দিলেন—কতকগুলি সাহেব ও দেশী অফিসার এখানে শিকার করিতে আসিয়া বাঘের কামড়ে মরিয়াছিল। ধরের ছেলে ঘরে মরিলে তাঁহাকে শবদেহগুলি লইয়া জ্বালাতনে পড়িতে হইত না। অনভিজ্ঞ শিকারীর দল মরিয়া মরিয়া তাঁহাকে কি ভাবে নাজেহাল করিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া চলিলেন। গল্প চলিতেছিল তাহারই ফাঁকে নিকটেই সম্বরের (অশ্বের ন্যায় বৃহৎ মৃগ) ডাক শুনিলাম। চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, বাঘ শিকারে না আসিলে হাতে রাইফেল লইয়া শব্দ অনুসরণ করিতাম। কিছুক্ষণ পরে পাচক আসিয়া জানাইয়া গেল খানা প্রস্তুত! গভীর অরণ্যে কুক্কুট-মাংসের সহিত মোগলাই পরোটার যোগাযোগ কল্পনাও করিতে পারি নাই। পরম পরিতোষের সহিত আহার শেষ করিয়া কায়মনোবাক্যে রেডি-মহাশয়ের কল্যাণ কামনা করিলাম।

পরের দিন সকালে সান্দ্রাপাড়ুতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। রেডি-মহাশয় বিপদের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন, পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আমি মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে চলিয়াছি—কিন্তু আমার সঙ্কল্প স্থির দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সান্দ্রাপাড়ুতে মাচান বাঁধিবার আদেশ দিলেন।

মাচানের কামুফ্লাজিং (camouflaging) সম্বন্ধে আমি একটু বাতিকগ্রস্ত। সব দিক হইতে নিজে না দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না। শিক্ষিত বাঘেদের আবার উঁচু নজরটাই বেশী; বেটের (bait) নিকটে আসিবার আগে গাছের ডালগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়া থাকে। আবেষ্টনীর সহিত সামান্য গরমিল দেখিলেই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে এবং বধ্য জীবটি যতই সুস্বাদু হউক না কেন, অবহেলায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

বেলা চারটার সময় রওনা হইলাম। পৌঁছাইতে ঘণ্টাখানেক লাগিয়াছিল। এদিকটা ডিগুভামেটার মত নয়। অনুর্ব্বর জমি, রৌদ্রতাপে স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। মাচানের নিকটে আসিয়া দমিয়া গেলাম—বেজায় নীচু, সাত-আট ফুটের বেশী হইবে না, তাহার উপর ছোট ঘরের মত দেখাইতেছে—যথাসম্ভব ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া বেলা থাকিতেই বর্ণবাস (স্থানীয় বৃদ্ধ শিকারী) সহ উপরে উঠিলাম। রাইফেল ও গান্ পাশাপাশি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। মহিষটি মাচান হইতে প্রায় এক শত ফুট দূরে বাঁধা হইয়াছিল—ব্যবধানটি ভালই লাগিল। জখম হইলেও এক লাফে বাঘ ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে পারিবে না—দুই বার গুলি চালাইবার যথেষ্ট সময় পাইব। কুলীদের মাচানের কাছাকাছি বসিয়া গল্প করিতে বলিয়া দিলাম। লোকগুলি মাচানের নিকট গল্প করিলে বাঘ সন্ধ্যার সময়েও এদিকে

আসিবে না, ইত্যবসরে বাঘকে ভড়কাইয়া আমি মহিষের কাঁধে টর্চ্চ ফেলিয়া আলো ঠিক করিয়া রাখিতে পারিব।

যে-স্থানটিতে মহিষ বাঁধা হইয়াছিল সেখানে ঘন ঝোপের জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাজ চালানর মত অন্ধকার হইয়া আসিল—সুবিধাটি কাজে লাগাইলাম। আলোর ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেলে লোকগুলিকে গল্প করিতে করিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। তখন আকাশের পিঙ্গল-মিশ্রিত ফিকে গোলাপী রং মলিন হইয়া আসিতেছিল। দূরের পাহাড়গুলি একের পর এক অন্ধকারে মিলাইতে সুরু করিয়াছে—মাঝে মাঝে কেকারব শুনিতেছি—এক জোড়া বুলবুল পাশের ঝোপে মিহি সুরে গান ধরিয়াছে। মৃদু সমীরণে দূর হইতে বনফুলদলের মধুর গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। আবেষ্টনীতে রোমান্সের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, প্রকৃতির এই রসলীলায় আমিও মাতিয়াছি, বয়স কমিয়া যাইতেছে, কল্পনা রসরাজ্যে অভিযানের জন্য প্রস্তুত। ঠিক এমনি সময় শুনিলাম, খস্ খস্ খস্ শব্দ—মাচানের পিছনে। শুষ্ক পত্রের উপর সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে কোন জন্তু চলিয়া আসিতেছে—গতি তাহার মন্থর। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবাস আমাকে স্পর্শ করিল—সঙ্কেতে জানাইয়া দিল প্রস্তুত হও। তাহার সঙ্কেতের অপেক্ষায় আমি ছিলাম না—যথাসময়ে রাইফেল বগলে তুলিয়া লইয়াছিলাম।

শব্দ থামিয়া গিয়াছে, পলে পলে সময় কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সম্মুখের দৃশ্য অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে—কান খাড়া করিয়া বসিয়া আছি।

কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ আসিল খস্ খস্ খস্ আরও নিকটে এবং কিঞ্চিৎ দ্রুত। উত্তেজনায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, পাশেই জলাধার রহিয়াছে কিন্তু তাহা তুলিয়া পান করিবার সাহস নাই, পাছে কোন শব্দ করিয়া ফেলি। কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়াছিলাম স্মরণ নাই, হঠাৎ গলা এমন ভাবেই খুস্ খুস্ করিয়া উঠিল যে, নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না, বহুবার কাশিয়া ফেলিলাম এবং কপালে করাঘাতও করিলাম। সব কিছুই পণ্ডশ্রম হইয়া গেল—নিজেকেই ধিক্কার দিলাম। বর্ণবাস ত্বক্ ও জিহ্বার সাহায্যে যে শব্দ বাহির করিল তাহার আনুমানিক অর্থ—এমন সময় না কাশলেই কি চলত না বাবু—বাঘ যে পালাল! সঙ্কেতটি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত লাগিল।

এখন কিছুরই আশা নাই, মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সশব্দে জলাধার তুলিয়া শুষ্ক কণ্ঠকে সিক্ত করিয়া দিলাম। শ্মশান-বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছে, শ্মশানে সকলেই সমান। সাধারণ টর্চ্চটা মাচানের ভিতরে জ্বালাইয়া বর্ণবাসের হাতে একটা সিগারেট গুঁজিয়া দিলাম, বিশুদ্ধ বাংলাতেই বলিলাম, ফোঁকো,—টান, জোরে আওয়াজ করিয়া ব্যোম্ বলিয়া টান। ভাবিলাম জীবনে আর কখন শিকারে আসিব না। কাল সকালেই বার্থ রিজার্ভ করিতেছি—আজ রাত্রিটা কাটিলে হয়। আমার আচরণে বর্ণবাস কি ভাবিতেছিল কে জানে। উৎকট উত্তেজনার শেষ

পরিণাম অবসাদ। আমি উহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই, মাচানের স্বল্পপরিধির ভিতর যেটুকু স্থান করিতে পারিলাম তাহাতেই হাড়-গোড় দুমড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং টর্চ্চ নিবাইবার পর অল্প সময়ের ভিতর ঘুমাইয়া গিয়াছিলাম। মাঝে বর্ণবাস আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিল।

বর্ণবাসের সঙ্কেতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় রাইফেলের দিকে হাত বাড়াইতেছিলাম। বর্ণবাস কানের নিকট মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, "বাঘ আসে নাই, হুজুরের নাক ডাকিতেছিল।" শুইয়া পড়িলাম, পুনরায় বর্ণবাস সঙ্কেত দিল—এবার তাহার আঙ্গুলের দৃঢ় চাপের সহিত মহিষটার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। জীবন্ত মহিষের উপর বাঘ নিশ্চয় লাফাইয়া পড়িয়াছে—এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে মহিষটাকে মারিয়া ফেলিবে।

যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতা সহ সন্তর্পণে উঠিয়া বসিলাম—চকিতে প্রস্তুত টর্চ্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম—দেখিলাম মহিষটার পিঠে বাঘ চড়াও হইয়া ঘাড় কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। মহিষটা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বাঘের মাথাটা টর্চ্চের আলোর বাহিরে অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে, মাত্র পিছনটা এবং বুকের খানিকটা অংশ দেখিতে পাইতেছি। তখন কোনটা গান এবং কোনটা রাইফেল বাছিয়া লইবার সময় ছিল না। যেটাকে সামনে পাইলাম সেইটাকেই তুলিয়া বুক লক্ষ্য করিয়া ট্রিগার টিপিয়া দিলাম—সঙ্গে সঙ্গে বাঘ মহিষের অপর দিকে জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গেল। বাঘটা মরিয়াছে, এখন ওটা স্তূপীকৃত অসাড় মাংসপেশী ছাড়া আর কিছু নয়, তথাপি মাথায় আর একটা গুলি মারিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতাম। কিন্তু মহিষের পিছনটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। মাজাতে মারিতে মন চাহিতেছিল না। দো-নলা ব্রিচ লোডার দিয়া মারিয়াছিলাম—ভোঁতা লিথেলের আর একটা গুলি লাগিলে চামড়ার কিছু থাকিবে না। বিরত হইলাম।

অনেকক্ষণ আলো জ্বালাইয়া বসিয়া রহিলাম—বাঘ নড়িল না, উহার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া টর্চ্চ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন ভোর হইতে কত দেরি আছে অনুমান করিতে পারি নাই। উত্তেজনায় নিদ্রা আসিতেছিল না। খানিকটা সময় কাটিতে দেখিলাম বন্দুক রাখিবার বড় ছিদ্র হইতে আলো আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভোর হইতেছিল—উঠিয়া বসিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই আমার দৃষ্টি বধ্যভূমির দিকে চলিয়া গেল। বাঘ সেখানে নাই। ভাবিলাম দৃষ্টিভ্রম, আলো-আঁধারিতে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। টর্চ্চ জ্বালাইলাম, বাঘ সত্যই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম—টর্চ্চ-সংলগ্ন রাইফেল হাতে মাচান হইতে নামিতেছি দেখিয়া বর্ণবাস করজোড়ে নিষেধ করিল। তখন আমার হিংস্র প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরের পশু কোন বাধা মানিল না। অগত্যা বৃদ্ধ তাহার এক-নলা ঠাসা বন্দুকটা লইয়া আমাকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। দো-নলা ব্রিচ-লোডারটা লইতে বলিলাম, সে তাচ্ছিল্যের সহিত

প্রত্যাখ্যান করিল। অনুমান করিলাম, সেফ্‌টি লক্ ইত্যাদি কলকব্জাওয়ালা বন্দুক সে কখন ব্যবহার করে নাই।

মাটিতে নামিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাঘের গোঙানী শুনিবার জন্য। আমি নিশ্চয় জানিতাম সে বেশী দূর যাইতে পারে নাই। কোন শব্দ না শোনায় বর্ণবাসকে ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম। প্রথম ইতস্ততঃ করিয়াছিল, পরে কি ভাবিয়া পাথরের নুড়ি আমাদের সামনে ছুঁড়িতে লাগিল। এদিক ওদিক সেদিকে ঢিল পড়িতেছে কিন্তু কোন সাড়া নাই। বর্ণবাসকে অগ্রসর হইতে বলিলাম, সে কিছুতেই রাজী হইল না। লোকটা বোকা, আগে চলিলে ঢিল ছোঁড়ার কত সুবিধা পাইত। তাহার সঙ্কল্প দৃঢ় বুঝিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া গেলাম। সামনে ঢিল পড়িতেছে, আমি এক-পা দুই-পা করিয়া অগ্রসর হইতেছি। ঘন ঝোপটার কাছে আসিতেই এমন একটি স্থানে পা পড়িল যাহার স্পর্শানুভূতি নরম, রৌদ্রে দগ্ধ কঠিন মাটির নহে। চমকিয়া তিন-চার পা পিছাইয়া আসিলাম, অভ্যাস বশতঃ রাইফেল বগলে তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহার পর নীচের দিকে তাকাইলাম, পাইয়াছি—ঐ ত আমার হাতে মারা বাঘ। লেজের খানিকটা অংশ দেখা যায়—আবার তলার দিকটাও ঝোপের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ণবাসও দেখিয়াছিল। বলিলাম, ওটাকে টানিয়া বাহির কর। আদেশ পালন হইতে দেরি হইতেছিল—ফিরিয়া দেখি অতি পাকা শিকারী বন্দুক-হস্তে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অগত্যা মাটিতে রাইফেল রাখিয়া বলিলাম—আমি টানিয়া বাহির করিতেছি, তোমার একনলাটা ঠিক করিয়া ধর। বাঘকে নড়িতে দেখিলে গুলি চালাইয়া দিও। বলিয়া রাখা ভাল, আমার শারীরিক শক্তি সাধারণ বাঙালী যুবকের তুলনায় কিছু বেশী। কুস্তীর আখড়ায় ইহার প্রমাণ বহুবার পাইয়াছি, কিন্তু একলা বাঘটাকে টানিয়া বাহির করা সহজ বোধ হইল না। এই প্রসঙ্গে একটি স্বীকারোক্তির প্রয়োজন বোধ করিতেছি—হত জন্তুটি একটি অতিকায় লেপার্ড—চিতা নয়, "ষ্ট্রাইপ্‌স্"ও নয়—লম্বায় ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি, এত বড় লেপার্ড সচরাচর বড়-একটা দেখা যায় না। ঘুমন্ত চোখে টর্চ্চের অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঠিক বুঝিতে পারি নাই, উহার বিরাট বপুই দৃষ্টিভ্রম ঘটাইয়াছিল।

আমার টানাটানিতে মৃত লেপার্ড কোন আপত্তি না করায় বর্ণবাস সাহায্য করিতে আসিল।

গত রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজে এ অঞ্চলে সকলেই জানিয়াছিল গুলি চলিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বাংলো হইতে মালবাহক ও গ্রাম হইতে কৌতূহলী দর্শকের দল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল সকলেই খুশী হইয়াছে। আমি তাহাদের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিতেছিলাম না। ইহার জন্য তো ঘর ছাড়িয়া পাঁচ শত মাইল দূরে আসি নাই। তবু মন্দের ভাল। মনে বল পাইলাম—এখনও সাত-আট দিন ছুটি

আছে। ঠিক করিয়া ফেলিলাম, নজরানা যাহাই লাগুক বড়কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেছি না।

বাংলোয় ফিরিতে দেখিলাম রেডি মহাশয় অত সকালেই আসিয়াছেন। পাতশা সাহেব তাড়াতাড়ি লেপার্ড পরীক্ষা করিতে ছুটিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার শুভেচ্ছার জন্যই আপনার সাফল্যলাভ হইল।" মনে মনে ভাবিলাম বলি—"ঘুমন্ত চোখে দেড় সেকেণ্ডের ভিতর প্রায় এক শত ফুট দূরে চার ইঞ্চি টারগেট (লক্ষ্যভেদ) যতই সোজা মনে হউক না কেন, উহা বহু বৎসরের নিয়মিত সাধনার ফলে সম্ভব হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাত্রিতে টর্চ্চের আলোয় নিশানা ঠিক করা বরাতের উপর নির্ভর করে না।" কিন্তু বলা হইল না, ভদ্রাচারের শাসনে স্বীকার করিলাম—তিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন না করিলে বাঘের গায়ে গুলি লাগিত না।

রেডি মহাশয় মহিষটাকে সুস্থ অবস্থায় চলিয়া আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আপনার টিপ অসাধারণ।" এই ধরণের আত্মপ্রশংসা শুনিবার জন্যই তাঁহার দিকে প্রার্থী হইয়া তাকাইয়াছিলাম। তৃতীয় পুরুষকে প্রাপ্য সম্মান দিতে অনেকেই কার্পণ্য করিয়া থাকেন। রেডি মহাশয় বাস্তবিক গুণগ্রাহী, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া চলিলেন—কপালের কথা যদি বললেন তো সে আমাদের বর্ণবাসের, হরিণ মারতে গিয়েছিল—মেরে দিল বড় বাঘ ঐ এক-নলা ঠাসা বন্দুক দিয়ে, যার front sight, rear sight কিছুই নেই। শুধু একটি নল। ঝোপের ভিতর লুকিয়ে বসেছিল, চুনমাখান বন্দুকের নলটা বার ক'রে। বাঘ মশাই তাঁর মাথাটা বন্দুকের নলে ঠেকিয়েই চুলকানর ব্যবস্থা করলেন। আর বর্ণবাস ঘোড়া টিপেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। বাঘ মরল, বর্ণবাসকেও হয়ত বাঘিনী এসে শেষ করত যদি না লামবাডিরা (স্থানীয় জঙ্গলী, জীবিকা গোচারণ) ফিরতি-মুখে ওকে দেখতে পেত।

পরশ্রীকাতরতাবশতঃ আমি কথাটা চাপা দিলাম। ঐ ধরণের ভাগ্যবান্ পুরুষ আমার নিকট চক্ষুশূল। প্রশ্ন করিলাম—আজ কোথায় বসা যাবে?

রেডি মহাশয় উত্তর করিলেন, এখানে বড় বাঘ নেই, ঐ লেপার্ডটাই বড় বাঘের ঘরোয়ানা চালে দীক্ষিত হয়ে গ্রামবাসীদের অস্থির ক'রে তুলেছিল। আপনি এবার চিন্তামণিপাড়ুতে চেষ্টা ক'রে দেখুন—সে ভারী জঙ্গল, তবে ১৩-১৪ মাইল দূরে।

আমি জানাইয়া দিলাম, পাঁচ শত মাইল যখন আসিয়াছি তখন তাহার সহিত ১৩-১৪ মাইল যোগ দিতে কোন অসুবিধা হইবে না। রেডি মহাশয় কাজের লোক, কালবিলম্ব না করিয়া তখনই কতকগুলি কুলীকে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে পাতশা সাহেবের ছুটি ফুরাইয়াছিল—তিনিও সেই দিন মান্দ্রাজের দিকে রওনা হইলেন। লেপার্ডের চামড়া ও মাথার খুলি তাঁহার সহিত দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম—ট্যান করাইবার জন্য।

পরের দিন আমরা বেলা তিনটার সময় রওনা হইলাম। আস্তানায় পৌঁছাইতে সন্ধ্যা

হইয়া গেল। সমস্ত অপরাহ্ণ-রৌদ্রে ঝলসাইয়া গিয়াছিলাম—বাহিরের চাতালে বসিয়াছিলাম—ঘরের ভিতর পিঙ্গল মাল গুছাইয়া রাখিতেছিল।

আসিবার পথে পাথরের বিরাট রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহারই কথা মনে আসিতেছিল—অতীতের কত কথাই না উহার অন্তরে লুকাইয়া রহিয়াছে। কালের ধ্বংসলীলায় বহিরাকৃতি স্তরে স্তরে ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। কবির বাণী মনে পড়িল—'কথা কও, কথা কও, হে অতীত'। বটের শিকড়ের নিবিড় আবেষ্টন দেখিলাম—কি ভয়ঙ্কর মিলন-দৃশ্য। শিকড়ের দৃঢ় চাপে পাথর নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে তথাপি উহা বন্ধন-মুক্ত হইতে চায় না। ইহা প্রেম, না শক্তির পরীক্ষা?—ভাবিলাম শক্তিশালীর ঘনিষ্ঠ মিলন বোধ হয় এই ভাবেই হওয়া স্বাভাবিক। পাদমূলে বনস্পতি ও পাথরের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে—ক্ষীণস্রোতা নদীর বক্ষে। স্রোতস্বিনীর মৃদু কল কল ধ্বনির সহিত তাল রাখিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে কাঠ-ঠোক্‌রা পাখীটা। নদীর ওপারে যেখানে দিনের আলোর প্রবেশ-পথ ঘন পাতার আড়ালে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইখানে দেখা যায়—শাল, সেগুন ও অশ্বত্থ বিরাটাকার দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের গোড়ায় আশেপাশে ঘন ঝোপ। অন্ধকারের অস্পস্টতায় ভয়াল রূপ ধারণ করিয়াছে। আরও নীচে তাকাইলে দেখা যায় সবুজের গভীরতর অন্ধকার গহ্বর হইতে হিংস্র জন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব। দৃশ্যটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাপ্রসূত—তথাপি ভয়াকুল মন মানিতে চাহে না উহা কল্পনা।

অরণ্যের এই ভয়ঙ্কর জীবন্ত ছবি ও অপরূপ আবেষ্টনী তো আঁকিবার উপায় নাই। তুলির টানে গাছ পাথর নদী সবই আসিবে, কিন্তু অরণ্যকে ঘিরিয়া যে ভীতির আশঙ্কা জড়াইয়া আছে তাহা কোন্ শিল্পী চিত্রিত করিবে! সেই অজানা স্রষ্টা মহাশিল্পীর কথা মনে আসিল, মাথা নত করিলাম এবং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাইলাম, "আমার সকল অহমিকা চূর্ণ করে দাও।" আরও কত কথা ভাবিতেছিলাম মনে নাই, আনমনা অবস্থায় কখন সন্ধ্যা পার হইয়া রাত হইয়া গিয়াছিল তাহা খেয়াল ছিল না।

পরের দিন হইতে বিভিন্ন মওড়ায় দুইটি মহিষ বাঁধা হইতে লাগিল। মহিষদ্বয়ের ভিতর লেপার্ডের উচ্ছিষ্টটিও ছিল। মার্কা-মারা চলন্ত "গুড লাক্" সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না—এক দিন দুই দিন করিয়া পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, বাঘ কোনটাকেই মারিল না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, উচ্ছিস্ট পয়মন্ত মহিষটার চতুষ্পার্শ্বেই বড় বাঘ ঘুরিয়াছিল, এমন কি লাফ মারিবার জন্য একবার প্রস্তুতও হইয়াছিল। তাহার পদচিহ্ন ও বসিবার স্থানটি পরীক্ষা করায় উহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বাঁধা অবস্থায় দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঘটনাটি আশ্চর্য্যজনক হইলেও সত্য।

নিষ্কর্ম্মাভাবে আর কত দিন বসিয়া থাকা যায়! ক্যাম্প তুলিবার আদেশ দিলাম—নিজের

দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া হাসিলাম। চলতি কথায় একটি প্রবাদবাক্য আছে—"কপালে নাইক ঘি ঠক ঠকালে হবে কি ?"

পরের দিন সকাল হইতেই মাল তোলার সাড়া পড়িয়া গেল। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। এমন সময় কয়েকটি লামবাড়ি আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—সাহেব রক্ষা কর, আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে। বাঘ একটির পর একটি গর্ভবতী গাভী মারিয়া ফেলিতেছে। কাল রাত্রে দুইটিকে মারিয়াছে এবং একটিকে টানিয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়াছে।

লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আশা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—মাল নামাইবার আদেশ দিলাম এবং সময় নষ্ট না করিয়া লামবাড়িদের সহিত যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কালের ভিতরেই আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। পথ চলিতে চলিতে শুনিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থল মাত্র ৪ মাইল দূরে; পৌঁছাইয়া বুঝিয়াছিলাম ছয় মাইলের কম হইবে না। গরুটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে একটু সময় লাগিল, কারণ যেখানে মারিয়াছিল সেখান হইতে প্রায় তিন ফারলং টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। পিছনটা খাইয়া ফেলায় বাচ্চাটা গর্ভভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, আহা কি নধর কান্তি! হয়ত আর কয়েকদিন পরেই ভূমিষ্ঠ হইত।

গরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে মাচান বাঁধিবার জন্য একটি উপযুক্ত গাছ খুঁজিতে লাগিলাম—কোথাও পাইলাম না; নিরুপায় হইয়া মাটিতেই বসিব ঠিক করিয়া ফেলিলাম। নিকটেই বাঁশ-ঝাড় ছিল, উহার গোড়ার দিকে নাড়া দিতেই অধিকাংশই ভাঙিয়া গেল। কোনটার গোড়া পচিয়া গিয়াছে, কোনটার শিকড় মাটি ছাড়িয়া দিয়াছে।

গত্যন্তর না থাকায় নকল ঝাড় প্রস্তুতের নিমিত্ত কুলীদের গোড়া হইতে পাতাসমেত বাঁশ কাটিয়া আনিতে বলিলাম, এবং সেগুলি পুঁতিবার জন্য তিন জনকে মাটিতে গর্ত্ত করিতে লাগাইয়া দিলাম। খননকারীদের ভিতর বৃদ্ধটি জুৎসইভাবে সাবোল চালাইতে পারিতেছিল না। তাহার নিকট হইতে লৌহদণ্ডটা কাড়িয়া লইয়া নিজেই খুঁড়িতে লাগিয়া গেলাম—তাড়া ছিল, অপরাহ্নের পূর্ব্বে বসিবার স্থানটি প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত। ভিতরকার বাঁধন ইত্যাদি শেষ করিয়া বাহিরে কামুফ্লাজিং দেখিতে আসিলাম। নিকটে গিয়া পিছনে হটিয়া ছবিতে শিল্পীর শেষ পোঁচ লাগানর মত খুঁৎগুলি ঠিক করিয়া দিলাম। এখন কে বলিবে ইহা আসল বাঁশঝাড় নহে। খুশী হইয়া বর্ণবাস সহ ভিতরে ঢুকিলাম এবং প্রবেশ-পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিতে বলিলাম। কুলীর দল ইতিমধ্যে আদেশমত গরুটাকে টানিয়া বিপরীত দিকের বাঁশ-ঝাড়ে বাঁধিয়া দিল। মাত্র কয়েক গজ টানিয়া আনিতে নয় জন জোয়ান কুলী হিম-শিম খাইয়া গেল। তুলনায় বাঘের আসুরিক শক্তির কথা ভাবিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলাম।

মাথার উপর ঢাকা থাকার দরুন বাহিরের আলো সত্বেও আমাদের বসিবার স্থানটি গাঢ়

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, কুলীদেরও গরু বাঁধার পরেই চলিয়া যাইতে বলিয়াছি। ভিতরে টর্চ্চ জ্বালিবার উপায় নাই, অথচ সিগারেটের নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে, অন্ধকারে মাটিতে বসিয়া আর ধুম পান চলিবে না। প্যাকেটটা পাশেই কোথাও পড়িয়াছিল। হাতড়াইয়া বাহির করিতে গিয়া মনে হইল একটি বহুপদী লম্বা কীট আমার তালুর উল্টা পিঠে উঠিয়া পড়িয়াছে—ভাবিলাম হয়ত বড় কেঁদরাই, কিন্তু বন্দুক রাখিবার ছিদ্রের নিকট হাত আনিতে শিহরিয়া উঠিলাম। একটি বিশালকায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ শতপদী বৃশ্চিক! চোখ-কান বুজিয়া হাত ঝাড়িয়া সেটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। বাহিরে পড়িলেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না আবার যে ফিরিয়া আসিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি—পরক্ষণেই মনে হইল ভিতরে যে আরও পাঁচ-ছয়টা নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বৃশ্চিক ছাড়া যদি—আর ভাবিতে পারিলাম না.. পালাইবার পথও বন্ধ। ধরিয়া-বাঁধিয়া নিরীহ মহিষকে মাংসভুক্ বাঘের টোপ্ করিবার প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। সম্ভব-অসম্ভব অনেক ঘটনার আশঙ্কায় যে সময়টি কাটিল তাহারই ভিতর বাহিরে কখন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। এমন সময় মাত্র কয়েক হাত দূরে মাটি আঁচড়ানর শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরিচিত শব্দ। শব্দকারীকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে পাতার আড়াল সরাইতে দেখিলাম—একটি প্রকাণ্ড ভালুক নিবিষ্ট চিত্তে উইয়ের ঢিপি খুঁড়িয়া চলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে সনাতন প্রথায় শোষণ দ্বারা দধিভোজনের ন্যায় হুস্‌হাস্ করিয়া গর্ত্তে মুখ লাগাইয়া টান মারিতেছে। বাহিরে অন্ধকার হইয়া গেলেও তাহার ছায়ামূর্ত্তি (silhouette) দেখিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। এত কাছে যে, বন্দুক গায়ে ঠেকাইয়া মারা চলে। হাত নিস্‌পিস্ করিতেছিল। এত বড় হিংস্র জন্তুকে এত সুবিধার মধ্যে পাইয়া মারিতে পারিলাম না। বন্দুক চালাইলে বাঘের আশা ছাড়িতে হয়। নিজেকে সংযত করিলাম। অল্পক্ষণ পরে ভালুকটা চলিয়া গেল।

কি অসম্ভব নিস্তব্ধতা, একটি শুক্‌না পাতা পড়িলে তাহার শব্দ শুনিতে পাইতেছি! হৃদয়ের উপর কে যেন সশব্দে হাতুড়ি পিটিতেছে—বাহিরে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছি!—অকস্মাৎ দূরে ফেউ ডাকিয়া উঠিল, বনের রাজার আগমনবার্ত্তা—বাঘ আসিতেছে। ক্রমান্বয়ে সঙ্কেত আরও নিকটে আসিতে লাগিল—পরে আমাদের কেন্দ্র করিয়া ত্রিশ-চল্লিশ হাতের ভিতর চতুষ্পার্শ্বে ডাকিয়া চলিল। তবে কি আমাদের উপস্থিতি বাঘ জানিতে পারিয়াছে?—'কিল'-এর নিকটে আসিতেছে না কেন? আমার অনুমান অহেতুক। সন্দেহের কারণ কিছু থাকিলে ভালুক এত কাছে আসিয়া অতক্ষণ ধরিয়া আপন মনে মাটি খুঁড়িত না। হঠাৎ ফেউয়ের ডাক থামিয়া গেল। আবার সেই ভীতিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পর-মুহূর্ত্তে সমস্ত বনানী বিকম্পিত করিয়া বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত গরুটার উপর লাফাইয়া পড়িল। কি অবর্ণনীয় দৈহিক শক্তি—যেমন লাফাইয়া পড়িল অমনি গরুটাকে একটানে বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিল। অধিককাল

অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। টর্চ্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম। দেখিলাম সাক্ষাৎ-মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছে! টর্চ্চের আলোয় চোখ দুইটি গোলাকার অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। রাইফেল খুলিয়া টিপ করিতে যাইব, এমন সময় রিফ্লেক্টর ওপর হইতে কোন ওজনের চাপে ধীরে নীচু হইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ, আলো আমার সাম্‌নে মাত্র দুই হাত দূরে মাটিতে পড়িয়াছে! Flood light-এর ন্যায় রশ্মিচ্ছটা আমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, বসিবার স্থান ভিতরে আলোকিত হইয়া গিয়াছে, বাঘের দেহ দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে, রাইফেলের first sight-এ এতটুকুও আলো নাই, টিপ করিব কেমন করিয়া! মাটি হইতে ঠিকরান রশ্মিতে বাঘের চোখের উপর বিশেষ দিক হইতে উজ্জ্বল

সাক্ষাৎ মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি

আলো না পড়িলে জ্বলে না। যে কারণে তাহার চোখ জ্বলে, সেই কারণে হরিণ, মহিষ, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ও সাইকেলের পিছন দিককার নিরেট লাল কাচের টুকরাও জ্বলে। সত্যটি লিখিয়া কবির কল্পনার বাধা সৃষ্টি করিলাম—সেজন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আর একটি সত্য

বলিবার আছে—"ষ্ট্রাইপ্‌স" নরভুক্‌, এবং আহত না হইলে কখনো দলবদ্ধ মানুষকে আক্রমণ করে না—যাহা অতি চালাক লোকও করিয়া থাকে। মানুষের সামনে বাঘের আচরণ কতকটা প্রাচীন-পন্থী নব-বধূর ন্যায়। আত্মগোপন করিতে পারিলেই সে অধিক মাত্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

ক্ষণিকের ভিতর আমি উত্তেজনায় মরিয়া হইয়া উঠিলাম। সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলিয়াছি। চক্ষু দুইটির মণিস্থল লক্ষ্য করিয়া আন্দাজে ঘোড়া টিপিয়া দিলাম। বাঘ হুঙ্কার দিয়া পলাইয়া গেল—গুলি লাগে নাই; দুঃখে, ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম। বালকের ন্যায় কাঁদিতে পারিলে হয়ত সান্ত্বনা পাইতাম। ভাবিলাম, আহত না হইলে বাঘ এইরূপ অবস্থায় কত সময় ফিরিয়া আসে—আজ যে আসিবে না তাহা কে বলিতে পারে! কেন বলিতে পারি না, আশান্বিত হইয়া উঠিলাম।

তখনও টর্চটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাহিরে হাত বাড়াইয়া রিফ্লেক্টর উঠাইবার চেষ্টা করিতেই অনুভব করিলাম উহা আটকাইয়া গিয়াছে। ঠেলাঠেলিতে কোন লাভ হইল না। নিচু হইয়া দেখি—কামুফ্লাজিং নিখুঁত করিতে গিয়া বিভ্রাটটি ঘটিয়াছে। উপর হইতে একটি মোটা ডাল নিজস্ব ওজনে ধীরে নামিয়া আসিয়া রিফ্লেক্টরের উপর কায়েমিভাবে চাপিয়া বসিয়াছে। এখন বাহির হইতে ডালটি কেহ সরাইয়া না দিলে আলোর ব্যবহার বন্ধ। বাঘ ফিরিয়া আসিলেও তাহাকে আর মারিতে পারিব না।

বলাই বৃথা, বাঘ আর ফিরিয়া আসে নাই। সারাটা রাত জাগিয়া কাটাইয়া পরের দিনই মাদ্রাজে ফিরিবার ব্যবস্থা করিলাম।

রহস্য

নিঝুম রাত, চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার, অকস্মাৎ বিকট অট্টহাসিতে জঙ্গল আলোড়িত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই কঠোর আর্ত্তনাদ। কণ্ঠস্বর এমনই কর্কশ যে, আশু বিপদ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়।

নির্লিপ্ত থাকার অবসর ছিল না। রাইফেল-সংলগ্ন বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে শব্দ অনুসরণ করে ফেললাম। কেহ কোথাও নেই। আলো নিকটে ফেলতে দেখলাম—মরা গরু-টার পাশেই একটি মানুষ। সম্পূর্ণ দিগম্বর, রোমাঞ্চকর দৃশ্য। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অস্থিসার দীর্ঘকায় ব্যক্তি, মাথায় জমাট জটা, দাড়ী-গোঁফে মুখ একেবারে ঢেকে গিয়েছে। লোকটা অন্ধকারের দিকে চলেছে—মুখে আলো পড়তে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। সাদা ভাঁটার মত দুটো চোখ, চারপাশে কাল গভীর গহ্বর। চোখ ঘোরাতে পারি না, সম্মোহন-শক্তি আমার দৃষ্টিকে বেঁধে ফেলেছিল। খানিকক্ষণ লোকটা আমাকে দেখে নিল, তারপর চিৎকার করে উঠল। বীভৎস উচ্ছ্বাস। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। জড়ভরতের মত রাইফেল হাতে বসেই থাকলাম।

পরিচয়ের পালা অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল। টর্চের তীব্র আলোকরশ্মিতে চোখ ঝলসিয়ে গিয়েছিল। জোর করেই দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ রগড়াতে হোল। নজর একটু খোলসা হতে পুন-রায় আলো ফেললাম—লোকটাকে আর দেখা গেল না।

সময় তখন মধ্যরাত্রি হবে। আকাশে মেঘের গর্জ্জন শুনছি। দুচার ফোঁটা বৃষ্টিও সুরু হয়েছে। সারারাত মাথায় বৃষ্টি নিয়ে জেগেই কাটিয়ে দিলাম। গত্যন্তর ছিল না। উপযুক্ত মাচানের অভাবে মাটিতেই বাঘের শিকারে বসেছিলাম। আশ্রয় কেবল পাতার আড়াল। বাঘের চরিত্র জানা থাকলেও আত্মরক্ষার্থে সতর্কতা আপনা থেকেই এসে গিয়েছিল। স্বোপার্জ্জিত আহারের লোভ সামলাতে না পেরে পিছনদিক থেকে হিংস্র পশু এসে পড়লে করছি কি। জঙ্গল ঘাবড়ানর যতই ভয় পাক আহারের সামনে একলা মানুষকে পেলে একটা কিছু করে বসা বিচিত্র নয়।

পরের দিন, সরাইখানার আস্তানায় বসে ছিলাম। তীর্থযাত্রীদের এইখানে পথের মোড় ঘোরাতে হয়। গো-যান অথবা হাঁটা ছাড়া গভীর অরণ্যে দেবতা দর্শনের অন্য কোন উপায় নেই। স্টেশন অখ্যাত হলেও দেবতা জাগ্রত। উৎসব-উপলক্ষে বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময় এখানে লোক-সমাগম হয়ে থাকে। তীর্থভূমি ও স্টেশনের মাঝে সরাইখানা। দীর্ঘ ও দুর্গম পথের পাথেয় সংগ্রহ করতে হলে এইখানেই তার ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

দশটার ট্রেনে মেয়েপুরুষ মিলে একদল যাত্রী এল। বৈরাগীর দল, তীর্থভ্রমণ ওদের পেশা।

জঙ্গল থেকে ফিরেই সরাইখানার অধিকারীকে রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করেছিলাম, কোনটারই সদুত্তর পাইনি। বরং আমার কৌতূহলে লোকটা বিব্রত হয়ে উঠতে লাগল। বিরক্তির প্রকাশ ছিল না, আতঙ্কের আভাসই বেশী।

কোন কাজ ছিল না। বৈরাগীদের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলাম। যে আমার সঙ্গে কথা বলছিল তার নাম ভিখু বৈরাগী। রাত্রের ঘটনাই বলছিলাম, ভিখু বললে, "বাবু, ছাপোষা মানুষ হয়ে এই জঙ্গলে শিকার করতে এসেছ। মা-চণ্ডীর জঙ্গলে কেউ শিকার করে ফেরেনি। এই দুবছর আগের কথা, খাস সাহেবের ঐ দশা হয়েছিল—সাহেব তো মলোই, তার সঙ্গে বিবিও উধাও হয়ে গেল। সাহেবকে বাঘে খায়নি, কি হলো কে জানে, সে অনেক কথা। কলেক্টার সাহেব নিজে লোকলস্কর নিয়ে তদন্ত করে গেলেন, বিবিকে আর পাওয়া গেল না, ফুটফুটে মেয়ে ছিল বাবু, শখ করে শিকার দেখতে এসে জঙ্গলেই রয়ে গেল, মা-চণ্ডী তাকে নিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, যে লোকটাকে রাত্রে দেখেছিলাম, সে কি এদেশের মানুষ ?

বৈরাগী কানে আঙ্গুল দিয়ে জানাল, দোহাই বাবু, আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না। যা দেখেছ বা যা শুনেছ তা লোকের কাছে বললে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। ওসব কথা যে শোনে তারও পাপ। কথাটা শেষ হতে ভিখু দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে বললে, আমরা এখুনি রওয়ানা হচ্ছি, ওদিকে বেলা থাকতে থাকতে না পৌঁছালে পান্থশালায় আহার জুটবে না। লোকটার আতঙ্কে ঘটনাটি রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠল।

ঘণ্টাখানেক বাদে ভৃত্য ফিরে এসেছে। জঙ্গলীদের কাছে গরুটার খবর নিতে গিয়েছিল। রাত্রের ঘটনা শুনে, কেউ জঙ্গলের ভিতর যেতে চায় না।

নবীন, পুরাতন ভৃত্য, দীর্ঘকাল ধরে আমার শিকারের সাথী, বন্দুক চালানতেও কিছু হাত আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করা ?

নবীন দেখি দোমনা হয়ে গিয়েছে। একলাই বা যাই কেমন কোরে, ঘটনাটি সুবিধার লাগছিল না। আমার বাহ্যিক সাহসকে মাথা খাড়া করিয়ে তুললাম। নবীনকে বোঝানর চেষ্টা চলল, বাজে কথায় ভয় পাবার কিছু নেই। আমি নিজে লোকটাকে দেখেছি, একেবারে জীবন্ত মানুষ। চল সঙ্গে, আজ রাত্রে বাঘ ঠিক এসে যাবে।

প্রস্তাবটি নবীন খুব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেছে বলে মনে হোলো না। তার মাথা চুলকান বেড়েই চলেছে, হয়ত ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে, বাঘে ভরা জঙ্গল। এক দল মানুষ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এমন কথা কোথাও শুনিনি।

যে সময় নবীনকে সাথী করবার জন্য কৌশল খুঁজছিলাম সেই সময় সরাইখানায় আর একটি খবর এসে উপস্থিত। জঙ্গলীদের একটি সমত্ত মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে গরু

চরাতে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। মেয়েটার স্বামী এবং দলের সর্দ্দার দুজনাই এসে আবেদন জানাল, বন্দুক নিয়ে একবার খুঁজে দেখতে হয়।

শিকারীর আত্মমর্য্যাদা তখন পরীক্ষার মানদণ্ডে দোলায়মান। নবীনকে বললাম, আর দেরি না, তুমি দোনলাটা নাও। একদিকে মোটা ছররা পুরে রেখো। ছোট রাইফেলটা আমাকে দাও। দিনের আলোতে নিশানা ভুলের সম্ভাবনা নেই, ছোটয় কাজ হয়ে যাবে, সে যত বড় বাঘই হোক না কেন।

কথা শুনে নবীন বললে, বলেন কি! মা-চণ্ডীর জঙ্গলে শিকার! ভক্তির আড়ালে যে ভয় লুকিয়ে আছে তা অন্য সময় হলে বোঝাবার চেষ্টা করতাম কিন্তু বর্ত্তমানে বচসার স্পৃহা ছিল না। নবীনকে বাদ দিয়েই রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়লাম।

রদ্দুর টা টা করছে, মাটিতেও আগুন। পল্লীর সীমানা পার হলেই, আদিম কালের জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর খানিকটা ঢুকতেই গাছের ছায়ায় তীব্র রৌদ্রকিরণ ঢেকে গেল।

খোঁজার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই। মেয়েটা কোথায় গরু চরাতে এসেছিল কেউ জানে না। জঙ্গলীদের বোঝালাম, এইভাবে খুঁজে বেড়ালে বছর কেটে যাবে। তার চেয়ে গরুটাকে বাঘে খেয়েছে কিনা দেখে আসা ভাল। বাঘে গরু খেয়ে থাকলে তোমাদের মেয়ে খোঁজার ভার পুলিসের জিম্মায় ছাড়তে হবে।

পুলিসের নাম উল্লেখেই সকলের অস্থির ভাব দেখা গেল। সরদার বললে, আপনার কথাই ঠিক, গরুটা দেখে আসা যাক। একটা জলজ্যান্ত মানুষ উবে গেল। তারই সন্ধানে এসে এই দলবদ্ধ ঔদাসীন্য কেমনতর লাগল। ভাবলাম জঙ্গলীরা মায়াবাদের সারার্থ প্রাকৃতিক নিয়মেই শিখে থাকে।

জঙ্গলের ভিতর খানিকটা ঢুকতেই অসংখ্য মাছির ডাক শুনতে পেলাম। নিশ্চয় মরা গরুটার কাছে এসে পড়েছি এবং বাঘ ওখানে নেই।

গরুটার কাছে এসে দেখি, পিছনের বেশীর ভাগ অংশই নিঃশেষিত হয়েছে। গরুর পাশেই শুকনো ধুলোর উপর যে থাবার ছাপ পড়েছে, তা বড়ঘরের কর্ত্তাব্যক্তির পদচিহ্ন, বিরাট বাঘ। পশুরাজ সারাটা সকাল ধরে নিশ্চিন্ত মনে ভোজন সেরেছে। আজ রাত্রে না ফিরে যায় কোথায়। অতি-আহারে ক্ষুধাগ্নি মন্দা হলেও গচ্ছিত সম্পদ সামলাবার জন্য একবার অন্ততঃ হানা দিয়ে যাবেই। তাড়াতাড়ি মেয়ে খোঁজার কর্ত্তব্য সেরে নেবার জন্য লোকদের বললাম, এখানে থেকে আর লাভ নেই, অন্যদিকে চল।

পুলিসে আর না গিয়ে, মেয়ে-খোঁজার ভার নিজেই নিতে সরদারের মুখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দেখতে পেলাম।

ভিন্ন পথ সরাইখানার সামনের জঙ্গল দিয়ে। এই দিক দিয়ে তীর্থযাত্রীদের পথ। জঙ্গলীরা খুঁটির জোরে এগুতে লাগল, খুঁটি আমার আগ্নেয়াস্ত্র। আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম—ওরা জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল, অরণ্যের কি বিরাট রূপ! আকাশস্পর্শী বনস্পতি দৈত্যের মত মাথা খাড়া করে আছে, নীচের ছায়ায় মাঝে মাঝে এমন অন্ধকার যে দিনের বেলাতেও হাতড়ে হাতড়ে চলতে হয়। পাথরের তলায় উন্মুক্ত গহ্বরগুলি অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় সাহসীকেও সতর্ক কোরে তোলে; আবেষ্টনী আতঙ্কের প্রতীক হয়ে আছে। কোন্ অনাদিকাল থেকে ভয়ঙ্কর রূপ-সুন্দর হয়ে উঠেছে কে জানে! ভীতির জাগ্রত রূপ আমাকে আকর্ষণ করে, সুন্দরকে ভালবাসি, তাকে যে-রূপেই নিকটে পাই, আনন্দের উৎস বলেই গ্রহণ করি, স্থান কাল বা সংস্কারের বিচার ওঠে না। আমার বক্তব্যে নামি, লোকেরা মেয়েটার নাম ধরে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে গান এবং কাঠে কাঠ ঠুকে তাল। সতর্ক দৃষ্টি রেখেই এগুচ্ছিলাম—চলার পথে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ পেয়ে গেলাম। এই রকম একটি স্থান খুঁজছিলাম। পাথর-জড়ান শিকড়ের তলা থেকেই অন্তঃসলিলা মাটির উপর স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেছে, পরিষ্কার কাকচক্ষু জল। ছায়া, জল ও ঠাণ্ডা পাথর, সামনে পেতে একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা এল। Rifle পাথরের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে ঠাণ্ডা জলে পা ধোবার জন্য নালার কাছে এসেছি এমনি সময় দেখি দলের একজন তারস্বরে চিৎকার করতে করতে আমার দিকে ছুটে আসছে। পা ধোয়া আর হোলো না, উঠে গেলাম, কারণ জানার জন্য। লোকটা আমার নিকটে আসতেই নুড়ীতে ঠোক্কর খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

নালা থেকে চোখে মুখে নাকে অনবরত জল ছিটাতে মিনিট পনর পরে জ্ঞান ফিরে এল; কিন্তু কথা বলতে পারে না, ত্রাসে তখনো হৃদকম্পন চলেছে। লোকটার অবস্থা দেখে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। একটা সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয় দেখেছে, কি হতে পারে অনুমান করাও শক্ত। যাই দেখুক, বিপদ কাছেই আছে, রাইফেলটা এই সময় হাতে থাকা ভাল।

উঠে গেলাম গাছের কাছে। ফিরে এসে দেখি দাঁড়-করান রাইফেল পাথরের উপর শুয়ে আছে। খটকা লেগে গেল। জঙ্গলীদের ভিতর কে আমার ভরা বন্দুক নাড়াচাড়া করতে যাবে? পরে ভাবলাম ওঠবার সময় হয়ত শুইয়েই রেখে গিয়েছিলাম। যাই হোক, জঙ্গলের সাথীকে নিকটে পেতে ভরসা এল। মূর্চ্ছিত লোকটার ত্রাসের কারণ খোঁজার দরকার ছিল। লোকদের এগুতে বললাম, কিছুদূর চলতেই একজন চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে! দৃশ্য স্থানটিতে এসে দেখি জঙ্গলী মেয়েটি চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, ঘাগরা শতছিন্ন—উর্দ্ধাঙ্গ বিবস্ত্র। দেহের উন্মুক্ত স্থান কামড়ের দাগে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। চক্ষুগহ্বরের ভিতর দিয়ে কাল পিঁপড়ের সার চলেছে খুলির ভিতর। নিকটে এসে কামড়ের দাগ পরীক্ষা করলাম। নরভুক্ কোন অংশই খায়নি। অদ্ভুত জানোয়ার! এরূপ দৃশ্য শিকারের অভিজ্ঞতায় কখনো পাইনি।

লোকদের বললাম, একে নিয়ে চল সরাইখানায়। সেখান থেকে পুলিসের কাছে দিতে হবে। কি ভাবে মরেছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

পুলিসের নাম উঠতেই সকলেই পিছিয়ে পড়ল। কারণ এ মুল্লুকে পুলিসের হানা বৎসরে অনেকবার হয়ে থাকে। বিনা পাশে মদ তৈরি এদের পেশা। গোদের উপর বিষফোড়া ডেকে আনা কেউ পছন্দ করল না। গোড়ার দিকে পুলিসের নামে ওরা মেয়ে-খোঁজা ছেড়ে পরম উৎসাহে আমার শিকারের ব্যবস্থায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল কেন বুঝতে বাকি রইল না। বিবেচনা করে দেখলাম আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন। কর্ত্তব্য স্থির হতেই একসঙ্গে ফিরলাম, মেয়েটা রইল পড়ে। দুই-এক পা এগিয়েছি এমন সময় নিকটেই পিছন থেকে কর্কশ হাসি শোনা গেল। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। হঠাৎ রাইফেল তুলে পিছন ফিরে দাঁড়ালাম। দেখি মেয়েটার একটু দূরে ঝোপ আর পাথরের আড়াল থেকে একটি হাত বেরিয়ে আসছে লতা-গাছের গোড়া ধরবার চেষ্টায়। রাইফেল টিপ করে আদেশ করলাম বেরিয়ে আসতে। উত্তর এল অবজ্ঞার হাসি। লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল, হাতের পাশে খানিকটা পাথরের চাঁই উড়িয়ে দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলাম ভরা বন্দুক নিয়ে আমার কারবার। লক্ষ্য-স্থলের উপর নল ঠিক করে ঘোড়া টিপলাম, ঘট করে আওয়াজ হল কিন্তু গুলি বার হল না। Automatic repeater rifle বারবার ট্রিগার (trigger) টিপেই চলেছি, বারুদ আর ফাটে না। তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, কলকব্জা পরীক্ষা করার সময় ছিল না। সুধু হাতেই বোঝা-পড়া করে নেব ঠিক করলাম। কিছু না পারি বন্দুক উল্টে পেটান চলবে। সবে এক পা ঝোপের দিকে এগিয়েছি পিছন থেকে টান পড়ল। একজন জঙ্গলী আমার জামা ধরেছিল, ফিরে তাকাতে বললে, ঐ ঝোপের একটি কাঁটা ফুটলেই মৃত্যু। জঙ্গলী আরো কিছু বলতে চেয়েছিল এমন সময় অদৃশ্য দেহীর হাত লতাগাছের গোড়া ধরে সজোরে টান মারল—সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মৌমাছির ব্যূহে আটক পড়ে গেলাম। প্রকাণ্ড চাক মাথার ঠিক উপরেই ঝুলছিল। উপরে তাকিয়ে দেখিনি, জোর দোলায় ছোট ডাল নুয়ে পড়তে চাকের খানিকটা অংশ মাথার উপর থেঁতলে গিয়েছিল। মৌমাছি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে, দলের লোক আমাকে ছেড়ে দূরে পালাল। আমি চিল তাড়াবার প্রথায় খানিকক্ষণ মাথার উপর রাইফেল ঘুরিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে-ছিলাম। কিন্তু কোন্ দিক সামলান যায়। যে দিকে যতটুকু ফাঁক পাচ্ছে তাতেই আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছে। শেষ পর্য্যন্ত বিষাক্ত হুলের যন্ত্রণা আমাকে দৌড় করিয়ে ছাড়ল, দিগ্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট দিলাম। অনেকটা পথ দৌড়ানর পর বিষধররা আমাকে ছেড়ে দিলেও বিষের প্রতিক্রিয়া আমাকে জর্জ্জরিত করে ফেলেছিল। কোন প্রকারে সরাইখানায় পৌঁছেই নবীনকে বললাম, তাড়াতাড়ি বিছানা করে দাও। বিছানা পেতেই শুয়ে পড়লাম, দেখতে দেখতে জ্বর এসে গেল। অল্পক্ষণের ভিতরই বেহুঁস হয়ে গেলাম।

সন্ধ্যার দিকে জ্বর কিছু কমল। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় চোখ খোলার চেষ্টা করলাম, মনে হ'ল পাপড়ীর উপর ভারী ওজন চাপান আছে। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু দিয়েই দেখলাম আমার ক্যাম্প খাটের পাশে একজন জঙ্গলী কিসের পাতা আমার গায়ে বোলাচ্ছে, তার সঙ্গে বিড় বিড় করে নিজের ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে।

সকালে জ্বর ছেড়ে গেল, দেহের বেদনাও অনেক কম। ফুলে গোল হয়ে গিয়েছিলাম। বিছানার চারপাশে রাশ রাশ শুঁয়োযুক্ত পাতা, কতকটা লাউপাতার মত দেখতে। জঙ্গলী পাশেই বসেছিল, বললে, এই পাতা পাওয়া না গেলে আপনাকে বাঁচান মুশকিল হোত। বৎসরের মধ্যে এই সময়টিতেই এ পাতা তাজা থাকে।

ধীরে চেতনা ফিরে আসছিল, পূর্ব্বঘটনাগুলি মনে পড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, যে লোকটা মেয়ে খুঁজতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে এখন কোথায়?

উত্তর পেলাম, সেই লোকটাই মেয়েটার স্বামী। ভয়াতঙ্কে তারও খুব জ্বর এসে গিয়েছে, বেহুঁস হয়ে আছে নিজের ঘরে।

বিছানায় শুয়েই সমস্ত দিন কেটে গেল। নবীন ইতিমধ্যে বহুবার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ার উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। যতবারই পালাবার কথা শুনেছি ততবারই ভেবেছি জঙ্গলীটার আতঙ্কের কথা। কেবলি মনে এসেছে লোকটা কি দেখে অমনতর হয়ে গেল।

পুরো দুদিন বিশ্রামের পর উঠে দাঁড়াবার শক্তি পেলাম। বিছানা ছাড়তে পেয়ে প্রথমেই রাইফেল পরীক্ষা করলাম, একটিও গুলি ভিতরে নেই, Cartridge Chamber শূন্য। তবে কি গুলি ভরতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ ঘটনা একবার ঘটেছিল বলেই অমন অসম্ভব আচরণ ভাবতে পেরেছিলাম। তখন আর বন্দুকের বাক্স খুলে গুলি খোঁজার স্পৃহা ছিল না; দুদিন ফুলে ওঠার ব্যাপারে বেশ কাবু হয়ে গিয়েছিলাম।

যে সব গোলমাল হয়ে গেল তাতে জঙ্গলীদের কাছে শিকারের কোন সাহায্য পাব বলে মনে হয় না, সুতরাং পাত্‌তাড়ী গোটাবার আগে জ্বরে ভোগা মানুষটাকে দেখে আসতে পারলে ভাল হোত। ওদের লোক ওষুধ লাগিয়ে সেবা না করলে একটা বাড়াবাড়ি কিছু বাধিয়ে ফেলতাম।

জঙ্গলীদের পাড়া সরাইখানার খুবই কাছে। একলাই লাঠিতে ভর দিয়ে হাজির হলাম। সরদারের কথা যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সে-ই কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে তাকায়। আমাকে নিয়েই যেন একটা কানাঘুষো চলেছে—তবু ভদ্রাচারের তাগিদে এগুতে লাগলাম। সরদারের বাড়ীর কাছে আসবার আগেই কান্নাকাটির আওয়াজ পেলাম—নিকটে আসতে দেখি মেয়েরা শোকে অভিভূত—সরদার উঠানে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। খবর পেলাম মেয়েটার স্বামী জ্বরের ঝোঁকে ভুল বকতে বকতে, আজ সকালেই মারা গেছে। কেবলি বলেছে "কামড়ে খেলো, কামড়ে খেলো, ওকে বাঁচাও, শিকারী বাবুকে ডাকো।"

ব্যাপারটি অধিকতর জটিল হয়ে উঠল। সরদার বললে, "লোকে তোমাকেই দোষ দিচ্ছে, তুমি জঙ্গল না ঘাঁটালে দেবতার আক্রোশ আমাদের উপর পড়ত না। মানুষ-খেকোর কিছু ব্যবস্থা না হলে আমাদের এ জঙ্গল ছাড়তে হয়, অথচ অন্য কোন জায়গায় গেলে আমাদের আহার জুটবে না। যাত্রীদের পথ দেখিয়েই আমাদের দিন চলে। উপরি আয় মাঝে মাঝে হরিণ শুয়োর মেরে হয়, কিন্তু এখন জঙ্গলে ঢুকবে কে ?

মানুষ-খেকোর ব্যবস্থার আবেদনে কতকটা ভরসা পেলাম। আশুবিপদের সম্ভাবনা না থাকায় সরদারকে জানিয়ে এলাম, ব্যবস্থা করব, আমার সঙ্গে দেখা করো।

নানা টিটকারীর সাহায্যে নবীনকে কতকটা সাহসী করে তুলেছি। নিজে চাকরের (**bodyguard**) হয়ে দুই দিনের ভিতর নবীনকে দিয়ে একটি লেপার্ড মারিয়েছি। পাখীটা-আসটা মেরেছে কিন্তু বাঘের বংশধরের উপর কখনো গুলি চালায়নি—লেপার্ড মারায় ভাবটা খুসী-খুসীই লাগছিল।

আমার বনবাস ভিন্ন কারণে, যে জানোয়ার জীবন্ত মানুষকে কামড়ে মারে অথচ খায় না তাকে দেখবার কৌতূহল এমনই বেড়ে উঠেছিল যে, বিপদ সম্বন্ধে কোন খেয়াল ছিল না।

সরাইখানাতেই থেকে গেলাম। দেখতে দেখতে দশ দিন কেটে গেল। জঙ্গলীদের সরদার এর ভিতর দুই-তিন দিন এসেছিল—বকশিশের মাত্রা চড়িয়ে দিয়ে বলেছিলাম—আমাকে সাহায্য করলেই পাপ কোথায় লেগেছে ঠিক বার করে দেব।

পাপক্ষয়ের ক্রিয়া গড়িমসি করে চলছিল। আশাপ্রদ কিছু ঘটে নি। ইতিমধ্যে আমার রসদ ফুরিয়ে গেল। টিনে-পোরা বিলাতী স্থায়ী খাদ্য নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। আমি ঘোরতর মাংসাশী লোক, আহারের সংস্থানের জন্য রোজ সকালে আশেপাশের জঙ্গল থেকে বন্য কুক্কুট বটের, যা জুটতো মেরে নিয়ে আসতাম। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে পাখীগুলোও কাছের জঙ্গল থেকে পালাল।

আজ সরাইখানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছিলাম। একটা বড় সর (**partridge**) যদি বা জুটলো তো সেটা গুলি খেয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। এদেশে কাঁটাবনের সান্নিধ্য মারাত্মক ব্যাপার। রক্তের সঙ্গে মিশতে পেলেই সাপের ছোবলের কাজ আরম্ভ করে দেয়। কি করব ভাবছি, এমনি সময় দেখি ঝোপের ডগা নড়ছে, সঙ্কেতটি সন্দেহজনক। পাখীর নড়া-চড়ায় বড় ঝোপ অমনভাবে দোলে না—নিশ্চয় তলায় জানোয়ার আছে। পিছুতে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে খালি নলটা বড় গুলি দিয়ে ভরে নিলাম।

কয়েক পা মাত্র পিছিয়েছি দেখি ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের পা বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ দেখলে শুকনো চামড়া বলে ভ্রম হয়। ভাল করে পরীক্ষা করার তখন সময় নেই। আরও খানিকটা পিছুতে অস্থি-মাংসহীন পা ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল।

দোমনা অবস্থায় পড়ে গেলাম। ভালুকের মত ভয়ঙ্কর জানোয়ারের উপর অত কাছে থেকে আন্দাজে গুলি চালান উচিত কি না ? এক গুলিতে মাটিতে ফেলতে না পারলে আমারই উপর যে চড়াও হবে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। গুলি খাওয়ার পর—নাড়ী-ভুঁড়ি বেরিয়ে-যাওয়া ভালুক শিকারীকে আক্রমণ করে ছিঁড়ে ফেলতে দেখেছি।

একদিকে বিপদের আশু সম্ভাবনা, অপরদিকে অতবড় শিকার নাগালে পেয়েও যদি ছেড়ে চলে যাই তাহলে নিজের কাছে অক্ষমণীয় হয়ে যাব। ঠিক করলাম যা থাকে কপালে হবে, গুলিই চালাব। ধীরে পিছু হাঁটতে লাগলাম আমাদের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলার জন্য। এই ভাবে ২০-২৫ হাত তফাতে এসে পড়েছি—প্রথম নল কাজ না করলে দ্বিতীয়বার টিপ করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

ট্রিগার পড়ে গেল,—ঝোপ নড়ে না। পুনবায় একই জায়গায় লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপলাম—ঝোপের তলা থেকে খানিকটা শুকনো ধুলো এবং কতকগুলি ছোট পাথরের নুড়ী চারধারে ছড়িয়ে পড়ল—ঝোপ অসাড়। দু দুবার বন্দুকের গুলি চালাতেও ঝোপের ভিতর থেকে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না—তখন নয় ভালুক মরেছে বা পালিয়েছে অথবা আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটেছিল, হয়ত কোন শুকনো কাল পাতা দেখেছিলাম। এরূপ ঘটনা শিকারে প্রায় ঘটে থাকে। তবু স্থানটি পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল। খালি নল দুটো ভরে নিয়ে ঝোপের কাছে সন্তর্পণে এগুতে লাগলাম হাতের নাগালে আসার আগে একটা নুড়ী ছুঁড়ে মারলাম—কোথাও কিছু নেই।

নির্ভয়ে ঝোপের কাছে এসে পড়লাম—অতি নিকটে আসতে ঝোপের তলায় নজর পড়ল, জায়গাটা প্রায় ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা। সামনেই partridge মরে পড়ে রয়েছে—তার পাশেই গুলি খাওয়া ভালুকের ছাল। চামড়া সরাতেই একটি গর্ত্ত বেরিয়ে পড়ল, শেয়াল বা অন্য কোন জানোয়ারের বাসস্থান হবে। প্রবেশপথ অস্বাভাবিক রকমের চওড়া, স্বচ্ছন্দে একটি মানুষ হামা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, গর্ত্তের একটু ভিতর দিকে দেখা গেল, ছয়টি রাইফেলের কার্ত্তুজ। প্রথম দর্শনেই ধরা পড়ল আমার রাইফেল থেকে পলাতক টোটাগুলি যে ভাবে গুছিয়ে রাখা ছিল তাতে মনে হয় একটু আগেই কেউ সযত্নে নাড়াচাড়া করছিল। নানা অসম্ভব ও অস্বস্তিকর চিন্তা আমাকে জড়িয়ে ধরল, শেষ পর্য্যন্ত গোয়েন্দার গল্পের ভিতর ঢুকে পড়লাম নাকি ?

জঙ্গলে যা শুনেছিলাম এবং যা দেখলাম তা লোকের কাছে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কানে আঙ্গুল দেবার মতই জিনিস বটে।

জঙ্গলে বসে চিন্তা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, চামড়া আর গুলি নিয়ে আস্তানার দিকে ফিরলাম। সরাইখানায় পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল—শিকারের ঝোঁকে বেশ দূরেই গিয়ে পড়েছিলাম।

ভালুকের ছাল দেখে নবীন জিজ্ঞাসা করল, ওটা কোথা থেকে পেলেন? উত্তর দিলাম, জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছি, কোন যাত্রী ফেলে গিয়ে থাকবে, দাবী করলেই ফিরিয়ে দেব। ভালুকের প্রশ্ন এক কথায় নিষ্পত্তি হলেও, সরাইখানায় স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা দেখে নবীন কয়দিন থেকেই অস্বস্তি প্রকাশ করছিল। বেদরদীকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য আটকে রাখা বিড়ম্বনা। স্বার্থ সম্বন্ধে লাভের দিকটা দাম দিয়ে কেনা যায় কিন্তু যেখানে দামের কোন মূল্য নেই সেখানে স্বার্থত্যাগই যুক্তিসঙ্গত।

নবীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে, বাড়ী ফিরে যাবে? এমন একটি উপাদেয় প্রস্তাব নাগালে পেয়েও চক্ষুলজ্জার খাতিরে লোকটা বলে বসলো—"আজ্ঞে আপনি না গেলে আমি কেমন করে যাই!" ঠিক এই রকমটিই খুঁজছিলাম—হাজার হোক পুরাতন ভৃত্য, ভক্তির একটু ছিটে ফোঁটা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিড়ম্বনাকে পাশ কাটিয়ে স্বার্থকেই কাছে টেনে নিলাম। উত্তর দিলাম—আর কয়েকদিন থেকে যাও, বড় বাঘের খবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

নবীন মাথা চুলকিয়ে বোঝাতে চাইল, অগত্যা।

বাঘ পাই বা না পাই জটাধারীকে ধরার জন্য সংকল্প দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। ওকে ধরতে পারলে কি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে জানি না কিন্তু মনের সুখে বেধড়ক মার দেবার সুবিধা পাব। ঐ টুকুই আমার মস্ত লাভ, বাছাধনকে হুল ফোটানর প্রতিক্রিয়া কি রকম হতে পারে দেখা প্রয়োজনবোধ করছিলাম। যে একখানি শীর্ণ হাত দেখেছিলাম তার মালিক জটাধারী না হয়ে যায় না।

নবীনকে বললাম, মাচান টাচান কিছু না, মোষ ছাগল কিছু বাঁধছি না, যেখানে খুসী একটা গাছে বসে থাকব। জানোয়ারদের পথ চলার মওড়াগুলো চিনে ফেলেছি। তুমি সরাইখানাতেই থাক, কেবল সরদারের লোকদের সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসো। কিছু অঘটন ঘটে গেলে অন্ততঃ সৎকার তো করতে হবে। নবীন দেখলাম ভক্তি ছাড়া আমাকে ভালও বাসে। সৎকার ইত্যাদির কথা শুনে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল, যেন খরচের ব্যবস্থা না করে চিতার কাঠ সরবরাহের ফরমাস দিয়ে ফেলেছি।

আমার উদ্দেশ্য সাধনে সরদারের সাহায্য পাওয়া গেল। তাকে গোপনে জানিয়ে দিয়েছিলাম এটা বাঘের শিকার না, মানুষ-খেকোর বিরুদ্ধে অভিযান-সাফল্য তোমার সাহায্যের উপর নির্ভর করছে। অবিশ্বাসের কারণ ছিল না কারণ শিকারের যাবতীয় অনুমান বাদ দিয়েই জঙ্গলের পথে রওনা হলাম।

দল সংগ্রহ না হলে বিকেলের দিকে একলা বাঘে-ভরা জঙ্গলে ঢোকার সাহস ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, Man-Eaters of Kumaun-এ পড়েছি, মানুষ-খেকো বাঘ ও বাঘিনী জোড়ে

যে অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, সেইখানে একটিকে মেরে শিকারী ঘোর অন্ধকারে ঝোপের ভিতর নির্ভুল ছুরি চালিয়ে, স্বহস্তে trophy ঘালপোষ করেছিলেন এবং ভিজে ও ভারী চামড়া বহন করে আস্তানায় ফিরেছিলেন। বাঘের প্রেম নির্লিপ্ত, তাই রক্ষা, নইলে ঘালপোষকালীন জোড়ের আর একটি জানোয়ার-প্রেমিক ঘাতককে অন্ততঃ একবার চিনে নেবার চেষ্টা করত। আমার সাধনালব্ধ সাহস ছিল না, নিরুপায় হয়েই লোকজনের ব্যবস্থা করেছিলাম।

অভিযানের কথা বলি, গন্তব্য স্থান সেই ঝোপের দিকে, যেখানে ভালুকের চামড়াকে চলতে দেখেছিলাম। একটি বিশেষ দিক ঠিক রেখেই এগুচ্ছিলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়তে হোলো। বিরাট জঙ্গলে একটি শেয়ালের গর্ত্ত খুঁজে বার করা অসম্ভব প্রয়াস। আন্দাজ অনুসারে জায়গাটার কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম বোধ হয়। একটি মনোমত গাছ পেতেই উঠে পড়লাম।

বেমক্কা জায়গাতেই শিকারে এসেছিলাম। জঙ্গলীদের পর্য্যন্ত জায়গা চেনার জন্য চিহ্ন রাখতে হয়! সরদার একটি বিশেষ গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়ে নিচ্ছে। চার পাঁচজনের সাহায্যে যথেষ্ট পাতা সংগ্রহ হতে গাছের পর গাছে লতা দিয়ে বেঁধে লোকগুলো ফিরতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বেশ নিরাপদ ডালেই বসেছিলাম। বগলের তলা দিয়ে, কাঁধের উপর দিয়ে ডালের সঙ্গে মোলায়েম ও কড়া দড়ী দিয়ে নিজেকে বেঁধে ফেলেছি। শিকারে এই পন্থাটি আমার নিজের আবিষ্কার। ঘুম এলেও মাটিতে পড়ার কোন আশঙ্কা নেই। হ্যাঁচকা টানেই সামলে নেওয়া চলে। টর্চ লাগান বন্দুক সামনের দুটো ডালের উপর রেখে পকেট বালিস ঘাড়ে লাগিয়ে আরাম করে বসেছি। দেখতে দেখতে সমস্ত জঙ্গল অন্ধকারে ডুবে গেল।

ইতিমধ্যে বনফুলের গন্ধে জঙ্গল মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। যৌবনকে চাগিয়ে তোলার আয়োজনে বেকার বসে থাকতে পারলাম না। রসচেতনা আমাকে টেনে নিচ্ছিল গোপন পানীয়ের দিকে।

চুমুকের পর চুমুকে রসোপলব্ধি গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল—জঙ্গল অল্পক্ষণেই ফুলের বাগান হয়ে উঠল।

এই সময় অতি নিকটেই মানুষের কাশি শোনা গেল। তার সঙ্গে ফেউ-এর ডাক। মুহূর্ত্তে বাস্তবে এসে পড়লাম—কাছেই কোথাও বাঘ ঘুরছে। বিস্ময়কর ঘটনা, আর একবার মানুষ কাশতেই ফেউ-এর ডাক থেমে গেল, আবেষ্টনী নিস্তব্ধ। যে সব শব্দ শুনেছিলাম তাদের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না—ভুল জায়গায় আলো ফেলে সব কিছু পণ্ডশ্রম করতে চাইনি।

মিনিট দশেক পর শুকনো পাতা মুচড়ে যাবার শব্দ পেতে লাগলাম, এলোমেলো গতি, তার সঙ্গে নারীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, কেউ যেন তার গলা টিপে শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করে দিচ্ছে। সুরার প্রতিক্রিয়ায় চিত্তচঞ্চল হয়েছিল, ক্ষণিকে অনুমান প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, মনশ্চক্ষে দেখলাম—

বীভৎস ভোগের আয়োজন চলছে। ভোগ ? অসম্ভব, নারী এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে আসে কেমন কোরে ? হতেও পারে কুলটার অভিসার, জঙ্গলই নিরাপদ স্থান। দম বন্ধের আওয়াজ কেন, তবে কি মেয়েটাকে বাঘে নিল ? নেশা তখন আমাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছে, চিন্তার খেই পেলেও তার সিদ্ধান্ত নেই।

মাটিতে চলার সাহস না থাকলেও, জ্ঞান যোল কড়াই ছিল। গাছের ওপর থেকে আলো চারধারে ঘোরাতে লাগলাম। জঙ্গলে একটি প্রাণীকেও দেখা গেল না।

সময় কেটে যাচ্ছিল…হঠাৎ যেদিকে মেয়েটার কাতরধ্বনি শুনেছিলাম সেই দিকে কিছু ভারী ওজন হিঁচড়ে টেনে নেবার আওয়াজ উঠল। তার সঙ্গে কাপড় ছিঁড়ে যাবার সঙ্কেত পাচ্ছিলাম। নিকটেই ঘটনাগুলি ঘটছিল, আলো ফেললাম, সামনে খালি জায়গা, তারপরেই খাড়াই ঝোপ। ঝোপের ডগা যৎসামান্য দুলে থেমে গেল। নিশ্চয় কোন জানোয়ার ঐদিক দিয়ে পালিয়েছিল। কিছু দেখতে না পেয়ে আলো নিবিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে আর এক-বার টানার শব্দ উঠেছিল কিন্তু আলো ফেলতে পারিনি, নিজের সমভার সামলাতেই অস্থির হয়েছিলাম।

সারারাত ঝিমিয়ে ও জেগে কেটে গেল। সকালে সরদার এল লোকজন নিয়ে। গাছ থেকে নেমেই সন্দেহের জায়গা দেখে এলাম। নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা। সুরা ও মাদকীয় গন্ধের প্রভাবে রসচেতনা ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল। ফিরছিলাম, পথ চলতে কাঁটা গাছের সঙ্গে পায়জামা আটকে গেল, নীচু হয়ে কাপড় বাঁচাতে গিয়ে দেখি, ঠিক পায়ের তলায় কতকগুলি ভাঙ্গা শাঁখার চুড়ী। নিকটেই পিঁপড়ে, জায়গায় জায়গায় জমাট বাঁধতে সুরু করেছে। একটু দূরেই বিরাট চলন্ত বাহিনী, ওরা চলেছে ঝোপের ভিতর। মুখে ডিম নেই, অভিযান আমাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল।

জঙ্গলে পিঁপড়ের দলবদ্ধ চলার পিছনে অনেক রহস্য জড়িয়ে থাকে। খোঁজ নিতে গিয়ে টাটকা মারা স্বামবার হরিণ পেয়েছি। ঘরোয়া বিবাদে ভালুককে মরা অবস্থায় দেখেছি, এবারও একটা কিছুর সন্ধান পাব না এমন কথা কে বলতে পারে। পিঁপড়ের সার চলেইছে…২০।২৫ গজ তাদের পিছু নিয়ে একটি শেয়ালের গর্তের সামনে পৌঁছালাম। সারবন্দী পিঁপড়ে চলেছে গর্তের ভিতর। এখানেও মুখগহ্বর বেজায় চওড়া। গর্তের সামনেই ভারী কোন জানোয়ার টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন—সন্দেহ সত্যের সামনে এগিয়ে দিল। ধুলো নিয়ে মন্ত্র ফুঁকলাম। তিন-বার গর্তটা প্রদক্ষিণ করলাম, তার পর সরদারকে বল্লাম, গর্তের ভিতর সজোরে লাঠি চালাও। কিছু বেরিয়ে এলে আমি পিছনে আছি।

আমার মন্ত্রোচ্চারণে কোন অর্থপূর্ণ শব্দ না থাকলেও সরদারের শ্রদ্ধা উদ্রেকের প্রয়োজন ছিল। এইরূপ ব্যবস্থা না করলে লোকটা ভাবত আমি জঙ্গলে শেয়াল শিকারের জন্যই এসেছি। পরিহাসের মালমসলা যোগাড়ে সচেষ্ট ছিলাম না, সেই কারণেই মন্ত্র পড়তে হোলো।

সরদার ভিতরে খানিকটা লাঠি ঠেলেই বললে, কি একটা নরম ঠেকছে। লাঠিটা নিজেই নিয়ে অনুভব করবার চেষ্টায় চালালাম। হাত দুই-এর ভিতর মাংসল জীবের স্পর্শানুভূতি পেলাম, জানোয়ারটা মরেছে।

জঙ্গলীরা গাছ কাটা কুড়ুল নিয়ে এসেছিল, বললাম, গর্ত্ত কেটে যাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জানোয়ারে দেখা যায়। দুজন জোয়ানে এক সঙ্গে কুড়ুল চালাতে লাগল। গর্ত্তের উপর খানিকটা কাটার পরেই ছোট-বড় পাথরের নুড়ী বেরুতে লাগল। কুড়ুল আর চলে না। হঠাৎ মনে পড়ল বন্দুক সংলগ্ন টর্চ্চের কথা। মাটিতে শুয়ে আলো ফেললাম গর্ত্তের ভিতর। কি সর্ব্বনাশ, দুটো নিটোল পা, স্ত্রীলোকের পা! শাড়ীরও খানিকটা অংশ দেখা যায়। যা দেখলাম তা প্রকাশ করলে জঙ্গলীরা আমাকে ফেলে পালাবে, স্ত্রীলোকটিকে সনাক্ত করার কোন উপায় থাকবে না এবং আমার পক্ষে রাস্তা চিনে জঙ্গল থেকে বার হওয়া অসম্ভব। হতাশ হয়ে সরদারকে বললাম, গর্ত্ত কাটতে না পারলে আমার মন্ত্র কাজে আসবে না। ভিতরে যে জানোয়ার মরেছে সেটা শেয়াল নয়, দেবতার অভিশাপের প্রমাণ। পাপক্ষয় এইখান থেকেই সুরু করতে হবে। বিকেলের আগে এখানে চার পাঁচটা সাবোল নিয়ে পৌছান চাই। সরদার আমার ক্রিয়া-কলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিল বলে মনে হোলো না, তবে পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্য জড়ান থাকাতে রাজী হল।

বিকেলে দল বেঁধে ফিরলাম। সরদার মাথা ধরার অজুহাতে নিজের পাড়াতেই রয়ে গেল। প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম, কালক্ষেপ না করে লোকগুলোকে কাজে লাগিয়ে দিলাম। আধঘণ্টার ভিতর নুড়ীর আড়াল সরে গিয়ে আবার মাটি বেরিয়ে পড়ল। কোদালের কোপ সুরু হল—অল্পক্ষণেই গর্ত্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। কোদাল সংযতভাবে চালাতে বললাম। গায়ের উপর অস্ত্র পড়লে পুলিসে আমাদের নিয়েই টানাটানি সুরু করে দেবে। উপরে তখন বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে। এই ফাঁকের মধ্যে আলো পুরে সুইচ টিপলাম, ভিতরে কিছু নেই। তবু খোঁড়া চলল, উপর থেকে আর একটি গর্ত্ত বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠতে দেখলাম। ভূগর্ভের গর্ত্ত ভিন্ন দিকে মোড় ঘুরেছে অর্থাৎ আশ্রয়টির প্রবেশপথ তিন চার দিক থেকে, ভিতরের ফাঁকও বেজায় বড়। শেয়ালের গর্ত্ত হলেও সুড়ঙ্গ বৃহৎ করার পিছনে ভিন্ন জীবের হাত আছে। ফাঁকের ভিতর দিয়ে গর্ত্তে নেমে ভিতর দিকে আলো ফেললাম। কি একটা চক চক করে উঠল, ভাল করে দেখলাম, একটি ধারাল বেঁটে কুড়ুল। যেখানে কুড়ুলটি দেখা গিয়েছিল সেখানে নুড়ীর বাধা সরিয়ে পৌছাতে তিন চার দিন সময় লেগে যাবে। হামা দিয়ে বসলাম, দিব্বি চলা যায় কিন্তু মোড়ের আড়ালে কি আছে জানি না। এগুতে সাহস পেলাম না। অনেক কিছুর সন্ধান পেয়েও খোঁজা ছেড়ে দিতে মন চাইছিল না, তথাপি ফিরতে হোলো···মন্ত্র ফাঁকায় উড়ে গেল। জঙ্গলীদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে আস্তানায় ফিরলাম।

সকালে দেখলাম বৈরাগীর দল তীর্থ দর্শন করে ফিরেছে। সকলেই বিমর্ষ। ভিখু বৈরাগী

নিজেই এল আমার কাছে, বললে, বাবু কিসের তরে আমাকে ঐ কথাগুলো জিজ্ঞাসা করে-ছিলে ? দেবতার কোপের ভয়ে কাণে আঙ্গুল দিয়েছিলাম তবু পাপক্ষয় হল না, মেয়েটাকে তিনি নিলেন, ফিরবার মুখে মা চণ্ডীর জঙ্গলেই মেয়েটা থেকে গেল। কত খুঁজলাম বাবু, কত মানত করলাম কিছুতেই কিছু হোল না। কথাটা শেষ করে ভিখু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সান্ত্বনা দেবার কিছু ছিল না, তবু যেটুকু সন্ধান পেয়েছিলাম তাই সঠিক কিনা জানবার জন্য প্রশ্ন করলাম, তোমার মেয়ে কি বিধবা, দোহারা গঠন ? ভিখু পূর্ব্বের মতই কানে আঙ্গুল দিয়ে বললে, আর জিজ্ঞাসা করো না বাবু, মেয়েটা গেছে এখন ওর মাকে নিয়ে ভালয় ভালয় দেশে ফিরতে পারলে বাঁচি। বৈরাগীর দল সেইদিনই সরাইখানা ছেড়ে ট্রেনে চড়ল।

শিকার আমার মাথায় উঠে গিয়েছিল, পালাতে পারলে আমিও বাঁচি। একবার ভাবলাম নিজে গিয়ে পুলিসকে খবর দিয়ে দি। পরে বিবেচনা করে দেখলাম, মা চণ্ডীর জঙ্গলে স্বচক্ষে যা দেখেছি এবং যা শুনেছি তা প্রমাণ করা অসাধ্য সাধন। জঙ্গলীদের সাক্ষী খাড়া করলে ওরাই আগে বলে বসবে বাঘে খেয়েছে। ওদের আসল সাক্ষী পরলোকে। যাকে শেয়ালের গর্ত্তে দেখেছিলাম সে যদি বৈরাগীর মেয়ে হয় তো তারও পাত্তা নেই। ইতিমধ্যে মাংসল দেহ অস্থিতে পরিণত হয়েছে। কাপড় বা অস্থি খুঁজে বার করলেও তা সনাক্ত করবে কে ? শিকারের পাত্‌তাড়ী তুলে ঘরমুখো হলাম। পথের মাঝে নানা প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে লাগল, বীভৎস কীর্ত্তি কি জটাধারীর, লোকটা কি পাগল, অথবা কেউ অতৃপ্ত ক্ষুধাকে আদিম প্রথায় চরিতার্থ করার জন্য জঙ্গলকে রহস্যময় করে তুলেছে ?

মহানন্দীর জঙ্গল

মুখুজ্জে মশাই বলছিলেন, রেসট্ হাউসে আস্তানা গাড়বার জন্য সদলবলে চলেছিলাম। গ্রাম ছাড়িয়ে সবে জঙ্গলের রাস্তায় উঠেছি, অমথা ঝিমো (আমার কুকুর) পাশের ঝোপের দিকে খানিকটা গিয়ে ডেকে উঠল, ত্রাসের ভয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ তোলপাড় হয়ে গেল। তারপরই দেখি বিরাট বাঘ শূন্যে উড়ছে। মুহূর্তের ঘটনা, বাঘ বিপরীত দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল, আমি ভরা-বন্দুক হাতে নিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

উড়ন্ত বাঘ, লোকেদের এলোমেলো ছোটাছুটি, গরুর গাড়ী খানায় পড়া ইত্যাদি বিশৃঙ্খলায় কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিছু সময় কেটে যেতে দেখি, খানায় পড়ে গাড়োয়ান অসাড় অবস্থায় রয়েছে। ভাবলাম গরু ভড়কাতে গাড়ী ওল্টাবার ভয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়েছিল। কোন কঠিন পদার্থের সহিত ধাক্কা লাগায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মুখে হাতে জল দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

গাড়ী তখনো খাদে পড়ে কাৎ হয়ে আছে ; বলদ দুটো প্রাণপণ শক্তিতে যোৎ ছেঁড়ার চেষ্টা চালিয়েছে। অধিকতর বিপদের সম্ভাবনায় থেকে থেকে কান খাড়া করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। ইতিমধ্যে পলাতক মানুষগুলি ফিরে এসেছে। লোকেরা ফিরে আসতে গাড়োয়ানের কাছে এগিয়ে গেলাম। কি সর্বনাশ! রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে, ঠিক বলিদানের পরের ঘটনার মত। লোকটার একেবারে কোরবানি হয়ে গিয়েছে। গলা থেকে ঘাড় পর্যন্ত ক্ষতস্থান হাঁ হাঁ করছে। রক্তস্রোতের তখনো বিরাম নেই। জল ও ওষুধ সংগ্রহ করতে করতে লোকটা মারা গেল। জঙ্গলের পথ ছেড়ে আবার গ্রামের দিকেই ফিরলাম গাড়োয়ানের অন্তিম ব্যবস্থার জন্য। ভিন্ন গাঁয়ের মানুষ, নিজের গাড়ীতেই তার শবদেহ ফেরত পাঠালাম।

এই ঘটনার পর দুদিন কেটে গেছে জঙ্গলের রেসট্ হাউসে। স্বল্পপরিসর বারান্দায় ক্যানভাসের টুলে বসে আছি, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, চারধারে ঘন জঙ্গল, ছোট বড় ঝোপ দিয়ে সুরু।

বাঘের আক্রমণে বহুবার মানুষকে ঘায়েল হতে দেখেছি—দুই একজন মারাও পড়েছে। কিন্তু এইবারকার ঘটনা কেমনতর লাগছিল। দিনের বেলা অতগুলি লোকের মাঝে বাঘ লাফায় এবং ওড়া অবস্থায় মানুষকে কোরবানি করে যায়, কখনো দেখি নি। ঘটনাটি

স্বচক্ষে না দেখলে ভোজবাজী বা স্বপ্নের কথা মনে হোতো। বসে বসে বাঘের কথাই ভাবছিলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর অস্থায়ী রেসট্ হাউস—জঙ্গলী এলাকায় বাত্তিলের সংখ্যায় পড়লে কি অবস্থা দাঁড়ায়, তা যাঁরা নিজেরা ব্যবহার না করেছেন তাঁদের নিকট বর্ণনা দেওয়া বৃথা। সংক্ষেপে স্থানটি আশ্রয় অপেক্ষা বিপদসঙ্কুল বেশী, তবু ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হলে ফুটো ছাদ এবং ফাটা দেয়ালই যথেষ্ট।

বারান্দায় বসেছিলাম, ঝিমো হ্যারিকেন লণ্ঠনের পাশে লেজ কুঁকড়ে শুয়ে থেকে থেকে জঙ্গল এবং আমার দিকে তাকাচ্ছে। কেমন একটা আশ্রয়ের আবেদন—লেজটা একেবারে গুটান, অশুভ লক্ষণ। ঘরের পাশ থেকেই জঙ্গল সুরু, যে দিকে তাকান যায় সেই দিকেই আতঙ্কের সম্ভাবনা সজাগ হয়ে আছে। এখানে বাঘের যে আচরণ দেখেছি, তাতে বেপরোয়ার মত হঠাৎ যে-কোন ঝোপ থেকে মুখ বার করলে রাইফেল তুলে টিপ্ করবারও সময় পাব না। জঙ্গল ও বারান্দার মাঝে যে ব্যবধান তা দশ গজের বেশী নয়।

ভেবে দেখলাম ঘরের ভিতরই ঢোকা ভাল। ঘরের ভিতরেও কি বেশীক্ষণ থাকার যো আছে। চামচিকের উৎকট গন্ধে এমন ঝাঁজ যে কিছুক্ষণ পরেই দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়।

তবু উঠতে হোলো। ঘরের ভিতর একটিও জানালা নেই—সৌভাগ্যক্রমে চালার একটা কোণ ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল তা না হলে দরজা বন্ধ করলেই বাসস্থানটি অন্ধকূপে পরিণত হোত। দরজাও কি ছাই ছিল—এখানে এসে আমাদের তৈরি করে নিতে হয়েছে, বাঁশের টাটির সঙ্গে শুকনো ঘাস লাগিয়ে। কোন প্রকারে যৎসামান্য আড়ালের ব্যবস্থামাত্র।

একটি মাত্র লণ্ঠন, অপরটি দলের লোক গ্রামে নিয়ে গিয়েছে রান্নার ব্যবস্থার জন্য। গ্রাম রেসট্ হাউস থেকে এক ফারলংও হবে না, ডাক দিলে সাড়া পাওয়া যায়।

ঘরের ভিতর আলোটা নিয়ে ঢুকতে যাবার সময় ঝিমোর ব্যবহার বেশ খটকা লাগিয়ে দিল। হঠাৎ সামনের ঝোপটার দিকে রোখা-ভাবেই ফিরে দাঁড়িয়েছিল, বেশ বুঝলাম এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, পরক্ষণে লেজ গুটিয়ে আমার পিছু নিল। ভিতরে এসে টাটির দরজা পাশের মোটা থাম্বার সঙ্গে ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলাম।

পাতা ক্যাম্পখাটে বসতেই ঝিমো গা ঘেঁসে দাঁড়াল। বন্ধু আমার এককালে দুর্দ্দান্ত ছিল। লেপার্ডের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের পর এমন ভাবেই ঝিমিয়ে গিয়েছে যে, ঘা সেরে গেলেও

ঘটনার স্মৃতি আজও ভুলতে পারে নি। তবু ওকে সঙ্গে রাখি বিপদের সম্ভাবনা সন্নিকট জানলে, উপযুক্ত সময়ে সাবধান করে দেয়।

আলোটা কাছে নিয়ে, অসমাপ্ত প্রবন্ধের পাতাগুলো গোড়া থেকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। শিকারে না গেলে লেখা বা পড়াই আমার বনবাসের প্রধান সাথী। যুক্তি ও মীমাংসার আত্মপ্রশ্নে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল বোধ হয়। বাস্তবের ডাকে ঘড়ির দিকে তাকালাম, রাত হয়ে গিয়েছে—ক্ষুধার তাড়না প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধ পাঠ বন্ধ করে লোকগুলো এখনও আহার নিয়ে এলো না কেন, ভাবতে লেগে গেলাম। জঙ্গলীরা আশ্বাস দিয়ে গেছে—আলো সঙ্গে থাকলে এবং দলে ভারী হোলে যে-কোন সময় তারা জঙ্গলের রাস্তা দেখিয়ে দেবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষার দৃষ্টান্ত ক্রমান্বয়ে আমাকে রাগিয়ে তুলছিল—অদমনীয় ক্ষুধা মারমুখি হয়ে উঠেছে। ভিতরের জ্বালা বাইরে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছি—একবার ওরা এলে হয়। সময় কেটে যেতে লাগল, কেউ এল না—রেগে এক গ্লাস জলই খেয়ে ফেললাম। এই সময় গ্রামে হৈ হৈ চিৎকার উঠল, তার সঙ্গে কুকুরের আর্ত্তনাদ, অনুমান করলাম, হয়ত লেপার্ড কুকুর নিতে এসেছিল। ঠিক ব্যাপারটা কি চিৎকার থেকে বোঝবার চেষ্টা করছি, কয়েক মিনিট কেটে গেছে, এমনি সময় ঝিমো বন্ধ দরজার দিকে তেড়ে গিয়ে ডেকে উঠল। কান খাড়া ও নাসারন্ধ্র বিস্তারিত করে গন্ধ শোঁকা এবং তার সঙ্গে ঐ ডাকের মানে আমি বুঝি। কালবিলম্ব না কোরে খাট থেকে নামলাম, দোনলা বন্দুকে এল্ জি টোটা পুরে, টাটি সংলগ্ন শুকনো ঘাস সন্তর্পণে সরাতে, টর্চ লাগান বন্দুকের নল বাইরে বার করতে অসুবিধা হোলো না। বন্দুকে লাগান টরচের ব্যাটারির শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল—তাই ভিন্ন টর্চ ব্যবহার করতে হোলো, একটু অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলাম, এক হাতে টর্চ অপর হাতে বন্দুক। তবে বন্দুক টাটির রেস্ট (rest)এর উপর ছিল, গুলি চালাবার কোন অসুবিধা হোতো না।

বন্দুকের বাঁট বগলদাবায় নিয়ে বাঁ হাতের টর্চের সুইচ টিপলাম, সামনে আলো পড়তেই দুটো জ্বলন্ত আগুনের গোলা বারান্দার কিনারা থেকে দরজার দিকে যেন উড়ে এল, তার সঙ্গে যে গর্জ্জন শুনেছিলাম তা লিখে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই। পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। দরজার ঝাঁকুনিতে টর্চ হাত থেকে পড়ে গেছে—বন্দুক তখনো ধরে আছি, ট্রিগার টেপবার সময় পাই নি। দৃষ্টি সামনে রেখেই বন্দুক-সংলগ্ন আলো জ্বাললাম। ঝাপ্সা আলোয় কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। টাটির দরজা দোফলা হয়ে গিয়েছে, নীচু হয়ে বড় টর্চ তুলে নেবারও সাহস নেই—বন্দুকের আলোই চারধারে ঘোরাতে লাগলাম। আলো ঝাপ্সা হোলো—চোখের উপর পড়লে প্রতিচ্ছটায় নিশানা করার অসুবিধা হবে না। আলো পড়লে বাঘের চোখ জ্বলে।

কিছু পাওয়া গেল না বলে নিশ্চিন্ত হবারও উপায় নেই—বুকের ভিতর দারুণ আলোড়ন চলেছে। মাটিতে জীবন্ত বাঘের সহিত ঘনিষ্ঠ সহবাস, তার উপর আক্রমণের পথ বাধাহীন। সময় কি ভাবে কাটছিল বলা শক্ত। একটি থাবার আঁচড়ে দরজার বাধা যে ভাবে তিরোহিত হয়েছে তা যদি নখী জানতো তাহলে এতক্ষণ আমার মাথাটা বাঘের মুখেই থেকে যেত। শিকারে এইরূপ আবেন্টনীর ভিতর কখনো পড়ি নি—থেকে থেকে টরচের সুইচ টিপে চলেছি। আক্রমণ-কারীকে ভয় দেখানোর ঐ এক অবলম্বন। অকস্মাৎ মাথার উপরে দমকা হাওয়ার অনুভূতিতে চালার খোলা জায়গাটার দিকে দৃষ্টি পড়ল। উন্মুক্ত স্থানটি মাটি থেকে চার-পাঁচ হাতের উপর হবে না—যতটা জায়গা খালি হয়ে গিয়েছে তার পরিধিও কম নয়। মাটিতে হোলে অক্লেশে দুটো মোষ পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে।

আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বাঘ যদি ঐ পথ দিয়ে ঘরের ভিতর লাফিয়ে আসে? অভিজ্ঞতা থেকে জানি আতঙ্কের কোন ভিত্তি ছিল না, কারণ সাবধানী বাঘ, বিপদের আশঙ্কা থাকলে ঘরের ভিতর বিপথ দিয়ে কখনো ঢোকে না, কিন্তু জন্তুটি মানুষের গা-ঘেঁসা জীব—একটু আগেই তো বারান্দায় বসেছিল—ওর দ্বারা কি অসম্ভব বা সম্ভব অনুমান করা শক্ত।

সুতরাং দু' দিকেই দৃষ্টি রাখা দরকার বোধ করলাম। সোজা পথ অপেক্ষা বিপথের বিপদই আমাকে বেশী আশঙ্কান্বিত করে তুলেছিল। সামনে দিয়ে এলে দরজা ভাঙ্গতে একটু সময় নেবে, শব্দ হবে, তাছাড়া প্রস্তুত অবস্থায় বন্দুকের নলের সহিত সংস্পর্শে না এসে উপায় নেই। উপর দিয়ে এলে শূন্যেই গুলি চালান দরকার, অন্যথায় মৃত্যু অনিবার্য। টাটির বাইরে বন্দুক বাগিয়ে বসে রইলাম।

চালার বাইরে আকাশ গাঢ় মেঘে ভরে গিয়েছে—টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সব অবস্থাতেই মানবের সমস্যা কাটে, আমারও কাটছিল। বিপদ প্রতিনিয়ত মনের দরজায় ঠোকা দিলে আশঙ্কা অনেকটা গা-সওয়া হয়ে যায়, বাঘের আক্রমণ সম্বন্ধে আমিও কতকটা বেপরোয়ার মত হয়ে আসছিলাম, একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম বোধ হয় কিংবা বসে বসে তন্দ্রার ঘোর এসেছিল বলতে পারি না—এই অবস্থায় দূরে মোটর বাস চলার শব্দ শুনলাম, গা ছম ছম কোরে উঠল, এই গভীর জঙ্গলে কুড়ি মাইলের ভিতরেও তো মোটর চলার উপযুক্ত রাস্তা নেই। ভোঁ ভোঁ আওয়াজ নিকটে চলে আসছে, ভয় কাটিয়ে উঠবার জন্য ভাবলাম হয়ত দূরে বিমান-পথের যাত্রী চলেছে, না এ তো এরোপ্লেনের আওয়াজ নয়, মোটর বাসই হু-হু করে এগিয়ে আসছে। গতি ক্রমান্বয়ে দ্রুততর হয়ে উঠছে—দিশাহারা হয়ে যাচ্ছিলাম, শব্দের কারণ ঠিক করা শক্তির বাইরে চলে গিয়েছে। বেশীক্ষণ সময় কাটেনি, শব্দ আমাকে চার ধারে ঘিরে ফেলেছে, ঘরের

বাইরে চারপাশে ঘুরছে, থেকে থেকে চালার খোলা জায়গায় আওয়াজ বেড়ে উঠছে। কান পেতে ছিলাম, ভৌতিক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল—আওয়াজ জঙ্গলী মশার ডাক। লক্ষ লক্ষ বিষাক্ত কীটের বাহিনী আমাকে ঘিরেছে। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় পড়া ছবি ও গল্পের কাহিনী। মৃত্যু অতি নিকটে এসে সশব্দে ডাক দিয়ে চলেছে। রাজদণ্ডে ফাঁসির হুকুমের পর মৃত্যুর অপেক্ষায় দণ্ডিতের মন বোধ হয় আমার মতই হয়ে থাকে। পলে পলে মৃত্যু এগিয়ে আসতে থাকে, হয়ত মানুষ তখন বাঁচা ও মরা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে যায়। আমি কতকটা নির্লিপ্ততার আশ্রয় পেয়েছিলাম, হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি—চমক ভাঙ্গল, পিছনে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলাম, গাছে গাছে ঠোকাঠুকি ও পাতার ঘর্ষণ দূর থেকে নিকটে এসে পড়েছে—মশার বাহিনীর ভয়াল গুঞ্জন আর শুনতে পাচ্ছি না। অল্পক্ষণের ভিতরই ঝড় ধ্বংসমুখী হয়ে উঠল। স্পষ্ট দেখছি খোড়ো চালের উত্থান-পতন। একবার সমস্ত ছাউনিটাই উড়ে যাবার মত হয়েছিল। চালের উত্থান-পতনের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের ন্যায় উপর থেকে বৃশ্চিক-পতন সুরু হোলো। আমার চারধারে ধাবমান বিছে, বেশীর ভাগই বিরাটকায় কালো লোমশ কাঁকড়া বিছের জাত। তখন মশা ও বাঘের কথা ভুলেছি, অগুন্তি বিছের জ্বালাময় কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি, একটি মাথার উপর এসে পড়ল। কালক্ষেপ না কোরে ক্যাম্পখাটের উপর রাখা সোলা-হ্যাট দিয়ে মাথা ঢাকলাম। হিতে বিপরীত ঘটল—হ্যাটের ভিতরেই অল্পবিস্তর দাঁড়াযুক্ত কীটের চলা অনুভব করলাম। টুপি খুলে দেখি বিছেই বটে তবে কাঁকড়া নয়। মাটিতে টুপি ঠুকে সেটার কবল থেকে মুক্তি পেতেই টাটি-সংলগ্ন শুকনো ঘাস সংগ্রহ করে আগুন লাগিয়ে দিলাম, তারপর জ্বলন্ত ঝাঁটা—ঘর ঝাঁট দেবার মতই মেঝেতে আমার চারপাশে ঘোরাতে লাগলাম। ফল ভালই হোলো। ধাবমান বৃশ্চিকগুলি আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগ কমে গিয়েছে। বৃষ্টির ফোঁটা বাড়তে বাড়তে মুষলধারায় বর্ষণ সুরু হোলো। ছাটে জ্বলন্ত ঝাঁটা নিভে গেছে। দেখতে দেখতে ঘরের ভিতর গোড়ালি পর্য্যন্ত জল জমা হয়ে গেল, এ অবস্থায় উবুড় হয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? হ্যারিকেন লণ্ঠন তুলে কাঠের উপর দেখে নিলাম সেখানে কোন বিছে নেই। উপরে পড়লেও হয়ত নেমে গিয়েছে।

নেমে গেলেও উঠে আসতে কতক্ষণ—নীচে সব জল, বিরক্ত বোধ করলেই গতি ঊর্দ্ধগামী করে দিতে পারে। ও কথা ভেবে লাভ নেই। উঠে পড়লাম খাটে, ঝিমোকেও ডেকে নিলাম।

রাত তখন দুটো বেজে গেছে। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে—বৃষ্টি অনেক কম। জলের

ঝাপ্টায় ভিজে চুবচুবে হয়ে গিয়েছি—কেবল মাথা আর বুক বাঁচাতে পেরেছিলাম। খাটে বাবু হয়ে বসতে আরাম একটু বেশী মাত্রায় উঠেছিল। তন্দ্রায় মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ছি, দৈহিক ও মানসিক অবসাদে জড়বৎ হয়ে গিয়েছি। এরই ভিতর ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘর পার হয়ে গেল। খাটের উপর বাঁধা হোল্ড-অল ছিল, টেনে নিয়ে তার উপর দেহভার হেলিয়ে দিলাম। মিনিট খানেকও কাটেনি, আবার গ্রামে চিৎকার শোনা গেল। একটু পরেই দেখি ঐ দিকে আগুন ধরানো হয়েছে। হৈ হৈ চিৎকার—তার সঙ্গে আগুন—কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না—বাঘ এবার কাজ হাঁসিল করেছে। লেপার্ডের অভ্যর্থনায় জঙ্গলীরা অত ধুম করে না। লোকেদের চিৎকার, কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি চলেছে, বন্দুক হাতে নিয়েই বসে আছি। কতক্ষণ ঐভাবে কেটেছিল মনে নেই। শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন রোদ উঠে পড়েছে, লোকেরা ঘরের সামনে জটলা সুরু কোরে দিয়েছে। বাইরে এসে দেখলাম সকলেই সাংঘাতিক ভাবে উত্তেজিত, বুঝলাম, অনেক কিছু বলবার আছে। প্রশ্নের দরকার হোলো না, স্থানীয় শিকারী রাতের ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে বলে চললো ঃ বাঘ মোষ মেরে তাড়া খেতে খেতে প্রথমবার নাকি রেসট্ হাউসের দিকে পালিয়েছিল, তারপর আবার ফিরে আসে এবং সমস্ত রাত মারা মোষ এবং গ্রামের চারধারে ঘোরে। মোষ মারা পড়ার পর মানুষগুলি এক মিনিটও ঘুমোবার অবসর পায় নি। শেষ পর্য্যন্ত ঘরের পিছনে এসে ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছিল, তখন আগুন জ্বালাতে পালায়। শিকারী একনলা ঠাসা বন্দুক দিয়ে চলন্ত বাঘের উপর গুলি চালাতে সাহস পায় নি। ওরা কুড়ি হাতের ভিতর বাঘ না পেলে গুলি চালায় না। চলন্ত বাঘের উপর নিশানা করা জঙ্গলী শিকারীদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ।

পরের ঘটনা দেখে প্রথমেই আমার নিজের সন্দেহভঞ্জন প্রয়োজন বোধ করলাম। বারান্দয় খোঁজা সুরু হোলো, দেখা গেল এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত রীতিমত পায়চারির চিহ্ন রেখে গিয়েছে। পরে ঝিমোর সন্দেহের জায়গায় গিয়ে উঠলাম। স্থানটি একটি নাতিউচ্চ টিলা, —আশেপাশে ঝোপ, দিনের আলো তলায় পৌঁছায় না। টর্চের আলোয় সামান্য চেষ্টাতেই দেখা গেল বাঘ এইখানেই বসে ছিল। সুধু বসে থাকে নি, একবার আমাদের উপর লাফ মারারও চেষ্টায় ছিল—সামনে এগিয়ে আসা এবং বসার ছাপ থেকেই তা বোঝা যায়। দুর্দ্দান্ত সাহস বলতে হবে। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মাল, পরিত্যক্ত রেসট্ হাউসই ছিল বাঘের আস্তানা। নিজের ঘর অপরিচিতের দখলে যাওয়া সহ্য করতে পারছিল না—অথবা কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যই এসে থাকবে। ঘরের ভিতর আলো জ্বললে তারই গা-লাগা বারান্দায় বাঘ বসে' ভিতরের খবর জানবার চেষ্টা করছে, এরকমটি কখনো শুনি নি। ফিরে এসে ঘরের

ভিতর পরীক্ষা সুরু করলাম। মেঝেতে কোন দাগ দেখার উপায় নেই, তখনো জল জমে রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর অস্থায়ী রেসট্ হাউসে নর্দ্দমার ব্যবস্থা বড় একটা থাকে না। ঘরের ভিতরের আলো কেবল চালার উন্মুক্ত স্থানের নীচে পাওয়া যায়, বিপরীত দিকের দেয়াল অন্ধকারে ডোবা। টর্চের আলো এদিক-ওদিক ঘোরাতে দরজার পাশে কাটের থাম্বার উপর নজর পড়ল, নিয়মিত নখ আঁচড়ানর দাগ, প্রায় সাত ফুটের কাছে রয়েছে। যা ভেবেছিলাম তাতে কিছুমাত্র সন্দেহের ফাঁক রইল না,---এইটিই বাঘের বাসস্থান। একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম---বাঘ দূরে পালাবে না। প্রথম কারণ সদ্যমারা মোষ, দ্বিতীয় গ্রামের গা ঘেঁসে থাকা স্বভাব, তৃতীয় আশ্রয়ের বিলাস। বাঁধা ঘরে বাস রীতিমত সৌখিনতার ব্যাপার। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আজই বাঘ মেরে দেবো। কথাটা বলেই জিজ্ঞাসা করলাম, মরা মোষটাকে আগলাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তো? শিকারী উত্তর দিলে, একেবারে জঙ্গলের কিনারায় নিয়ে গিয়েছে– ওখানে কেউ পাহারা দিতে রাজি হোলো না। শিকারীর উক্তি সুখবর হিসাবে গ্রহণ করতে পারলাম না।

গ্রামে ফিরেই বনবাসের সরঞ্জাম নির্দ্দিষ্ট ঘরে রেখে ঝিমোকে শিকলে বাঁধলাম। জখমি কুকুর সঙ্গে নেওয়া বৃথা, বেচারা আর এগিয়ে গিয়ে আমাকে আগুয়ান হবার সাহস দিতে পারে না।

মারা মোষের সন্ধানে বার হলাম। তাড়া খাওয়ার পর বাঘ যেখানে তার আহার গত রাত্রে ছেড়ে দিয়েছিল, সে দিকে দলের লোকরা এগুতে লাগল। আমি রাইফেল ভরে নিয়ে তাদের পিছু নিলাম। খানিকটা পথ এসে লোকগুলি থেমে গেল। একটা জটলা পাকিয়ে উঠেছিল---আমি ওদের ভিতর আসতে একজন দূরে একটি স্থান নির্দ্দেশ করে বললে, ঐখানে মোষটাকে ফেলে দিয়েছিল। যে স্থানটি দেখালো তা পঞ্চাশ-ষাট গজের ভিতর, চারধারে ঘন ঝোপ। আমি বললাম আর একটু এগিয়ে দেখাও, রাত্রে দেখেছ, ঠিক ঐখানটা নাও হতে পারে।

চলার পথে খাড়াই ঘাস এইখান থেকে আরম্ভ। লোকগুলি আর এগুতে চায় না। সত্য কথা লুকাব না, কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক আমার ভিতরেও উঁকি মারছিল। ঝাড়া চার-পাঁচ ফুট খাড়াই উলু ঘাস, তলায় দু' হাতের ভিতর বাঘ যদি আত্মগোপন করে থাকে তো দেখবার উপায় নেই। তবে মাঝে মাঝে খোলা জমি আছে। তাতে ভরসার কিছু নেই---বাঘ আক্রমণ করে পালাবার পথে তার চেহারাটা হয়ত ক্ষণিকের জন্য নজরে আসতে পারে। শিকারীর দিকে তাকালাম, সেও দেখি দোমনা। আবেদনীয় প্রভাবে আমারও ভিতরকার শিকারী কাবু হয়ে গিয়েছে অথচ অহঙ্কারকে নত করতে পারছি না। নিজের ব্যবহারে নিজের কাছেই

লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম। দ্বিধা ও সাহসের টানাপোড়েনে শেষ পর্য্যন্ত অহমিকাই জয়ী হয়ে উঠল।

একলাই সকলকে ফেলে এগুতে লাগলাম। ঠিক জানতাম প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদের কাছে এগিয়ে চলেছি। চলার সময় স্থধু সামনে দৃষ্টি রাখি নি, পাশের খাড়াই ঘাসের ডগা মাঝে মাঝে দেখে নিতাম নড়ছে কি না।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হলাম। মোষ সেখানে নেই। মোচড়ান ঘাসের উপর থাক-থাক রক্ত জমে গিয়েছে। সামনের জমাট ঝোপে বিরাট ফাঁক। মোষকে হেঁচড়ে টেনে নেবার দাগ ঐ ঝোপের ভিতর চলে গিয়েছে। মোষের অন্তর্ধান রাত্রে হয় নি, কারণ সারা রাতই আগুন নিয়ে লোকেদের গোলমাল চলেছিল। ঝোপের উন্মুক্ত স্থান আর পিছনের জঙ্গল ভীতিপ্রদ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনুমান করলাম, সকালে ঘণ্টাখানেকের ভিতরই বাঘ এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। নিজের বাড়ীতে স্থান না পেয়ে আহারের কাছেই ফিরে এসেছিল। লোকগুলি আমার কাছে আসবার যে স্থযোগ ও স্থবিধা পেয়েছিল, তা কাজে লাগিয়েছে। একটু আগেই যদি এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মাংস-খাদক এইখানেই আছে। অনুমানে আরও অনেক কিছু দেখলাম, হঠাৎ বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করে উঠল, ভেবে দেখলাম সাহসকে বোকামির পর্য্যায়ে ফেলার কোন মানে হয় না। একলা এইরকম গাঢ় জঙ্গলে, খুঁজতে বার হোলে যে কোন মুহূর্ত্তে বাঘের সঙ্গে কোলাকুলি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু গুলি চালান যায় না নিশানার জন্যে। একটু ফাঁকা জায়গার দরকার।

ফিরে এলাম দলের মাঝে। জঙ্গলীদের বললাম—কতকগুলি লোক আনতে পারলে এখুনি বাঘটাকে পাওয়া যায়। একান্তই যদি এখন পালায় তো সন্ধান নিতে ঠিক ফিরে আসবে —natural kill-এর আকর্ষণ বড় সাংঘাতিক। কেবল মারা-মোষটা খুঁজে বার করার অপেক্ষা। যে ঝোপের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়েছে সেখানে মানুষ ঢুকতে পারে না। মোষকে এগিয়ে দিয়ে জঙ্গল ভাঙ্গতে হবে। প্রস্তাব মাঠে মারা পড়ল। কোন জঙ্গলী পুরো দামের বিনিময়েও মোষ দিতে রাজি হোলো না।

ফাঁপরে পড়ে গেলাম। কোনরূপ সাবধানতা না নিয়ে নিশ্চিত বিপদকে সহায় করার কিছুতেই মন সায় দিচ্ছিল না। অপর দিকে অহমিকা আমাকে কষাঘাত করে চলেছে। পুরাতন শিকারীর নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশে আমাকে নত করে ফেলছিল। এমনিই আত্মপ্রশ্নের চাবুক খেয়ে জর্জ্জরিত হয়ে বাঁচার চেয়ে মৃত্যুকেই বরণীয় করে নিলাম। আজই বাঘ মেরে দেব—পুনরায় ঝোপের দিকে মোষের সন্ধানে চলতে লাগলাম। লোকদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে এসে পড়েছি, এমনি সময় কে একজন পিছন থেকে 'সের—সের—সের' বলে চীৎকার

কোরে উঠল। চারপাশে খাড়াই ঘাসের ডগা লক্ষ্য করে দেখলাম, অতি দূরে পূর্ব্ববর্ত্তী ঝোপের ডানদিকে উলুঘাস বিভক্ত হয়ে দুলছে, দোলা অগ্রগামী! নীচে কোন বড় জানোয়ার ধীরে সন্তর্পণে চলেছে। ঘাস যে ভাবে দুপাশে হেলে পড়েছে তাতে জানোয়ারের যে বৃহৎ আকার সে বিষয়ে সন্দেহ হবার কিছু নেই। তখনো আমার পিছনে লোকদের হট্টগোল চলেছে—হঠাৎ দেখলাম ঘাসের ডগা নড়া থেমে গিয়েছে। লক্ষণটি ভাল লাগল না। আক্রমণ অথবা পলায়ন দুটোর যে কোন একটা ঘটতে পারে। একটা সান্ত্বনা পেলাম, যেখানে মোষের চাপ রক্ত দেখেছিলাম তার নিকটেই একটি গাছ আছে। কতকটা বাবলা গাছের মত, তবে আকারে অনেক বড়। উপরে উঠতে পারলে শিকার করা চলে এবং শিকার হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাও যায়। মন দৃঢ় কোরে গাছের দিকে এগুতে লাগলাম। দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে যেখানে ঘাসের ডগা নড়া থেমে গিয়েছিল সেইদিকে নিক্ষেপ করতে লাগলাম।

আশ্রয়ের কাছে এসে দেখলাম, গাছ কাঁটায় ভরা। তবু উপরে ওঠা ছাড়া উপায় ছিল না। উপরে উঠবার সময় কাঁটা সামলাতে গিয়ে বিপদসঙ্কুল স্থানটির দিকে দৃষ্টি ঠিক রাখতে পারিনি। যাক, অনতিবিলম্বে বিপদের কেন্দ্র থেকে অনেকটা উপরে উঠে গিয়েছি। যেখানে বাঘের চলা থেমে গিয়েছিল সেই দিকে মুখ কোরে রাইফেল বাগিয়ে ডালের উপর বসতে যাচ্ছিলাম, বসা আর হোলো না—বাঘ নীচের ঝোপ থেকে মাথা বার করেছে। মুহূর্ত্তের ভিতর সমস্ত দেহটা বার হয়ে এল, তারপরই বিকট গর্জ্জন আর লাফ। অকস্মাৎ ভূমিকম্পে পাহাড় ধ্বসে যাবার মত ঘটনা, হাই velocity 500. বোর রাইফেল হাতে অভিজ্ঞ শিকারী জ্ঞান হারাতে বসেছিল। হুঙ্কার আমাকে রীতিমত নাড়া দিয়েছিল, টলায়মান সাহস নিয়ে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করলাম। নানা বাধা অগ্রাহ্য করে কোনপ্রকারে রাইফেলের নল ঘোরালাম। নল ঘুরল বটে কিন্তু উল্টো অবস্থায়। ম্যাগাজিন-চেম্বার উর্দ্ধমুখী হয়ে আছে। অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে লতার বেড়, ঘুরিয়ে সোজা করবার উপায় নেই। লতার বেড় থেকে নলকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছি এমনি সময় বাঘ লাফ মারল—পরক্ষণেই একটি থাবা আমি যে ডালে দাঁড়িয়েছিলাম তার নীচের ডালে এসে পড়ল। বাঘ শূন্যে ঝুলছে এবং প্রাণপণ শক্তিতে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। তখনো বন্দুকের নল বাঘের দিকে নিয়ে আসতে পারিনি, লতার বাঁধনে আটকে পড়েছিল। মরিয়া হয়ে টান মারলাম, বন্দুকের নল ফিরল বটে, কিন্তু ঝাঁকুনিতে আমার পা পিছলে নীচের ডালে এসে পড়ল। অন্য ডালের ঠেকা না পেলে মাটিতে এসে পড়তাম। যেখানে আমার ডান পা এসে পড়ল সেইখানে বাঘের মুখ। তখন কি ঘটছে না ঘটছে ঠিক বুঝে যে কাজ করছিলাম, তা বলতে পারি না। বাঁচার দারুণ আবেগ আমাকে যন্ত্রচালিতের মত করে ফেলেছিল। কেমন কোরে বন্দুকের নল বাঘের মুখের সামনে এনে ফেলেছি—মাথার দিকে আনবার আগেই নলের উপর কামড় পড়ল। কামড়েই সে উপরে উঠতে চায়, আমি বন্দুক

ঠেলেই বাধা দেবার চেষ্টা চালিয়েছি। ট্রিগার আঙুলের উপর রয়েছে অথচ টেপার কথা ভুলেছি, ঠেলাঠেলিতে আমার অজ্ঞাতেই ট্রিগার পড়ে গেল—বন্দুকের নল তখন বাঘের গলার ভিতর। এইটুকু মনে আছে বন্দুকের অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনেছিলাম। তার পরমুহূর্তে দুজনাই মাটিতে পড়ে গেলাম।

মহানন্দীর পরের ঘটনায়, বাঘের চামড়ার বালাপোষ, আমার হাসপাতাল বাস, অনেক কিছুই আছে। তা নিয়ে গল্প বাড়িয়ে লাভ নেই। শেষের কথায় এইটুকু বলতে পারি আমার শিকার ট্রফির (trophy) মধ্যে বাঘে কামড়ান বিকল রাইফেল একটি প্রধান প্রদর্শনীর স্থান দখল করে আছে।

বাঘে-মানুষে

শান্তিপুর গ্রামে দিনকতক ঘুরে আসার সখ ছিল। পিসেমশাই অনেক দিন থেকেই লেখা লেখি করছিলেন। সেবার পূজোয় সুযোগটা নেওয়া গেল। পিসেমশাইয়ের লম্বা ছুটি, রমেনকেও (আমার পিসতুতো ভাই) পাওয়া যাবে। সময়টা কাটবে ভাল। বড় শিকার না পাই ঝিলে মাছ ধরার আয়োজন মজুত ছিল।

পূজা উপলক্ষে পিসেমশাই সপরিবারে একবার গ্রামের বাস্তুভিটায় আসতেন। বুড়ো মা বেঁচে, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হ'ত। পিসেমশাইয়ের বাড়ীতেই পুজো। পূর্বপুরুষেরা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে নিয়মের পরিবর্ত্তন হবার উপায় নেই--গতানুগতিক আজও প্রাচীন নিয়ম চলে আসছে। আগেকার দিনের জাঁকজমক নেই, তবে উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যায়।

জঙ্গল-ঘেঁষা গ্রাম, স্টেশন থেকে পিসেমশাইয়ের বাড়ী বেশ খানিকটা দূরে। কম হলেও মাইল পাঁচেক হবে। জঙ্গল ভয়ঙ্কর কিছু নয়, তবে মাঝে মাঝে বড় বাঘও ঘন জঙ্গল থেকে ছুটকে এদিকে এসে পড়ে। সন্ধ্যার গা ঘেঁসে গাড়ী স্টেশনে এসে থামল, প্রায় তিন ঘণ্টা লেট, এঞ্জিনের কি কল বিগড়েছিল।

এদেশে বাহন বলতে কেবল পাল্কী কিম্বা গরুর গাড়ী। মানুষের কাঁধে চড়ার আপত্তি থাকায় পিসেমশাই স্টেশনে গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে সনাক্ত করার জন্য সঙ্গে এসেছিল নিতেন। প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার সেই দামী বন্দুকটা এনেছেন তো, আর সেই প্রকাণ্ড বিজলী আলো?" নিতেন বন্দুক বেজায় ভালবাসে। ম্যাগাজিন রাইফেল ঘাঁটতে গেলে সে যে কত রকম করে ঘুরিয়ে দেখে তা বলে শেষ করা যায় না। ছোট ছেলের নতুন পুতুল পাওয়ার মত। নিতেন গ্রামেই থাকে, ক্ষেতজমি দেখাশুনা করে। পুজো বা অন্য ক্রিয়াদি উপলক্ষ্যে পিসেমশাইয়ের বন্দুক নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করে, কতকটা বাজী ফোটানোর মত। দামী বন্দুক সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে আশ্বাসবাণী পেয়ে বেজায় খুশী হয়ে উঠল।

নিরিবিলি স্টেশন, এখানে আবার কুলীও পাওয়া যায় না। নিজেরাই টেনে হেঁচড়ে জিনিষ পত্র নামালাম।

মালের সংখ্যা আর লাগেজের ভাড়া কমাবার জন্য হোল্ড-অলকে তার নামের সার্থকতা দিতে হয়েছিল। জামা, কাপড়, দাড়ী-কামানোর সরঞ্জাম, মায় উপরি জুতো জোড়াও পুরেছিলাম হোল্ড-অলের ভিতরে। সুসভ্য শয্যাবরণ সস্তার চালাকি সহ্য করতে না পারায় বেড়ের চামড়া দুটো

বক্‌লসের সঙ্গে হাড়াআড়ি বাধিয়েছিল, এর দ্বন্দ্বকে কোন প্রকারে চরমে উঠতে দিই নি, কিন্তু তাড়াহুড়োয় বিছানা নামাবার সময় শেষ রক্ষা হ'ল না। সশব্দে সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল। একটা মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। পুনরায় গুছাতে গিয়ে নিতেন আর আমি হিমসিম খেয়ে যেতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে গিয়েছে, প্লাটফরম যাত্রীশূন্য, ল্যাম্প-পোষ্টে কেরোসিনের আলো জ্বালার আয়োজন চলেছে। সমস্ত প্ল্যাটফরমে মাত্র দুটি আলো জ্বলে—দুই প্রান্তে। হোল্ড-অল বাঁধার সঙ্গে নিতেনের কাছে শিকারের খবর নিচ্ছিলাম। সে বললে, "অনেক বছর হয়ে গেল, এদিকে বড় বাঘ আসে না। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা পাকা হবার পর থেকে পাটের আড়ৎদাররা সদর রাস্তার উপর গদী বসিয়েছে, লোকেরা এখন রাস্তাতেই পান বিড়ি কেনে—গদীর কাছাকাছিই দুই তিনটি পানের দোকান।" কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন-মাষ্টার চীৎকার করে উঠলেন, —'বাঘ বাঘ, ওকে নিলে'। ফিরে দেখি ওদিক্‌কার ল্যাম্পপোষ্ট থেকে মইটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে, যে লোকটি আলো পরিষ্কার করছিল তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ষ্টেশন মাষ্টার তখনও চীৎকার করছেন, 'ঐ নিয়ে যাচ্ছে—ডোবার দিকে'। হোল্ড-অল ছেড়ে আমরা ছুটে এলাম তাঁর কাছে। প্ল্যাটফরমের চৌকিদারও তারস্বরে চীৎকার সুরু করে দিয়েছে। সকলে মিলে যখন ডোবার দিকে পৌঁছেছি তখন বাঘ মানুষটাকে ফেলে পালিয়েছে। লোকটা তখনও মরে নি। সকলে পাঁজা-কোলা করে ষ্টেশনে তুলে নিয়ে এলাম।

এ মুল্লুকে আবার ডাক্তার পাওয়া যায় না। এক জন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেন, তাঁর বাড়ীও অনেক দূরে। আমার কাছে পোটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ছিল। ও মুড়োয় গিয়ে তাড়াতাড়ি এটাচি থেকে বার করে নিয়ে এলাম,—কিন্তু ওষুধ কাজে লাগানো গেল না, আনতে আনতেই লোকটির প্রাণ বেরিয়ে গেল। ঘাড় একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল—তার উপর রক্তক্ষরণ হয়েছিল যথেষ্ট।

আমাদের পূজোবাড়ীতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। গাড়োয়ান ইতিমধ্যে গাড়ীটাকে প্ল্যাটফরমে তুলে বলদ দুটোকে জোত থেকে খুলতে আরম্ভ করেছে। সে কিছুতেই সন্ধ্যা ঘাড়ে করে ও রাস্তায় যেতে রাজী নয়। নিতেনও তার সঙ্গে যোগ দিলে।

মরা মানুষটিকে ষ্টেশন-ঘরের বেঞ্চিতে শুইয়ে রাখতে রাখতে দিনের আলো শেষ হয়ে গেল। হাতের নাগালে রেল কোম্পানীর একটি মাত্র লণ্ঠন। ষ্টেশন-মাষ্টার হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না। ষ্টেশন-ঘরেও রাত্রিবাসের হুকুম নেই। প্রবেশ-পথেই লেখা দেখেছি 'নো এড্‌মিশন'। মাষ্টারমশাই ঘরে তালা লাগাতে ব্যস্ত। কি আর করা যায়, তাঁরই গৃহে আশ্রয় ভিক্ষা চাইতে হ'ল। নিতেন দেখি বন্দুক দেখার সখ একেবারে চাপা দিয়ে দিয়েছে। একলা শুধু হাতে প্ল্যাটফরমের শেষপ্রান্তে যাওয়ার সাহস ছিল না, ঠিক জানতাম বাঘ নিকটেই কোথাও ওৎ পেতে আছে। গত্যন্তর না দেখে আশ্রয়ভিক্ষা করতে হ'ল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসাবাড়ী রেল-কোম্পানীর দেওয়া. ষ্টেশনের ঠিক পিছনে। দেড়খানি ঘর, সামনেই তদুপযুক্ত এক ফালি বারান্দা। প্রবেশ-পথ বাদ দিয়ে দু-পাশেই টাটি দিয়ে ঘেরা। এক দিকে হেঁসেলের ব্যবস্থা, অপর দিকটা বোধ হয় স্নানের জন্য রাখা হয়েছে। সংক্ষেপে বাসস্থানটি একটি বৃহৎ হোল্ড-অল। যেদিকে স্নানের ব্যবস্থা সে দিকটা আড়াল, সান্ত্বনার বস্তু হয়ে আছে—কারণ টাটির অধিকাংশ স্থলই বয়েসের প্রাচীনত্বে ধ্বসে গিয়েছে। স্বাভাবিক জীর্ণতাকে ঢাকা দেবার কোন প্রয়োজন হয় নি।

মাস্টারমশায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমাদের প্রত্যেকের জাত খুঁজে নিয়ে বারান্দায় থাকার স্থান নির্দ্দেশ করে দিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে বেচারা গাড়োয়ানকে আমাদের কাছ থেকে পৃথক হতে হ'ল। অস্পৃশ্য স্থান পেল, বিপরীত দিকের কোণায় যেখানে আড়ালের নামে সব-কিছুই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। গাড়োয়ান বলদ দুটোকে বারান্দার সামনে বেঁধে বিনা আপত্তিতে কোণায় আশ্রয় নিলে।

অতিথি-সৎকারের কর্ত্তব্য শেষ করে মাস্টারমশায় দরজা বন্ধ করে দিলেন, তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া লণ্ঠনটাও ভিতরে ঢুক্‌ল। আমাদের জন্যে রইল রেল-কোম্পানীর একরোখা লণ্ঠন। ডাইনে বাঁয়ে কিছু দেখা যায় না। পাশ থেকে গাঁটকাটা পকেট মেরে দিলেও তাকে হলফ খেয়ে সনাক্ত করার উপায় নেই। দু'পাশে অন্ধকারের ঠেকায় কোম্পানীর আলো সোজা চলে।

গাড়ী থেকে নামতেই আকাশ মেঘলা দেখেছিলাম। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি সুরু হ'ল, তার সঙ্গে থেকে থেকে দমকা হাওয়া। আমাদের সামনেটা একেবারে খোলা। বৃষ্টির ছাটে লণ্ঠনের কাঁচ ফাটার সম্ভাবনা থাকায় আলোটা দেয়ালমুখো করে ভিতর দিকে সরিয়ে রাখলাম। হেঁসেলের সরঞ্জাম সামলে নেবার দরুন আমরা তিন জনে যেটুকু স্থান পেয়েছিলাম তাতে স্বল্প পরিধির ভিতর বাবু হয়ে বসারও জায়গা ছিল না। টাটির বেড়ায় নিজেদের ছায়াই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছিল।

ভাবছিলাম, এই রকম খোলাখুলির আড়াল নরভুক্ বাঘ সম্বন্ধে কতটা নিরাপদ, বিশেষ করে যেখানে তার মুখ থেকে আহার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বন্দুকটা কাছে না থাকায় বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে বজ্রপাতের সঙ্কেত। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা, আড়াল অগ্রাহ্য করে আমারই উপর আক্রোশ চালাতে লাগল বেশী, কারণ আমিই ছিলাম সকলের আগে।

বৃষ্টির বিরাম নেই, সময় কেটে যাচ্ছে, রাত এগিয়ে চলেছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় অবসাদগ্রস্ত দেহ ঘুমের আশ্রয় খুঁজতে লাগল। সবে একটু তন্দ্রা এসেছে এমনি সময় বলদ দুটো হুড়োমুড়ি লাগিয়ে দিলে, পরক্ষণেই মনে হ'ল গাড়োয়ানের দিক থেকে গোঙানীর মত আওয়াজ আসছে।

হাঁটুর উপর মুখ গুঁজড়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, মুখ তুলতে ঘুম চোখে ঝাপসা আলোয় দেখি বারান্দা থেকে কি একটা বড়-সড় জানোয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখ খুলে তাকালাম, কি সর্ব্বনাশ ও যে বাঘ, পিছন দিকটা তখনও আলোর মধ্যে রয়েছে। ভয়ে প্রায় বেহুঁসের মত হয়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকারে তার চেহারা মিলিয়ে যেতে হুঁস ফিরে এল। এতক্ষণে চিৎকার করার অবসর পেলাম, স্টেশনের চৌকিদার চাঙ্গা হয়ে বসল, নিতেন বসে বসেই মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। তাড়াতাড়ি আলো ফেললাম গাড়োয়ানের দিকে, লোকটা সেখানে নেই। বারান্দার বাইরে দেখবার চেষ্টা করলাম, বলদ দুটোর উপর আলো আটকা পড়ে গেল। উঠে দাঁড়ালাম, বলদের উপর দিয়ে দেখবার জন্যে। দৃষ্টি বেশী দূর চলে না, বৃষ্টির ঝাপটায় সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। মাস্টারকে জাগাবার জন্য দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম, বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করলাম, চৌকিদারও দুই-একবার চেষ্টা করলে, কিন্তু দ্বার আর উন্মুক্ত হ'ল না। পুনরায় গুড়ি-সুড়ি মেরে বসতে হ'ল। আলোটা নিভিয়ে দিলাম। আলো না থাকলে বাঘ ঘরে চড়াও হ'ত না। ভাঙ্গা টাটির ফাঁক দিয়ে একলা মানুষকে দেখবার সুবিধা আমরাই করে দিয়েছিলাম। বাঘের দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ নয় যে, বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আর অন্ধকার ডিঙ্গিয়ে আড়ালের পিছনে মানুষ খুঁজে বার করে। সামনে তাজা বলদ ছেড়ে মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মানেই বিশেষ আহারে অনেক দিন থেকে অভ্যস্ত।...সমস্ত রাত প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলাম।

ভোরের দিকে ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। মাস্টার দরজার পাল্লা এক দিক সামান্য ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে কিছু ঘটেছিল নাকি?

সহজভাবেই উত্তর দিলাম—'গাড়োয়ানকে বাঘে নিয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। সকাল হতে শুনলাম ঘরের ভিতর থেকেই ওপাশে কাকে ডাকাডাকি করছেন, প্রত্যুত্তরে কে এক জন বাইরে থেকে জানাল, "আসছি।" দরজার কড়া নাড়তে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে ধীরে পূর্ব্বপ্রথায় পাল্লা খুলতে লাগলেন। আমাদেরকেই তাঁর সন্দেহ। বাঘে মানুষ ধরার সঙ্গে আমাদের যেন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। চৌকিদার আর কড়ানাড়া মানুষটিকে কাছে পেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

গাড়োয়ানের কি হ'ল খোঁজ নেবার জন্য মন্ত্রণা-সভা বসে গেল। ওদিকে মরা মানুষটা ঘরের ভিতর তালাচাবি দিয়ে বন্ধ, লাইন ক্লিয়ারের ডাক নিশ্চয় সুরু হয়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে এ লাইনেও গুডস্ ট্রেন চলে। সব কয়টির যোগাযোগে মাষ্টার মশায়কে ঘর থেকে বেরুতে হ'ল। দল বেঁধে ষ্টেশনের দিকে এলাম।

মাস্টার তালা খুলে ঘরে ঢুকতে, আমি নিতেনকে নিয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে গেলাম। হোল্ড-অল ভিজে দশ গুণ ওজন বেড়ে গিয়েছে। দুজনে সেটা তুলতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে বন্দুকের বাক্স নিয়েই ষ্টেশনে ফিরলাম। কপাল ভাল, বাক্সের ভিতর এক ফোঁটাও জল ঢোকে

নি। রাইফেল আর টোটা বার করে নিয়ে ষ্টেশন-ঘরেই বাক্সটা রেখেছিলাম। বন্দুক দেখে অকস্মাৎ মাষ্টারমশায় সাহসী হয়ে উঠলেন—চৌকিদারকে হুকুম দিলেন, 'আদমি বোলাও'—সে একলা বার হতে চায় না। আমরা ছাড়া ষ্টেশনে তখন কোন লোকও নেই। মানুষ খুঁজতে হলে ডোমপাড়ায় যেতে হয়। ডোমপাড়া ডোবার কাছেই—ঠিক ঐখান থেকেই তো পানের বরোজ, সুরু—তার উপর চার ধারে ঝোপঝাপ। বাঘ আবার মানুষটাকে নিয়ে ঐদিকেই যাচ্ছিল। আমরা সকলেই আতান্তরে পড়ে গেলাম। হেঁচড়ে নিয়ে যাবার দাগ দেখেও একলা বেরিয়ে পড়ার উপায় নেই। চারধারেই জায়গায় জায়গায় হাঁটুর উপর জল জমে গিয়েছে। শিকার ধরার পর বাঘকে সন্দিগ্ধ হলে, মাইলখানেক পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড গরুকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। মানুষের ওজন গরুর তুলনায় কিছুই নয়। ইতিমধ্যে কড়া-নাড়া মানুষটি সাহস সংগ্রহ করে ফেলেছিল—জানালে বন্দুক নিয়ে যদি সঙ্গে চলি তা হলে ডোমপাড়ায় যেতে তার আপত্তি নেই। নিতেন এই সময় আমার মাল আগলানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, "আমি এইখানেই থাকি, মালগুলো আলগা পড়ে রয়েছে।" খোলা বিছানা প্ল্যাটফরমের সেই মুড়োতে পড়ে, লোকটা ঘরের ভিতর বসেই মাল সামলাতে লাগল।

পথে বার হবার আগেই রাইফেল প্রস্তুত করে নিলাম। আমার ধারণা জন্মেছিল, কাছা-কাছি লুকাবার জায়গা একমাত্র পানের বরোজ—একে ঢাকা, তায় আরাম, বাঘ ওরই ভিতর কোথাও ঢুকে আছে। নিঃসন্দেহ হবার জন্য ষ্টেশন-মাষ্টারের ডেরা থেকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার দাগ খুঁজতে লাগলাম। উঁচু কাদা-মাটিতে স্পষ্ট আঁক পড়েছে, কিন্তু দু'পা এগুলেই জল। হাল ছেড়ে দেবার যোগাড় হয়ে আসছিল। এমন সময় ডোমপাড়া থেকে অনেক লোকের চীৎকার উঠল, তার পরই চুপচাপ। অল্পক্ষণ পরেই দেখি ঐদিক থেকে কতকগুলি মানুষ ষ্টেশনের দিকে ছুটে আসছে। কাছে আসতেই দেখলাম সকলেই সাংঘাতিক ভাবে আতঙ্কিত। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "বড় বাঘ, বরোজের পাশেই মানুষ খাচ্ছে।" লোকটা তখনও হাঁপাচ্ছে; জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখনই কাউকে ধরল নাকি'? সে বললে, 'জানি না, যে দেখেছিল সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমরা ইষ্টিশন মাষ্টারবাবুকে বলতে এসেছি—জাড়ুল গ্রামে খবর দেবার জন্যে। থানার দারোগাবাবুকে ডাকলে আমরা বাঁচি—ঘরে ঢুকতে পারছি না, সব খিল পড়ে গিয়েছে'। এতক্ষণে আমার হাতে বন্দুক দেখে বললে, 'বাবু ঐটে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এস, আমরা ঘরে ঢুকে যাই।' লোকটা এমনই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, খুঁটিনাটি কথার উত্তর পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। বাকি লোকগুলিরও অবস্থা একই। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেই সকলে মিলে একসঙ্গে উত্তর দেয়। যতটা বুঝলাম তাতে মনে হ'ল কেউই বাঘ দেখে নি।

শিকারে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল জনতা সঙ্গে নিয়ে কোন কাজ করা চলে না। ওদের বললাম,

তোমাদের ভিতর কেবল একজন লোকের দরকার, আমাকে সেই মানুষটার কাছে নিয়ে চল যে তোমাদের খবর দিয়েছিল। প্রথমটা সকলেই ইতস্ততঃ করতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত এক জন সাহসী ছোকরাকে পাওয়া গেল।

আমরা দু'জনই চললাম ডোমপাড়ায়। বাঘের সঙ্গে বহু দিন থেকে বোঝাপড়ায় অভ্যস্ত হলেও যতই বরোজের কাছে আসতে লাগলাম ততই সাহস মুখ ঘুরাতে আরম্ভ করল। নরভুকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে, তবে তার আহারের সময় কখনও ঘনিষ্ঠতা করতে যাই নি। তা ছাড়া দিনের বেলা যে বাঘ ঘরে চড়াও হয়ে লোক দেখিয়ে মানুষ খায় তার চরিত্রে অনেক গলদ থাকা স্বাভাবিক।

যে লোকটা খবর দিয়েছিল তাকে বহু কষ্টে ঘর থেকে বার করা গেল। একটা পিলে রোগী মানুষ। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নি। বাইরে আমার সঙ্গের ছোকরা, মাঝখানে খবরি, ভিতরে খবরির স্ত্রী। ছোকরা যতই খবরির হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করে, ততই তার জোয়ান স্ত্রী ভিতরের দিকে টেনে ধরে। বেশ খানিকক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর খবরি স্ত্রীর কবল ফস্‌কে বাইরে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে চোর ধরার মত, ছোকরা খবরিকে জাপটে ধরল—বেচারা নাজেহাল হয়েই বললে, চলুন বাবু, দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমরা কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় সেই জোয়ান স্ত্রীলোকটি খড়-কাটা বঁটি আর কাস্তে নিয়ে হাজির। আমি বাস্তবিকই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, খুনোখুনি হতে চলল নাকি? পরে বুঝলাম মেয়েটির উদ্দেশ্য খারাপ নয়। স্বামীর হাতে বঁটি দিয়ে নিজে কাস্তে হাতে পিছনে আসতে লাগল।

বেশীদূর হাঁটতে হ'ল না, খবরি বরোজের ভাঙা যায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঐখানেই তো বসে খাচ্ছিল।" জায়গাটা আমাদের কাছ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাত হবে। বরোজের পিছনে বাঘ কোথায় লুকিয়ে আছে জানবার উপায় নেই। তাড়া খেয়ে মানুষটিকে যে ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছে তার সন্দেহ ছিল না। ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম, এখন কি করা যায়। এই রকম সাজানো শিকার শিকারীর ভাগ্যে কমই জোটে। মন হাল ছেড়ে দিতে চাচ্ছিল না। বুদ্ধি জুটে গেল, সাহসী ছোকরাটিকে বললাম—দশ-বার জন লোক জোগাড় করতে পারলে এখুনি বাঘটাকে মেরে ফেলা যায়। মোটা টাকা বকশিশের লোভ দেখালাম—প্রায় বৎসরখানেকের খোরাক। শিকারের সঙ্গে, হিসাবের সঙ্গে কখনও সদ্ভাব ঘটাতে পারি নি এবং মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গেলে কখনও প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ হতে দিই নি। এ কথাটা সকলে না জানুক আমার কাছে অজানা ছিল না। দামী বন্দুকধরা বাবুর কাছ থেকে লোভনীয় পুরস্কার আশাপ্রদ মনে করেই লোকটা বিপদকে অগ্রাহ্য করে বসল, বললে—'দেখছি, কিন্তু আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।' রাজী হলাম।

ডোমপাড়ার বস্তিতে ঢুকে ছোকরা প্রায় জুলুম করেই প্রত্যেক বাড়ী থেকে লোক সংগ্রহ করে ফেললে। সকলেই হাতিয়ার নিয়ে উপস্থিত। আর এক বিপদে পড়ে গেলাম। লোকগুলোকে নিরস্ত্র করা যায় কেমন করে? বেশীর ভাগ লোককেই গাছে ওঠাতে হবে। চেষ্টা সুরু করলাম। বিশেষ তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছিলাম না। মেয়েটি বললে—'ওরা কি মরদ, চল বাবু আমি তোমার হুকুম মানব।' মেয়েটি কাস্তে ফেলে দিতে সকলেই রাজী হ'ল।

রেলের লাইনের দিকে চার পাঁচ জনকে পাঠালাম, ষ্টেশনের দিকে গেল কয়েকজন, বাকি যে কয়জন রইল, তাদের বললাম—তোরা কেনাস্তারা, টিন বা যা কিছু হোক যোগাড় করে শব্দ করতে করতে ষ্টেশনের দিক থেকে আমার কাছে চলে আয়। বাঘ ভিতরে থাকলে এই দিক দিয়ে বেরুবে, কারণ লাইনের দিকে গেলেই তাড়া খাবে। গাছে-ওঠা লোকগুলোর চিৎকারে, ষ্টেশনের দিকে যাবে না—মানুষের ভিড় দেখলেই পিছুবে, তা ছাড়া এই দিকটাই ফাঁকা।

বন্দোবস্ত ঠিক হতে আমিও বরোজের সামনে, গাছে উঠে পড়লাম। নিরাপদ হতেই—বাঘ তাড়ানো লোকগুলোর কথা মনে পড়ল—হিসাবে গলদ করেছি—বাঘ এদিকে না এসে যদি ক্ষেপে যায় এবং মানুষগুলোকে আক্রমণ করে? মাথাটা ঘুরে গেল, লজ্জায় নিজের কাছেই নিজে নত হয়ে গেলাম, ভাবলাম কাজ নাই শিকারে—নেমে পড়ি, লোকগুলোকে বাঁচাই, তখন তারা ষ্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে—নামা আর সম্ভব হ'ল না।

গেরস্ত চালে 'বিটিং' সুরু হ'ল—কেনেস্তারা বাজল, গাছেও লোক উঠল—কিন্তু বাঘের পাত্তা নেই। বাজনদারদের আমার কাছে আসতে নির্দেশ দিলাম, বললাম—'তোরা লাইনের ওপার থেকে আবার বাজাতে আরম্ভ কর্।' যেটুকু ঔদার্য্য একটু আগে এসেছিল—তা শিকার গা ঢাকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উবে গেল। উবে গেল কেন বলি—রোখ চেপে গিয়েছিল। ওরা ফিরে যেতে আবার গুছিয়ে বসলাম। যথাস্থানে লক্ষ্য রেখে বসে আছি—লোকগুলো বরোজের আড়ালে চলে গিয়েছে। হঠাৎ দূরে গাছের উপর থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল। আওয়াজ এসেছিল অনেক দূর থেকে—কি বলল বুঝতে পারলাম না। কেনেস্তারার শব্দের অপেক্ষায় রইলাম, কোন দিকেই কোন শব্দ নেই। ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট করে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় কেটে গেল। বুঝলাম লোকগুলো বকশিশের মায়া কাটিয়ে ফেলেছে। কতক্ষণ আর আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা যায়, ক্ষিদেও তখন জুলুম লাগিয়েছে। অনুমান করলাম, বাঘ কেনেস্তারার আওয়াজে কোন জায়গায় ঘুপটি মেরে বসে গিয়েছে, সন্ধ্যার আগে আর বার হচ্ছে না। গাছ থেকে নেমে পড়াই দরকার—যা হোক কিছু খেতে হয়। নামতে হলে বরোজের দিকে পিছন করেই না নেমে উপায় নেই—অন্যথায় নীচের ডালগুলো সুবিধামত পায়ের তলায় পাওয়া যায় না। কাছে লোক থাকলে

ও কথা ভাববারও প্রয়োজন হ'ত না। একলা থাকায় সন্দেহ 'কি জানি' ভাবটা মাথায় ঢুকিয়ে দিলে। আর খানিকক্ষণ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম, কোথাও কিছু নেই। নেমে এলাম নীচে। মাটি ছুঁতেই বরোজের দিকে ফিরলাম—যা দেখলাম তাতে তখনি বন্দুক কাঁধে তুলতে হ'ল, ভাঙ্গা জায়গাটা থেকে বাঘের একটি থাবা বেরিয়ে এসেছে—চলার গতি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, পা তখনো শূন্যে—দেহটা বরোজের আড়ালে। বাঘ নিঃসন্দেহ গোড়া থেকে আমাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিল। বরোজের বেড়ায় যে ফাঁক থাকে তা দিয়ে ভিতর থেকে বাইরের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে দৃষ্টি চলে না। বরোজ বাক্সের মত চার দিক দিয়ে ঢাকা। পা থেকে আন্দাজ করে বুক বা মাথায় গুলি চালাতে ভরসা পেলাম না—বিশেষ করে অত কাছ থেকে যদি অজায়গায় লাগে—তা হলে…।

রাইফেল প্রস্তুত করে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। খানিকটা সময় কেটে গেল, দেখলাম পা মাটিতে পড়েছে—কাঁধ পর্য্যন্ত এইবার দেখা যায়, মুখটা বরোজের আড়ালে—কাঁধ দেখে অনুমানের উপরই বুক ঠিক করে ফেললাম, বরোজের বেড়ায় গুলি চালালাম। হাই ভেলসিটি রাইফেল, নিশ্চিন্ত হলাম—সব বাধা সরিয়ে গুলি যথাস্থানে চলে যাবে। গুলি আশ্চর্য্য ভাবে ফল দিলে—বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ পড়ে গেল—ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই। শোয়া অবস্থায় দুটো পা-ই বেড়ার বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তবে দেহের সব অংশটাই আড়ালের ভিতরে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, ভয় ছিল অনেক সময় মরা বাঘও দাঁড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই জানোয়ার বুঝে ডবল করে মারার নিয়ম আছে। এটা শাস্ত্রসম্মত কথা। উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঘের আর চলার সম্ভাবনা ছিল না, অসাড় হয়ে গিয়েছে।

হৃষ্ট মনে ফিরলাম স্টেশনের দিকে। মরা বাঘটাকে বার করার জন্যই তো লোকজনের দরকার—তা ছাড়া আর একটা খোলা গরুর গাড়ী চাই। মাটিতে দাঁড়িয়ে আক্রমণরত বাঘ মারলাম আর লোকে দেখবে না? এতবড় বিনয় আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি, মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম নিজেই হেঁটে কয় মাইল পাড়ি দেব, রাইফেল হাতে শিকারীকেই যদি লোকে না দেখল তো মৃত্যুর খেলায় নেমে লাভ?

ষ্টেশনে ঢুকতেই দেখি মাষ্টারমহাশয় টেলিফোনে কথা বলছেন। কথা শেষ করে আমাকে বললেন—জাড়ুল গ্রাম থেকে ইন্স্পেক্টর আসছেন। আপনাকে সাক্ষী হতে হবে—পোষ্ট মরটেম পরীক্ষা হবে কিনা। একদিনে দুটো লোক সাবাড় হয়ে গেল মশায়। উত্তর দিলাম—আমার চেয়ে বড় সাক্ষী এক্ষুনি এসে উপস্থিত হবে—বাঘটা মরেছে।

ভদ্রলোক আমার কথায় কানই দিলেন না। বাঘ মারার কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেখুন তো দরখাস্তটায় কিছু ভুলটুল রয়ে গেল নাকি। চিঠিটায় আপনাকে সাক্ষী করেছি, এখানেও একটা সই দরকার।

চিঠি পড়লাম, সারাংশ এই রকম—"এক্ষুণি আমাকে মড়কের জায়গা থেকে বদলী করা হোক। দিনে দুটো করে মানুষ মরছে, গাঁ উজোড় হতে মাত্র কয়েক দিন বাকি। এই সময়ের ভিতর আমার মৃত্যু ঘটে গেলে কর্ত্তব্যহানি সম্বন্ধে কোন দোষারোপ যেন না আসে।" চিঠি পড়ে ভদ্রলোকের কর্ত্তব্যজ্ঞানের তারিফ না করে পারলাম না. জিজ্ঞাসা করলাম, খানাতল্লাসীতে যদি বার হয় বাঘ মারা পড়েছে—তা হলে আপনার দরখাস্ত না-মঞ্জুর হতে পারে—তা ছাড়া অযথা বদলীর অজুহাতও একটা বদ নথী হয়ে থাকবে, কারণ বাঘের কথা উল্লেখ করেন নি। স্টেশন মাস্টার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'কাউণ্টার' চাপড়ে বললেন, 'আলবাৎ দরখাস্ত মানতে হবে। পেটের দায়ে চাকরি করতে এসেছি বলে কি স্ত্রী-পুত্রকে বাঘের মুখে তুলে দেব?' একটু থেমে বললেন, 'হরদম মানুষ মরলেই তাকে বলে মড়ক, কিসে মরল, তার খোঁজ নেবার ভার আমার উপর? ঔষধের যোগাড় হতে হতে যদি সব কিছুই শেষ হয়ে যায় তখন আমার প্রাণটা কি ফিরিয়ে দেবার জন্য উপরওয়ালা ব্যস্ত হবে?' মড়কের যুক্তি অদ্ভুত লাগলেও সংক্রামক রোগ নিবারণ সম্বন্ধে একটা বড় সত্য আত্মপ্রকাশ করল। আমাকে সাক্ষী করা ও আমার স্বাক্ষর নেবার জন্য যখন তিনি রুখে উঠেছেন, তখন দেখি পিসে মশায় স্বয়ং ষ্টেশনে এসে উপস্থিত, হাতে দোনলা বন্দুক।

আমাকে দেখে বললেন, 'বাবা কি ভয়ই পেয়েছিলাম। কাল তোমাকে আনতে গাড়ী পাঠিয়ে দেবার পরই খবর এল, আমাদের টেঁপোকে বাঘে নিয়েছে। ছেলেটা ছাগল চরাচ্ছিল রামুর ক্ষেতে। লোকজন তাড়া করায় বাঘ ওকে ফেলে পালায়। দিন-দুপুরে এই কাণ্ড। একটা হাত একেবারে গেছে। ওকে সঙ্গে করে এনেছি জাড়ুল গ্রামে হাসপাতালে পাঠাব বলে। বাঁচবে বলে মনে হয় না, কাল সন্ধ্যা থেকেই জ্ঞান হারিয়েছে। গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না, পাল্কীও চলে গেছে চাটুজ্জের, এখানে ওটাও পূজাবাড়ী।' কিছু পাওয়া গেল না, খবর আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। তার পরই হঠাৎ মুষলধারায় বৃষ্টি। একটু থামথম হতে রাত্রেই রমেস তোমার খোঁজে যোগীনকে নিয়ে বার হয়েছিল। দু' পা চলতেই লণ্ঠনের কাঁচ গেল ফেটে, তারপর আলো নিবল ঝোড়ো হাওয়ায়। তা সত্ত্বেও রমেনকে যেতেই হবে, ছোট্ট একটা টর্চ্চ, দেড় গজ তার আলোর বহর, তাই নিয়ে বেরুল। তারপর পিছলে এঁটেল মাটিতে বার তিনেক আছাড় খেয়ে ফিরল। যোগীনেরও ঐ অবস্থা, কাদামাটি মেখে ফিরেছিল।' ঘটনার বিবৃতি দিয়ে তিনি বললেন যাক বাবা তোমাকে সুস্থ অবস্থায় দেখে বাঁচলাম। আসবার সময় গাছে ওঠা কতকগুলো লোককে দেখলাম, তোমার হাতে রাইফেল—এদিকেও কোন উপদ্রব হ'ল না কি?

জবাব দিলাম—দুটো লোক মরেছে, আমিও বাঘটাকে মেরেছি। পিসেমশায় অবাক

হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তরটার জরুরী দরকার ছিল, জানালাম, কাছেই মারা পড়েছে চলুন দেখাচ্ছি।

পিসেমশায়কে সঙ্গে নিয়ে সেই সাহসী ছোকরাকে ডাকলাম, আরো মানুষের দরকার। সে দেখি পিছিয়ে পড়েছে, অনুমান করলাম, বাঘ যে মরেছে এ কথা অত সহজে সে বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তার সাহস ফুরিয়ে যাবার আর একটি কারণ হতে পারে—বরোজের ভিতর বাঘের খবর গাছে-চড়া মানুষগুলি চাক্ষুষ দেখে জানিয়ে দেওয়ায়। বহু চেষ্টায় বোঝানো গেল আমার কথাটা মিথ্যে নয়। পুনরায় তারই সাহায্যে লোক জড় হ'ল। সকলে মিলে বধ্যভূমির নিকট হাজির হলাম।

যথাস্থানে এসে দেখি ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। বাঘের পা দেখা যাচ্ছে না। ভাবলাম, মৃত্যুর ঠিক আগে অনেক আহত জানোয়ার পা ছুঁড়ে থাকে। হয়ত ঐ কারণে পা দুটো বরোজে আড়াল পড়ে গিয়েছে। তবু সন্দেহকে হাতে রাখা ভাল—সাবধানে ভাঙ্গা জায়গাটার দিকে এগুতে লাগলাম। খুব কাছে গিয়ে দেখি যেখানে বাঘ পড়ে ছিল সেখানে বালতি খানেক টাটকা রক্ত জমে গিয়েছে। বাঘ একবার বাইরে আসারও চেষ্টা করেছিল। সদ্য থাবার ছাপে গতির চিহ্ন ধরা পড়ল। শুধু থাবার দাগ নয়—এক হাতের ভিতর একটি আছাড়ের চিহ্নও রয়েছে। সামনের থাবার পরে ভিতর দিকে পিছনের পায়ের দাগ উল্টোমুখী। বাঘ কোথায় গেছে জানতে বাকি রইল না এবং এটাও বুঝলাম এক কদম চলতে গিয়ে যাকে আছাড় খেতে হয় সে বেশী দূর যায় নি, এই বরোজের ভিতরই আছে। সবই ঠিক, কিন্তু পিসেমশায় আর অতগুলো লোকের সামনে মুখ দেখাই কেমন করে। রক্তের প্রমাণ তো আমার সত্যবাদিতাকে ঠেকা দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়—কি করে ওদের বোঝাব, ওটা মানুষের রক্ত নয়। ক্ষণিকে আত্মাভিমান আমাকে উন্মাদ করে তুলল—সোজা ফিরে এলাম পিসেমশায়ের কাছে, কোন বাক্যব্যয় না করে আমার ম্যাগাজিন রাইফেলটা তাঁর হাতে দিলাম এবং তাঁর দোনলাটা এক রকম ছিনিয়েই নিয়ে নিলাম। আমার আচরণে তিনি কি ভাববেন সে চিন্তা তখন মাথায় নেই। উন্মত্ততার মাঝেও শিকারী সতর্ক ছিল। বন্দুক খুলে টোটা দেখে নিলাম। একেবারে টাটকা টোটা, লিথেল বল, ঘোঁড়া ফেললাম নখের উপর, পেরেক দোনলটা যেন দৈব কৃপায় এসে গেল। অত কাছ থেকে ম্যাগাজিন রাইফেলে দুবার টোটা ভরার অবসর পেতাম না। বন্দুক ঠিক আছে, ঢোকার মত গর্ত্ত হয়ে গেল, আর দেরি করার সময় নেই, হামা দিয়ে ঢুকে পড়লাম বরোজের ভিতর, তলায় নরম মাটি, চতুষ্পদীয়ের মত, চলতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না, কেবল জলে হাঁটু পড়ায় যে আওয়াজ হচ্ছিল, সেইটুকুই অস্বস্তিকর। পানের পাতায় রক্তের দাগ দেখে এক পা এগুচ্ছি, একটু কিছু সন্দেহের সাড়া পেলেই থামছি, আবার চলছি। আমি প্রায় যন্ত্রচালিতের মত হয়ে গিয়েছি; বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে কিছুমাত্র খেয়াল নেই, একমাত্র লক্ষ্য মারা বাঘকে পালাতে দেব না। এর ভিতর বরোজের প্রায় মাঝ বরাবর এসে পড়েছিলাম, দেখি রক্তের দাগ মোড় ফিরল, এইখানে বাঘের গলার ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ শুনলাম, বাঘ আমাকে দেখেছে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। গতি থামিয়ে নীল-ডাউনের মত বসলাম, কাঁধে বন্দুকের বাঁট তখন আপনা থেকেই উঠে গিয়েছে, বাঁ পাশে পানের লতা একই জায়গায় দুলছে। দৃষ্টি সন্ধানের বস্তু খুঁজে বার করল, বাঘ কয়েক হাতের ভিতর পড়ে আছে, তার পিছনটা আমার দিকে, লেজের উত্থান-পতন চলেছে, সেও ঘাড় বেঁকিয়ে দৃষ্টি রেখেছে আমার উপর। অত কাছ থেকে জীবন্ত বাঘের খোলা দাঁত কখনও দেখি নি। আমার উপর লাফিয়ে পড়ার কি দারুণ আগ্রহ, হঠাৎ কিভাবে ঘোঁড়া পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দারুণ আঘাত পেলাম। ঠিক তারপর কি হ'ল মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি, আমি বিছানায় শুয়ে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যথাসময়ে জানতে পারলাম বাঘ আমাকে আক্রমণ করে নি, মরা বাঘের অভিশাপে পিসেমশায়ের বন্দুকের নল ফেটে গিয়েছিল। নল বৎসরে একবার পরিষ্কার হ'ত—এবার তাও হয় নি। মরচের সঙ্গে বারুদের সদ্ভাব না থাকায় যা ঘটবার তা ঘটল। বাঘটা না মরলে পিসেমশায় বোধ হয় যমের বাড়ী পর্য্যন্ত তাড়া করতেন আমাকে সদুপদেশ দেবার জন্য।

গল্পটা শেষ করে মুখুজ্জেমশায় বললেন, এই দেখ না, আজও বন্দুক ফাটার জখমি চিহ্ন কপালে পরে আছি।

—•—

ভদ্রাচলামের ক্যাম্প

আচমকা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ খুলে দেখি একটি ছেলে আমাকে ঠেলছে। অভাবনীয় স্পর্দ্ধা, প্রায় রেগে উঠেছিলাম, কিন্তু ছেলেটার মুখ দেখে কিছু বলতে পারলাম না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, চোখে জল, ভয়ে কথা পর্যান্ত জড়ান, বললে,—"বাবাকে নিয়ে গেল"—সংক্ষিপ্তে ঐটুকু বলেই তার ভাষা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা যে কি তা ভাল করে বোঝবারও উপায় নেই—ছেলেটার মন একেবারে ওলোট-পালট হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় জেরা করে খবর বার করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবু অনুমান আমাকে কারণের নাগালে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ক্যাম্প খাট ছেড়ে উঠতে হল।

শীতকাল, সবে ভোর হতে আরম্ভ করেছে। তাঁবুর বাইরে জমাট কুয়াশা, লণ্ঠনের আলো দুই গজও চলে না। ছেলেটার হাতে টর্চ্চ দিয়ে বললাম, "কল টিপে থাক, আমি বন্দুক নিয়ে এগুচ্ছি, তোর কোন ভয় নেই।"

ওদের আড্ডা ছিল তাঁবু থেকে ত্রিশ গজের ভিতর। খানিকটা এগুতেই ছেলেটা আঁৎকে উঠল। আমিও যা দেখলাম তাতে রক্তহীন হয়ে আসার উপক্রম। আট-দশ হাতের ভিতর দুটো চোখ টর্চ্চের আলো পড়ায় আগুনের মত জ্বলছে। বন্দুক তুলে টিপ করারও সাহস নেই, সামান্য নড়াচড়াতেই একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু পরেই চোখের আগুন নিভে গেল—বুঝলাম মুখ ঘুরেছে। এখন কি করা কর্ত্তব্য? মনে হল টর্চ্চটা আমার হাতেই থাকা ভাল—চলার পথে অভিজ্ঞতার উপদেশ দরকার হতে পারে। ভয়ঙ্কর জীবটি অন্ধকারের আড়াল নিয়ে যদি পিছন থেকে আক্রমণ করে তাহলে আমাদের মধ্যে একজনকে ওর সঙ্গে যেতে হবে। এইরূপ আচরণ কিছুই বিচিত্র নয়। বিচিত্র নয় কেন বলি, এইটিই হল আসল বুনিয়াদি চাল। এক হাতে রাইফেল এবং অপর হাতে টর্চ্চ নিয়ে এগুতে লাগলাম। মাঝে মাঝে চার ধারে আলো ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছি—চলন্ত আগুন পিছু নিয়ে আছে কিনা। তখন একমাত্র চিন্তা কোনপ্রকারে ছেলেটার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছান। একটি পরিত্যক্ত খোড়ো ঘরে ওদের স্থান দিয়েছিলাম। বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি, প্রায় নিশ্চিন্ত হবার আশা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে, এমনি সময় মনে হল, ঠিক আমার পিছনেই একটা কিছু ঘটে গেল। অকস্মাৎ অবর্ণনীয় ভয় আমাকে গ্রাস করে ফেলল, এমনই অবস্থা যে চলৎশক্তিরহিত। পিছন দিকে মুখ ফেরাবার সাহস ছিল না, তথাপি অনুমান চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে। সামনে এগুবার চেষ্টা করছি, পা চলে না, কেউ যেন লোহার শিকল দিয়ে মাটির

সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মৃত্যুর ডাক শুনছি। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম মনে পড়ে না। বাঁচার স্বাভাবিক ইচ্ছা কিভাবে সাহস যোগাড় করে নিচ্ছিল— হঠাৎ পিছন ফিরলাম,—ছেলেটা অন্তর্ধান করেছে। বিভিন্ন দিকে আলো ফেলতে ফেলতে দেখলাম, ছেলেটার পা দুটো শোয়া অবস্থায় জমাট কুয়াশার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। টর্চ আর বন্দুকের নল একত্র করতে করতে সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে দিকে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দিকে আলো ফেলে একরকম পিছু হেঁটেই ওদের আড্ডায় এসে পৌঁছলাম। তখনও আগুন পোয়াবার চুল্লী জ্বলছে। বেশী রাত পর্য্যন্তই খোস গল্প চলেছিল। দরজার কাছে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি আর ধাক্কার পর দরজা খুলল। ঘরের ভিতর আলো ফেলতে— চার জন মানুষই কিছু বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঘরে ঢোকবার পথেই পা পিছলে ছিল, মাটির উপর দেখলাম থোকা থোকা তাজা রক্ত।

ঘটনাটি গোড়া থেকে শুনলাম। শীতের রাতে মহুয়া একটু বেশী চড়ে গিয়েছিল। সকলেই বেহুঁস অবস্থায় শুতে যায়। ভোরের দিকে ঘুমের চাপ যখন ওদের পেড়ে ফেলে তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকলে মিলে ওরা ছিল ছয় জন। বাপ বেটায় শুয়েছিল শেষের দিকে। টাটির বেড়া বন্ধই ছিল, কখন চেঁচাড়ি ফাঁক করে বাঘ ঘরে ঢোকে কেউ জানতে পারে নি। ছেলেটা জেগেছিল—বললে বাঘের ডাক শুনে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। একটু পরেই দেখে টাটির দরজা ফাঁক করে বাঘ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে—। বাইরের চুল্লীর আলো দরজার গর্ত্তের ভিতর দিয়ে ঘরে আসছিল, স্পষ্টই দেখেছিল। একটার পর একটা মানুষ ডিঙাতে, ভয় পেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়েছিল,—এর মধ্যে বাপকে ছুঁতে গিয়ে বোঝে জায়গাটা ফাঁকা। তখন কম্বল থেকে মুখ বার করে দেখে— বাপের মাথা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠে আমাদের ঠেলে তোলে—আমরা বাইরে আসতে সাহস পাই নি। ছেলেটাকেও আটকে রাখা গেল না, জোর করে একলা বেরিয়ে গেল। বিবরণ শেষ করে লোকটা থামল, একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করল না—ছেলেটার কি হোলো ? বন্দুকের আশ্রয় দেখিয়ে, ওদের বার করার চেষ্টা করলাম না—কারণ সঙ্গে এলেও ঘন কুয়াশায় টর্চ্চের আলো বেকার। একলা ক্যাম্পে ফিরতে মন চাইছিল না। সকালের অপেক্ষায় বসে রইলাম।

ফরসা হতেই আমার তাঁবুর দিক থেকে গোলমাল উঠল। নিশ্চয় আর্দ্দালী চা দিতে এসে আমাকে না পেয়ে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। চিৎকার করে জানাতে হল, আমি এ দিকে আছি।

সকালের কাজ সব রইল পড়ে। জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল,

স্থির হতে পারছিলাম না। যেখানে দৃশ্যটি দেখেছিলাম—সেইখানে উপস্থিত হলাম। জায়গাটি একটি ছোট্ট নালার কাছে। পাড় বেশ উঁচু, কাছে না গেলে নালার জল দেখা যায় না। দিনের আলো এবং খোলা মাঠ হলেও সন্তর্পণে এগুচ্ছিলাম। যে সব ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাতে সব সময় প্রস্তুত না থেকে উপায় নেই। পথ চলতে একটি বড়সড় উইএর ঢিপি পাওয়া গেল—উঠে পড়লাম ওর চূড়ার উপর। এইখান থেকে নালার অনেকটা দেখা যায়। খোঁজার বস্তু সহজেই পাওয়া গেল। একটু দূরে দাড়ীযুক্ত মোটা মানুষটি বালির উপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে।

লোকজন কাছেই ছিল, সাহসের অভাব বোধ করি নি। নিকটে এসে দেখলাম, মাথাটা দেহ থেকে প্রায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।—মাথার কাছেই নরভুকের পায়ের দাগ, একটি ছোটখাট কুলোর পরিধি ঘিরেছে, লম্বাতেও অসাধারণ। বাঘ এত বড় হতে পারে চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

এইখানেই মানুষটাকে খাবার আয়োজন করেছিল। ভিজে মাটিতে বসার দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে। অস্বস্তিকর বিজলী বাতি কাছে আসায়, উঠে দাঁড়ায়। তার পর পাড়ের উপর উঠে সন্দেহ ভঞ্জন করা দরকার হয়েছিল—একটু আমাদের দিকে আসতেই, আলো চোখে পড়ে। পরের ঘটনা ছেলেটাকে নিয়ে। হঠাৎ মুখ ঘোরাল কেন, জানতে সময় লাগল না—। এই জাতীয় আলোর সঙ্গে বিপদ জড়ান থাকে জেনে সোজা চলে গিয়েছিল আমাদের বিপরীত দিকে। চলার চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি, প্রায় ফারলং-খানেক আসার পর দেখা গেল, হঠাৎ গতির পরিবর্ত্তন ঘটেছিল,—পলায়নের পরিবর্ত্তে আক্রমণের প্রয়াস বেড়ে ওঠে। যাবার সময় ধীরে সুস্থে এগিয়েছিল, ফিরবার পথে লাফের পর লাফ ব্যবহার করে আমাদের একটু আগেই লাফ থামিয়ে দিয়েছিল, তার পর পিছন থেকে ছেলেটাকে নিয়ে যায়। এই রকম মারার প্রণালী ইতিপূর্ব্বে জানবার সুবিধা পাই নি। ছেলেটাকে মাটিতে পর্য্যন্ত পড়তে দেয় নি। ঘাড় ধরেই লাফ দিয়েছিল কিনা কে জানে। কেমন একটা ভৌতিক প্রভাব ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল।

জন্তুটির কীর্ত্তি সম্বন্ধে নানা বর্ণনা অনেক দিন থেকেই শুনছিলাম। কাজের চাপে শিকারের সখকে বড় করে দেখতে পারিনি। শেষ পর্য্যন্ত মানুষ মারার খবর এমনই বেড়ে উঠতে লাগল যে, বাঘের পিছু নেওয়া আমার কর্ত্তব্যের এলাকায় এসে পৌঁছাল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, হরদম মানুষ উধাও হবার খবর পেয়েও নির্লিপ্ত থাকলে উপরআলার কাছে জবাবদিহির প্রশ্ন উঠে পড়ে।

এই গ্রামে কয়দিনের ভিতর চার জন মানুষকে নিল। আমার আশেপাশেই মওড়া জেনে, এইখানেই তাঁবু গাড়তে বলেছিলাম, ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল।

জায়গাটা তিন দিকে খোলা, একদিকে যেটুকু গাছপালা আছে, তাকে জঙ্গল বলা চলে না। তলায় খাপছাড়া আস্‌সেওড়ার ঝোপ—তার সঙ্গে কতকগুলি বাজে গাছ। যেটুকু জায়গা ঘিরে সবুজের কারবার তাও স্বল্পপরিধির ভিতর সমাপ্ত। ঝোপের পিছনেই গ্রাম। আমাদের দিক থেকে তাড়া খেলেই বাঘ গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়বে—আড়াল রেখে পালাবার ঐ একটি মাত্র পথ এবং পথের মাঝে কাহারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেলে—শার্দ্দুলসুলভ আপ্যায়ন খুবই স্বাভাবিক। অপরদিকে গ্রামের ভিতর থেকে শিকার খুঁজলে—বিরাট খোলামাঠের দিকে চলে আসবে। বিস্তৃত খালি জায়গায় ঝোপঝাপ নালা সবই আছে। আত্মগোপন করলে জানোয়ারটিকে আর পাওয়া যাবে না এবং গোলমালের পরে এ তল্লাটও ছেড়ে পালাতে পারে।

শিকারের সম্ভাবনা জটিল হয়ে উঠতে লাগল। লোকেদের বললাম—পাঁচ ছয়টি মোষ চাই। বিপরীত দিকের গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে হবে। সামনের বস্তিতে যাওয়া চলবে না, বাঘ নিশ্চয় কাছেই কোন বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

শিকারের জায়গা ছেড়ে উল্টো দিকে যাবার প্রস্তাব উঠতেই প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক লোক মোষ আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং আমার সমর্থনের অপেক্ষা না রেখে কর্ত্তব্য পালনের জন্য আগুয়ান হয়ে পড়ল।

ঘুরে ফিরে রাত্রের ঘটনাই মাথায় পাক খাচ্ছিল। কাপড়ের তাঁবু, তার উপর নির্ব্বিঘ্ন প্রবেশ-পথ ছেড়ে, মজবুৎ দেয়ালআলা ঘরের দিকে গেল কেন। যে লোকটাকে ঘরের ভিতর মারল—সেও বাছাই-করা মানুষ। রোগা মানুষগুলি বাদ দিতে সব কয়জনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়েছিল, সর্ব্বোপরি ওস্তাদি প্যাঁচ, নিঃশব্দে কাজ হাঁসিল।

এরূপ একটি জীবের চালচলন জানতে হলে গোয়েন্দাগিরী না করে উপায় নেই। কাজে নেমে পড়লাম, তাঁবুর পিছনে পায়ের দাগ খুঁজতে লাগলাম। কি সর্ব্বনাশ—এইখানেই সে চার-পাঁচ বার টহল দিয়েছে—একবার ভিতরে ঢোকার চেস্টাও করেছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সোজাই চলতে থাকে মহুয়াসেবীদের দিকে। "হাতের পাঁচ" ঐ দিকেই ঠিক ছিল। রাতের আলোয় বাঘের চোখে দিব্য দৃষ্টি জড়ান থাকে—দূরের জিনিসে আহারের সম্বন্ধ থাকলে সামান্য নড়াতেই বুঝে নেয় আহার্য্যটি কোন্ জাতীয়। তাঁবুর কাছে টহল মারার প্রথায় বিপদের সন্দেহ ঘনিয়ে ছিল, একবারও কোথাও বসে নি। গ্রামের আবহাওয়ায় সাদা কাপড়ের ঘর প্রথম খাপছাড়া, দ্বিতীয় বোধ হয় কোন সময় এই রকম ঘরের কাছে আসতে বিপদেও পড়ে থাকবে—কে বলতে পারে গুলির মারে আহত হয়েছিল কিনা। যাক পায়ের দাগ অনুসরণ করে খোড়ো ঘরের কাছে এসে পৌছালাম।'

যা ভেবেছি ঠিক তাই ঘটেছিল, নরখাদক ঘরের ছায়ার আড়ালে বসে ছিল—ভীড়ের বাইরে

কাউকে একলা পাবার আশায়। যে সব জায়গায় বসে তাগ করেছিল সেই জায়গাগুলি লেজের মৃদু দোলায় ঝাঁট দেবার মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। শিকার-অন্বেষণী ওৎপাতা বাঘের ধৈর্য্য মাপতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কারণ সীমাকে নাগালের মধ্যে পাবার উপায় নেই। প্রস্তুত আহার সুবিধামত পাবার জন্য কতক্ষণ বসে থেকেছে কে জানে। একলা কাউকে না পাওয়ায় দরজা বন্ধের পর আগুনের সামনে দিয়েই তিন-চার বার ঘরটার চার ধারে ঘোরে—ঢোকার সহজ ফাঁক খোঁজার জন্য। কোন দিকে সুবিধা না করতে পেরে চুল্লীর আলোককে সাক্ষী রেখেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এতটা কাহিনী মাটির কাছে জানা গেল। নরম বালি-মাটির উপর সব কথাই লেখা ছিল। কারণ এখানকার বাসিন্দারা সকালেই গৃহত্যাগ করেছিল, তার পর মানুষ এদিকে চলে নি।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, অতগুলি মানুষের গায়ে ছোঁয়া না লাগিয়ে কি ভাবে ঐ রকম মোটা মানুষকে শূন্যে ঝুলিয়েছিল ধারণা করা শক্ত। কিম্বা ছোঁয়া লাগলেও মহুয়ার জের রসগ্রাহীদের ভাবিয়েছিল, প্রিয়ার ছোঁয়া, আরো লাগুক। ভরা ঘুমের স্রোতে, সুরার সার কথা ভেসে আসা কিছুই বিচিত্র নয়।

যতই বাঘের আচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হতে লাগল, ততই আতঙ্কের ঘোর বাড়তে সুরু করে দিল। এখন ছেলেটাকে খুঁজে বের করা যায় কেমন করে? বিবেচনা করে দেখলাম ভীড় করে ছেলেটার কাছে যাওয়া উচিত হবে না। যে রকম ফাঁকা তাতে আমরা পৌঁছানর আগেই হয় গা ঢাকা দেবে, নয় পালাবার সময় দেখতে পেলেও গুলির পাল্লার বাইরে থেকে যেতে পারে। একলা চুপি চুপি যেতে পারলেই ভাল হয় কিন্তু আহারে বসা বাঘের কাছে একলা যাবার সাহস ছিল না। আমার আর্দ্দালীকে সঙ্গে নিলাম। লোকটা এর আগে অনেকবার শিকারের গল্প করেছে—বন্দুক চালানতেও নাকি সিদ্ধহস্ত। এইরূপ আত্মপ্রশংসার যোগে প্রোমোসনের কোন দাবী ছিল না—সুতরাং আর্দ্দালীর সাহসকে অবিশ্বাস করার কারণ ঘটে নি। দোনলাটা ভরে নিয়ে আমার পিছনে আসতে বললাম।

বন্দুক ভরে তাঁবু থেকে ফিরে এসে বললে, "হুজুর মহিষগুলো এসে গিয়েছে—কয়েকটা এগিয়ে দিয়ে আমরা পিছনে থাকলেই ভাল হয়। এই বাঘটা একেবারে বজ্জাত জানোয়ার।"

বাঘের নিন্দায় নতুন খবর না থাকলেও আর্দ্দালীর মনের অবস্থা কতকটা বুঝলাম। এইরূপ দোমনা লোক সঙ্গে নেওয়া উচিত হবে কিনা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বিপদ যদি কাছে এসে পড়ে তাহলে আর্দ্দালীর আব আমার মাঝে দূরত্ব বেড়ে উঠবে। বিপদ দূরে থাকলে চেঁচামেচিতে কাছে ডেকে আনাও খুব সম্ভবপর। আর কেউ নেই, যার হাতে নিশ্চিন্ত মনে আগ্নেয় অস্ত্র তুলে দিতে পারি। গত্যন্তরে অনিচ্ছুক মানুষকেই সঙ্গে নিতে হল।

লোকবিরল বালি-মাটির উপর দাগ সজাগ হয়ে আছে। বিপদের কেন্দ্রে আসতে

রাইফেল ভরে নিলাম—দুই তিনটি বাড়তি কার্ত্তুজও বুক পকেটে রেখে দিলাম। আমার ক্যাম্পকে পিছনে ফেলে টানের দাগ ঝোপের গা ঘেঁষে উত্তরমুখো চলেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে চলন্ত চিহ্ন মোড় ঘুরে যেতে পারে। চোখ কান হুঁসিয়ার রেখে একটার পর একটা পা ফেলছি। চলতে চলতে ছোট জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরা ক্যাম্প ছেড়ে অনেকটা এসে পড়েছি। টানের দাগ তখনো দূরের দিকে আগুয়ান হয়ে আছে—আমার দৃষ্টি দাগের দিকে নিবদ্ধ—হঠাৎ আর্দ্দালী পিছন থেকে কাঁধ ছুঁলো, কানের কাছে এসে বললে "ঐ যে"।

চমকে উঠলাম, বুকের উপর কে যেন ভারী হাতুড়ী বসিয়ে দিল। দৃষ্টি দূরে চালাতে দেখলাম—একটি ছোট ঝোপের পাশে মানুষের মাথা বেরিয়ে আছে। বাঘ নিশ্চয় ঝোপের আড়ালে আহার চালিয়েছে। ঝোপের আশেপাশে একেবারে পরিষ্কার, হঠাৎ বেরিয়ে এলেও ভয় নেই। কিন্তু এতদূর থেকে নিশানা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কাছে গেলেও বিপদ বেড়ে ওঠে। আর্দ্দালীর উপদেশ অগ্রাহ্য করায় আপশোষ এসে গেল। দুজনমাত্র লোক, তার মধ্যে উভয়েই দোমনা হলে শিকার চলে না। একটু আগেই মোষের প্রস্তাবে যে ভাবে নির্লিপ্ততার দ্বারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছি তাতে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করারও সৎসাহস নেই। স্বোপার্জ্জিত বিপদকে বরণ করার জন্য এগুতে হল।

নিশানার প্রয়োজনীয় দূরত্বের কাছে আসতেই আর্দ্দালীকে বললাম, কাশতে। আদেশ অনুসারে সে গলা খাকরানি দিল, ঝোপের দিক থেকে কোন চঞ্চলতার লক্ষণ পাওয়া গেল না। মান বাঁচাতে প্রাণান্ত,—ভিতরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঠেলা মেরে আরো খানিকটা এগিয়ে দিল। ছেলেটা একই অবস্থায় পড়ে আছে। আর তো এগুনো চলে না! রাইফেল তুলে নিজেই কাশলাম, তার সঙ্গে দুচারটে আবোল-তাবোল কথাও বললাম, ঝোপ নড়ে না। সামনের দিকে মুখ রেখেই, আর্দ্দালীকে বললাম দুচারটে নুড়ী বা ইটের টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে এস, এইখান থেকে ঝোপের উপর ছুঁড়তে হবে। বাঘ বেরিয়ে পড়লেও ভয় নেই, চারধার ফাঁকা, তার উপর দুটো বন্দুক আছে, একটার গুলিতে পড়বেই। ইচ্ছা করেই আর্দ্দালীকে শিকারীর মান্যবর স্থান দিতে হয়েছিল নিজের সাহস বাড়াবার জন্য।

আর্দ্দালী ঢিল খুঁজতে চলে গেল, আমি রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। দৃষ্টি এক জায়গায় ঠিক করে রেখেছি, সময় কেটে চলেছে। ক্রমান্বয়ে হাত ভেরে আসতে লাগল, আর্দ্দালী আর ফেরে না। ধৈর্য্য যথাসময় বিরক্তির নাগালে এসে পোঁছাল—ভয় পর্য্যন্ত পিছিয়ে পড়েছে। সামনের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার উপায় নেই যে মুখ ঘুরিয়ে দেখব লোকটা গেল কোথায়। ঐরূপ অবস্থায় ধৈর্য্য গণ্ডির বাঁধন ছিঁড়লে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, আমার ক্ষেত্রেও যা স্বাভাবিক তাই ঘটল, বেপরোয়া হয়ে গেলাম, একলাই এগুতে লাগলাম। সঙ্গে ৫০০ বোরের একস্‌প্রেস দোনলা ছিল, নির্ভরশীল অস্ত্র। একটা উপরি গুলি হাতে রেখে ঝোপের কাছেই

ছেলেটার পায়ের দিকে বালির উপর গুলি চালালাম। একরাশ বালি উড়ে গেল, বাঘ বার হল না। বন্দুকের আওয়াজ আর নিস্পন্দ ঝোপ সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফাঁকা নলটা ভরে নিয়ে এক পা দুপা করে ছেলেটার কাছে এসে পড়লাম, ব্যবধান কমতে কমতে ১৫।২০ হাতের মধ্যে এসে পড়ল। এইখান থেকে একই জায়গায় লক্ষ্য করে আবার গুলি চালালাম। বিকট আওয়াজের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধতাকে তোলপাড় করে দিল—তারপর সব চুপচাপ। নির্ভয়ে ঝোপের কাছে এসে পড়লাম। অপর পাশে গিয়ে দেখি বাঘ নেই এবং ছেলেটার বুক পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলেছে, ভীতিপ্রদ দৃশ্য। জমাট রক্তের উপর হঠাৎ লাফ মারার চিহ্ন রয়েছে, লাফের সময় পিছনের পা পিছলে গিয়েছিল—রক্তের সঙ্গে খানিকটা মাটিও উপড়ে গিয়েছে। নিশ্চয় আমাদের বহুদূর থেকেই দেখেছিল।

এখান থেকে আমাদের আস্তানা মাইলখানেকের উপর হবে। শিকারের যেটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তাতে ঠিক জানতাম, বাঘ আর এ মুল্লুকে নেই। তবে বাকি অংশ খাবার জন্য সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসতে পারে। এই দিক দিয়ে হাটের পথ, একটু পরেই লোকচলাচল সুরু হবে। সুতরাং দিনের বেলা বাঘ ফিরছে না।

ছেলেটার যেটুকু অংশ পড়ে আছে তাই শিকারের সম্বল। মড়া আগলাতে হলে কয়েকজন লোকের দরকার, আর্দ্দালীটা ফিরলে বাঁচি—তাঁবুতে খবর পাঠান চলে। মড়ার কাছে লোক না থাকলে এখুনি শকুনিতে খেয়ে ফেলে দেবে। এরই ভিতর মাথার উপর কয়েকটা উড়তে আরম্ভ করেছে।

শব আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর্দ্দালী আর ফিরল না। কপালগুণে হাট-মুখো কয়েক-জন চাষাকে দেখলাম আমার দিকেই চলে আসছে—কাছে আসতে গোড়াতেই বেশ জোর দিয়ে হুকুম দিলাম, "মড়ার পাহারায় থাক"—এই রকম হুকুম চালান আমার পেশার অন্তর্ভূর্ত। অভ্যস্ত থাকায় দয়ার বস্তুকে দাবীর পর্য্যায়ে টেনে আনতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। বন্দুক হাতে অফিসার ব্যক্তির আদেশ বিনা আপত্তিতে পালিত হল। একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিল—"বাঘ যদি আসে?" অর্থাৎ তখন পালাতে পারব তো? উত্তরে কোন কথা বলি নি, কেবল লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম—যার মানে দাঁড়ায় এ রকম আদেশ তো দিই নি। দৃষ্টির শাসনে লোকটা এমন ভাবেই বশীভূত হয়ে গেল যে, ওদের জিম্মায় শিকারের টোপ রেখে আসতে কোন প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা মনে এল না।

ক্যাম্পে ফিরে দেখি আর্দ্দালী পরম মনোযোগ সহকারে আসবাবপত্র ঝাড়-পোঁচ করছে। কোন প্রশ্ন করবার আগেই সে বলে বসল, বালির দেশে কোথাও ঢিল পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এসে পড়েছিলাম, কাজগুলো পড়ে ছিল সেরে ফেলছি। প্রভু-ভক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য্য, এই লোকটার উপর নির্ভর

করেই নরখাদক বাঘ মারতে গিয়েছিলাম। প্রাণ-গলান ব্যবহারে যে সব ইচ্ছা ভিতরে কড়া হয়ে উঠেছিল তা ফাণ্ডামেন্ট্যাল রুলসের (Fundamental rules) গুঁতোয় চাপা তো দিলামই, অধিকন্তু স্বরকে মোলায়েম করে জানাতে হল—যা করেছ খুবই ভাল কাজ, এখন কতকগুলি লোক মড়া আগলাবার জন্য পাঠিয়ে দাও—গ্রামের মানুষগুলি রেহাই পাক।

উত্তেজনার সংঘর্ষণে দিবানিদ্রা কাজে এল না। সময়ের আগেই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম।

মতলব খুঁজছিলাম কি ভাবে শিকারে বসা যায়। একটি নকল ঝোপ করলে তার ভিতর কতকটা আত্মগোপন করা চলে—কিন্তু শ্যাওড়া গাছ এত বেঁটে যে স্বাভাবিক গঠন বজায় রাখতে হলে মাটিতে গর্ত্ত করতে হয়—তাতেও অসুবিধার কিছু নেই—কিন্তু গুলি খেয়েও যদি বাঘ আড়ালের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে রিপোর্ট লেখার সুবিধা পাওয়া যাবে না। একমাত্র উপায় মোটা বাঁশের খাঁচা করে, শ্যাওড়া গাছ আড়াল দিলে সব দিক রক্ষা হয়।

সিদ্ধান্ত কাছে আসতেই হুকুম বেরিয়ে গেল। মাচানের মালপত্র যোগাড় হতে সময় লাগল না। মড়া আগলাবার লোকগুলি এক জায়গায় বসে আছে, এখুনি বেরিয়ে পড়া ভাল।

বাঘের আনা-গোনার পথ জানতাম, মওড়ার দিকে বন্দুকের নল বার করার ব্যবস্থা করে খাঁচা তৈরি হয়ে গেল। ছেলেটার যেটুকু অংশ পড়েছিল তাই ইস্পাতের তার (flexible steel wire) দিয়ে একত্রিত করে ঝোপের গোড়ার সঙ্গে কষে বাঁধিয়ে দিলাম। কঠিন দড়ির প্রয়োজন ছিল, কারণ বেশীর ভাগ সময়ে দেখেছি, সামান্য সন্দেহের কারণ থাকলে নির্ব্বিঘ্ন হবার জন্য বাঘ খাওয়া-শিকারকেও ধরেই লাফ মারে এবং ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খায়।

রোদ পড়তে দেরি নেই—লোকজনদের বিদায় করে দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সরঞ্জাম গোছানর কাজ দ্রুত সেরে ফেলে, সর্ব্ব প্রথম, বাঁ দিকের বুক পকেটে পিস্তল পুরে দিলাম। মুহূর্ত্তে বের করে ফেলার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মাটিতে বসলে সব সময় বাড়তি সাবধানতারঁ গা ঘেঁসে থাকা আমার অভ্যাস।

অল্পক্ষণের ভিতরই আবেষ্টনী নিঝুম মেরে আসতে লাগল। গোধূলির শেষ আলোয় বালিমাটি সোনা হয়ে গিয়েছে। নিরিবিলিতে ঝোপের আশেপাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক সুরু হয়েছে—তার সঙ্গে কুয়াশার পর্দ্দা ঘন হয়ে উঠছে। দিনের আলো শেষ হতেই অন্ধকার যেন তেড়ে এল আমাকে ঘিরে ফেলার জন্য। ঘের ভাল ভাবেই পড়ল। ঝোপের ভিতর নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঠিক এই সময় দূরে ফেউ-এর ডাক শুনলাম। যে দিক থেকে বাঘের আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম সেই দিক থেকেই রাজদূতের ঘোষণা আসছিল।

ক্রমান্বয়ে বিপদ-সঙ্কেত কাছে এসে পড়ল,—খুবই কাছে। উত্তেজনা চরমে উঠে গিয়েছে, তার সঙ্গে হৃদস্পন্দন। টর্চ-সংযুক্ত রাইফেল প্রস্তুত, ছেলেটার কাছ থেকে একটা কোন চেনা

শব্দ শুনলেই অস্ত্র কাঁধে তুলে নি। অপর দিকে ফেউ-এর ডাক আর এগুতে চায় না। একই জায়গা থেকে করুণ রব তুলে চলেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা সময় এইভাবে কেটে গেল। নতুন ঘটনার কোন সূত্রপাত নেই।

ফেউ-এর ডাক হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল—তারপর আওয়াজ আসতে লাগল আমার ক্যাম্পের দিক থেকে। বাঘ তা হলে আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে—ক্যাম্পের দিকেই রওনা হয়েছে—কে জানে আজ আবার কাকে নেবে।

ঘণ্টাদেড়েক সময় পার হয়ে গেল—একই ভাবে বসে আছি, পায়ে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছে, সিগারেটের জন্য প্রাণ আনচান, শেষ পর্য্যন্ত দুত্তোর বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। ভাবলাম আশাকে বাড়ন্তের দিকে এগিয়ে দিয়ে ঝকমারি পোহানয় কোন লাভ নেই। বাঘ আর ফিরছে না—একটা সিগারেট ধরিয়ে নেওয়া যাক। বন্দুক বগল থেকে নামাতেই বাঁট কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষণে খটাং করে আওয়াজ হল। পা দুটোকে আরাম দেবার চেষ্টায়—নড়ে বসতে গিয়ে—জলপাত্রকে (flask) উল্টেছিলাম প্রায়। কি ভাবে তা সামলেছিলাম মনে নেই। মোট কথা মৃৎগহ্বরের মাচানে যেটুকু শব্দ হল তাকে জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে হৈ-চৈ বলা চলে। সিগারেট বার করে দিয়াশলাই জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার উঠল, পর মুহূর্ত্তে আমার মাচানের উপর যেন পাহাড় ধ্বসে পড়ল। পায়ের তলায় দিয়াশলাই-এর বাক্স চাপা পড়লে যে অবস্থা হয় মাচান সেইভাবে মড় মড় করে চেপটে গেল। ছাউনী মাথায় না ঠেকলেও সামনের বেড়া প্রায় গায়ের উপর ঝুঁকে পড়েছে, বাঘের মুখ ঠিক আমার মুখের সামনে, ভয়াল ক্রোধ প্রকাশকালীন বিকট গন্ধযুক্ত মুখের লালা আমার কপাল, চোখ, নাক, কানের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময় যে কয়টা গলা খাঁকরানি শুনেছিলাম তার বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। আমার তৎকালীন মনোভাব বুঝতে হলে অভিজ্ঞতাটি নিজে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

ঐটুকু সময়ের ভিতর কিভাবে পিস্তল বার করেছিলাম, কিভাবে ঘোড়া টিপেছিলাম, কোন্ দিকে নল ছিল কিছুই মনে নেই। এইটুকু বলতে পারি পিস্তল ছুটেছিল। পিস্তলের আওয়াজে আশ্রয়ের সাড়া পেলাম—নিজেকে খোঁজার সুবিধা জুটল। ঘটনার আলোড়নে—ক্ষণিকের জন্য বেহুঁসের মত হয়ে গিয়েছিলাম।

পিস্তল ছোটার পর—অনেকটা সময় কেটে গেল। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের বাঁট খুঁজতে লাগলাম, বহু কষ্টে ছোঁয়া পেলাম কিন্তু কাছে আনার উপায় নেই, কিসের বাধায় আটক পড়েছে—টানাটানি করতে গেলে নতুন শব্দে আবার কি ঘটবে তার ঠিক নেই। অস্ত্রটিকে বাতিলের মধ্যে ফেলে দিলাম।

পলে পলে সময় কেটে যেতে লাগল—যে কোন সময় আহত শার্দ্দুলের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছি। গুলি খেয়ে মাচানের সামনেই পড়ে আছে কিনা জানবার

উপায় নেই। অন্ধকার দূর ও কাছের কোন পার্থক্য রাখে নি। ঠায় জেগে রাত কেটে গেল।

ফরসা হইতেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে চার ধার দেখে নিলাম, কোথাও বাঘকে দেখতে পাওয়া গেল না। মাচানের অবস্থা আমাকে বিস্মিত করে দিল—ভাবতে লাগলাম,—বেঁচে গেলাম কেমন করে। বন্দুক রাখার গর্ত্তটি হাত দুই ফাঁক হয়ে গিয়েছে—অস্ত্রটির নল ব্যবহারে বাতিল হয়ে গিয়েছে—তার উপর এসে পড়েছে মাচানের ছাউনি। বাহিরে আসার পথও বন্ধ। মাটিতে গলা পর্য্যন্ত গর্ত্ত না থাকলে বাঘের ওজনসহ মাচানের চাপেই দম বন্ধ হয়ে মারা পড়তাম।

ক্যাম্প থেকে লোকজন আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। রদ্দুর উঠতে জনতার কোলাহল শোনা গেল। ওরা নিকটে আসতে বুঝলাম আর্দ্দালী দুঃসাহসিক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগুয়ান হয়ে আছে—জোর হুঁকুম চলেছে—ইধর নেহি উধার, লে জলদি চলো,—কুছ ডর নেহী, আগে চলো—আরো কত কি কথা। মানুষের কলরবের সঙ্গে গো জাতীয় জন্তুর ক্ষুরধ্বনিও শুনলাম। নিশ্চয় মোষ, আর্দ্দালীর বডিগার্ড (bodyguard) লোকেদের চেষ্টায় স্বখাত কবর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ছেলেটার মুখ ফুলে উঠেছে, আজ রাত থেকেই পচতে আরম্ভ করবে। অন্য জায়গায় সুবিধা মতন মাচান করে, গলিত মাংসকে শিকারের টোপ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যে ভাবেই বাঁধা যাক, গলা মাংসের উপর সামান্য টান পড়লেই হাড় খুলে যাবে।

বাঘ কি ভাবে এসেছিল দেখবার জন্য কুতূহলী হয়েছিলাম। জায়গাটা পরীক্ষা না করে পারলাম না। দুচার কদম ঘুরতেই দেখি, বহুবার আমার মাচান প্রদক্ষিণ করেছিল। সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠলেও শেষ পর্য্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। যে সময় ছেলেটার কাছে এসে পড়েছিল সেই সময় আমার মাচানে নানা রকম শব্দ হয়। একে আহারে বিঘ্ন, তার উপর মানুষের তৈরী সন্দেহজনক শব্দে বাঘ আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আক্রমণের চরম কারণ ঘটল দিয়াশলাই-এর আলোয়।

আমার স্নায়ু একটু কড়া ধরণের। রাত্রের ঘটনার পরেও শিকারের সখ বা কর্ত্তব্যকে বাতিল করতে পারি নি। নানা ফন্দি মাথায় ঘুরতে লাগল। এই সময় আর্দ্দালী এসে আমার সামনে দাঁড়াল, প্রার্থনা, লম্বা ছুটি চাই, ছেলের ভারী অসুখ। খবর এসেছে চিঠিতে। একটি পোষ্ট কার্ড আমার সামনে ধরে দিল—হরফ তার ফারসি। কার্ডের খবর না পড়তে পারলেও ডাকের তারিখ দেখলাম গত মাসের, বললাম—চিঠির বয়স যে এক মাসের কাছাকাছি। অকাট্য নথী বেফাঁস হয়ে যায় দেখে অম্লান বদনে বলে বসল,—এতদিনে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে। লোকটার কথায় কান না দিয়ে আহারে মন দিলাম। সকালের খানা আর্দ্দালীই নিয়ে এসেছিল। আমার বৃহত্তর কর্ত্তব্যে বিঘ্ন ঘটাতে আর সাহস পেল না।

তিনদিন কেটে গেল কোন খবর নেই। ক্যাম্প তোলার আদেশ দিয়ে দিলাম। সদর আপিস এখান থেকে একত্রিশ মাইল। একদিনে এতটা পথ হেঁটে পাড়ী দেওয়া সম্ভব নয়, মাঝপথে ষ্টেশনের কাছেই তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। ষ্টেশনও এখান থেকে কম হলেও পনের মাইল হবে।

ব্রেকফাস্টের পরেই বেরিয়ে পড়া গেল। গন্তব্য স্থানে যখন এসে পৌছালাম, তখন বেলা দুপুর।

আমাদের তাঁবু খাড়া করার ব্যবস্থা চলেছে, ঘোড়াটাকে বটের ছায়ায় বেঁধে আমিও ক্যাম্প-চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। আমার পিছনেই খানিকটা জঙ্গলের মত। জঙ্গল একেবারে ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের গা ঘেঁসা। ঘোড়াটা থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। কখন ক্ষুর দিয়ে মাটি উপড়ে ফেলে, কখন ডাক দিয়ে ওঠে, কখন বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। কিছু না হোক লেপার্ড এসে আমার বাহনটিকে জখম করে দিলেই তো চমৎকার। আর্দ্দালীকে বললাম, ঘোড়াটাকে জঙ্গলের ধারে না রেখে লোকজনের কাছে বেঁধে দাও। আর্দ্দালী খানিকটা পথ এগিয়েই—এমন ভাবে ফিরে এল যাতে মনে হয় ওর ওপরই বাঘ লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিল। বাস্তবিকই সে ভয়ে বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দিন ধরে ওর ব্যবহার দেখছি, ভয়ের ন্যাকামি অসহ্য হয়ে উঠেছে। কোন কথা না শুনে ধমক দিয়েই বললাম—ঘোড়া এদিকে নিয়ে এস--সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু গাড়ার কুলীরা চেঁচিয়ে উঠল পুলী, পুলী (বাঘ)। আর্দ্দালী তখন একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে অফিসিয়াল সব কেতা চুরমার করে। ঘোড়ার জীনে লাগান চামড়ার খাপে ম্যাগাজিন রাইফেল ঢোকান ছিল। পায়ের তলাতেই তখনো সেটা পড়ে। অস্ত্র বার করে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগুলাম, কোথাও কিছু নেই, ঘোড়ার অস্থিরতাও থেমে গিয়েছে। লোকেরা বললে প্রকাণ্ড বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার দিকে আসছিল, সকলে দেখেছে।

আমাদের আড্ডায় গোলমাল থেমে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেশন মাষ্টার আট-দশ জন লোক সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেন আমাদের দিকে। নিকটে এসেই জানালেন তাঁহার সিগন্যালারকে ঘণ্টা তিন আগেই বাঘে মেরেছে। বাঘ তাড়া খেয়ে মানুষটাকে ছেড়ে পালায়, সিগন্যালার এখনও একই জায়গায় পড়ে আছে।

রাইফেল নিয়ে উঠলাম। ঘটনাস্থলে এসে দেখি মরা লোকটির স্ত্রী ও পুত্র শোকে অভিভূত। চার ধারে গ্রামের লোক জড় হয়েছে। লোক সরিয়ে, বাঘকে সনাক্ত করার চেষ্টা করলাম। পায়ের দাগ পাওয়া গেল না। ভীড়ের উৎপাতে সব একাকার হয়ে গিয়েছে। শোকের মাঝে লাস চাইতে দ্বিধা আসছিল কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে কঠোর হতে হল। ষ্টেশন মাষ্টারের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত সিগন্যালারের স্ত্রী রাজি হয়।

যেখানে মানুষটিকে ছেড়ে পালিয়েছিল--তার কাছেই দরজাহীন গুমটি ঘর। আবার মাটিতে! কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি আছে,—কাছাকাছি কোন বড় গাছ নেই। তখন জিদও চেপে গিয়েছিল। মাটিতেই বসব ঠিক করে ফেললাম।

এবার আর বাঁশের আড়াল নিচ্ছি না, ষ্টেসন মাষ্টারকে জানালাম একটি বড়সড় ময়লা ও শক্ত কাঠের তক্তপোষ চাই। এ অঞ্চলে অত বড় সৌখিনতায় কেহ অভ্যস্ত নয়, মাষ্টার মশাই মাথা চুলকে বললেন, "আমারটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

তক্তপোষ আসতে চারটি মোটা ডালও সংগ্রহ হয়ে গেল। ঘরের ভিতর থেকে চাড় দিয়ে তক্তপোষের উপর ঠেকা লাগাব বলে। তখুনি আশ্রয়ের পরীক্ষা করে নিলাম। ভিতর থেকে ঠেকা দিয়ে বললাম—পাঁচ ছয় জনে ছুটে এসে ধাক্কা লাগাও। পরীক্ষায় আড়ালের শক্তি পাস করে গেল। ঠেকা সরিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঠিক আছে, অন্ধকারে দরজা খোলা কি বন্ধ বোঝা যাবে না। মোটা খুঁটি পুঁতিয়ে লোকটাকেও তার দিয়ে বাঁধালাম। খুঁটিকে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে এবং নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা সেরে ক্যাম্পে ফিরলাম।

বিকেল পার হতেই শিকারের জায়গায় আসতে হল। ধারণা জন্মেছিল একটু নিরিবিলি পেলেই বাঘ এদিকে এসে পড়বে।

বন্দুকের নল বার করার জায়গা খালি রেখে—আড়াল মজবুৎ করে ফেলা হল। লোকজনদের চলে যেতে বললাম।

লোকেদের সঙ্গে শেষের ট্রেনও বিদায় হল। ষ্টেশন জনমানবশূন্য, দূরে রাখাল গরু চরিয়ে গ্রামে ফিরছে—কখন কখন কুকুরের ডাক শুনছি। সন্ধ্যা ধীরে এগিয়ে আসছে,—অল্পসময়ের ভিতরই অন্ধকার রাজ্য বিস্তার করে ফেলল। তক্তার ফাঁক দিয়ে মরা মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছি--আকার অস্পষ্ট হলেও—বোঝার কোন অসুবিধা নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা রাতের দিকে হেলে পড়ল। এমনি সময় ষ্টেসন-ঘেঁসা গ্রামে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডেকে উঠল—তার সঙ্গে যোগ পড়ল মানুষের চিৎকার। একটু পরেই গোলমাল থেমে গেল। বুঝলাম চিতাবাঘ বেরিয়েছে, কেলেঙ্কারী না করে বসে। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়ল। সাজান আহার সামনে পেয়ে যাবে—আসল শিকারে বিঘ্ন ঘটিয়ে দেবে।

অভিজ্ঞতা অল্পক্ষণেই প্রামাণিক হয়ে গেল, ঠিক আমার পিছনেই চিতার ডাক শুনলাম। মিনিট তিন চার পরেই মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ আসতে লাগল। অতি নিকটে একটা মানুষকে খেয়ে চলেছে, আর আমি রাইফেল হাতে নির্লিপ্তের মত বসে আছি। গত্যন্তর ছিল না, একবার বন্দুক চললে নরভুক্‌কে আর পাওয়া যাবে না।—শেষ পর্য্যন্ত শিকারীর ধৈর্য্যকে আর পরীক্ষার মধ্যে রাখা গেল না।

সন্তর্পণে দাঁড়ালাম তক্তপোষের পিছনে। বন্দুকের নল ধীরে উপরের খালি জায়গা

থেকে বার করে শব্দের দিকে ঘোরালাম। সবে আলোর সুইচ টিপেছি—সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম বুক ফাটিয়ে দেয়া বড় বাঘের ডাক—পরমুহূর্তে লেপার্ড আর মানুষ আড়াল পড়ে গেল। আলোর মাঝ পথে দেখলাম বাঘ, শূন্যে উড়ছে। ঘটনাগুলির সঙ্গে একই সময় যোগ দিল ট্রিগারের (বন্দুকের ঘোড়া) উপর আমার আঙ্গুলের চাপ। গুলি বেরিয়ে গেল।

কেমন করে বিনা নিশানায় গুলি চালিয়েছিলাম আমার মনে নেই। ধোঁয়া কেটে যেতে দেখলাম, হিংসার প্রতীক, মহাশক্তিশালীর ভয়ঙ্কর রূপ—অসাড় অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল—মাত্র কয়েক হাত দূরে। সুধু বাঘ নয় চিতাও—ধীরে মানুষটার মুখের উপর নেতিয়ে পড়ল। টর্চ্চের আলো তখনো জ্বলছে--পুনরায় গুলি চালাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু প্রয়োজন হল না, দুটোই মরেছে। এক গুলিতে দুই শিকার!- -বাহবা পেলাম যথেষ্ট,—কেউ জানল না আসল শিকারী আমার কপাল।

—*—

বনচারিণী

ঘটনাটি দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যের সীমান্তে, প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের বিবরণে বিবৃতিটি বাদ পড়ায় লিখিতে বাধ্য হইলাম। বক্তব্য বিষয় ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হইলে ঘটনাচক্রকে দায়ী করিতে হইবে।

বসন্ত সমাগমে, বনফুলের মধুর গন্ধ মৃদু সমীরণস্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। স্বচ্ছ কুহেলিকার অন্তরালে বনস্পতি ঈষৎ চঞ্চল, যেন বনলতার গাঢ় আলিঙ্গনকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া লইতে চায়। জ্যোৎস্নালোকে বনভূমি ভয়াল ও সুন্দরের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ই আপন রূপে আত্মহারা, আবেষ্টনী রহস্যপূর্ণ।

প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই যুবরাজ মল্লরাও উচ্চ টিলার উপর বসিয়াছিলেন। অরণ্য বেষ্টন করিয়া যে শৃঙ্গার-রসের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার সহিত যুবরাজের চিত্ত মিল খুঁজিতেছিল। গোপন কথার সূত্র অনুসন্ধানের নিমিত্তই তিনি মৃগয়ার শিবির হইতে দূরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিলেন, ভয়ালকেই সুন্দর দেখিতেছিলেন।

টিলার পাদমূলেই নিবিড় বনানী, তাহারই ছায়ায় গতিশীল সন্দেহের বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, যুবরাজ শরসন্ধান করিলেন। অঙ্গসঞ্চালনে অনুভব করিলেন জানু দুইটি জড়বৎ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে বসিয়া থাকায়, রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি রোধ হইয়াছিল, তদুপরি দেখিলেন বাম জানুর কিয়দংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে— বর্ণও সচল, বিস্ময়কর দৃশ্য। পরীক্ষা করিতে বাহির হইল, মসীকালো পিপীলিকার বাহিনী একত্রিত হইয়া গত কালের উন্মুক্ত ক্ষতের উপর নির্ব্বিবাদে নরমাংস আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। সহস্র সহস্র হিংস্র কীটের ভোজন-সম্মেলন, তাড়াইলেও পালাইতে চায় না। বহু চেষ্টায় পরিত্রাণলাভের পর রক্তস্রাব রোধ করিবার নিমিত্ত রুমাল দ্বারা দংশনের স্থানটি ঢাকিতে যাইতেছিলেন। যথাস্থান স্পর্শ করায় বুঝিলেন ক্ষত গভীর হইয়া গিয়াছে, এত গভীর যে স্বচ্ছন্দে একটি আঙ্গুল গহ্বরে ঢুকিয়া যায়।

নিজের প্রতি ধিক্কার আসিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন মৃগয়াস্থলে এইরূপ অন্যমনস্কতার সংবাদ পাইয়াও নরভুক শার্দ্দুল কেন যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়।

সন্দেহের স্থানটি প্রখর দৃষ্টির ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রসিক ব্যাধের স্তরে নামিয়া আসায় যুবরাজ ভিন্ন জীব হইয়া গিয়াছিলেন। হিংস্র পশুর মতই সন্দেহকে সাথী করিয়া, প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপ সংযত করিতেছিলেন। গমনকালীন কটিদেশের

তরবারির খাপ প্রতিনিয়ত শিলার সহিত সংঘর্ষিত হইতেছিল। অস্বস্তিকর শব্দে বিরক্ত হইয়া স্বগত বলিয়া ফেলিলেন,—এতগুলি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলে শিকারীকেই শিকার হইতে হয়। এই অবস্থায় কোন জন্তু নিকটে আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষাও অসম্ভব। বীরের রাজসিক শোভা তাঁহার নিকট বিড়ম্বনা হইয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়াই তরবারিসহ কটিবন্ধ খুলিয়া ফেলিলেন। লঘুভার হইয়া মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিলেন, বিশাল শার্দ্দূল, অতি নিকটেই বৃক্ষচ্ছায়ার তলদেশ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার গতি শিকারান্বেষীর নহে, পদক্ষেপ পলাতকের, যেন কোন দ্বন্দ্বে বিতাড়িত হইয়া নিরাপদ স্থান খুঁজিতেছে।

তূণ হইতে তীর সংগ্রহ করিয়া, সবে ধনুকের সহিত যোজনা করিয়াছেন, এমনি সময় শার্দ্দূল হুঙ্কার দিয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি জীব তীরবেগে বাঘের দিকে ছুটিয়া গেল—বরাহ বাঘকে আক্রমণ করিয়াছে, বীরের সম্বর্দ্ধনায় বীর আসিয়াছে, মল্লযুদ্ধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় কোন্‌টিকে মারা সঙ্গত, যুবরাজ স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, অকস্মাৎ বাঘ ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। বরাহ এইবার যুবরাজের দিকে ফিরিয়াছে, ভয়াল রূপ, চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া যাইবার ভঙ্গী দেখিয়াই যুবরাজ বুঝিয়াছিলেন, এই মুহূর্ত্তে তীর না চালাইলে, বধ্য ও ব্যাধের মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইবে। কালক্ষেপ না করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন। ত্রিফলা তীর বায়ুবেগে বরাহের মাথা বিদ্ধ করিয়া দিল। ফল হইল বিপরীত। অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী দাঁতাল যুবরাজের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যুবরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, অন্য শর তূণের ভিতরেই রহিয়া গেল। পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগের সময় পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। বরাহ কয়েক হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। অতি নিকটে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়া যুবরাজ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাংসল ভারী ওজনের পতন শব্দ শুনিলেন ঠিক তাঁহার পদতলে অথচ তাঁহার দেহে এতটুকুও আঘাত লাগিল না। চক্ষু উন্মীলিত করিতে দেখিলেন যূপকাষ্ঠে বধ্য জানোয়ারের মতই প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বে যাতনার নির্দ্দেশ দিয়া বরাহ অসাড় হইয়া গেল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে যুবরাজ আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা স্থায়ী হইল না। বরাহের মাথায় বিদ্ধ তীর ছাড়া আর একটি অস্ত্র দেখা যাইতেছে; হৃদয়ের কেন্দ্রে ক্ষুদ্রাকার বল্লম, বরাহকে একদিক দিয়া বিদ্ধ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে।

যুবরাজ রোষে আত্মসংযম হারাইলেন। কাহার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তাঁহার শিকারে ভাগীদার হইতে চায়? আদেশ করিলেন, কে আমার শিকারে বল্লম চালাইয়াছ, শীঘ্র বাহির হইয়া আইস অন্যথায় কঠোর দণ্ড ঘোষিত হইবে।

উত্তর যাহা আসিল তাহা নারী কণ্ঠের হাসি—অবজ্ঞার হাসি, তাহার পরেই শুনিলেন শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি। শব্দ দ্রুত অরণ্যের গভীরতার দিকে চলিয়া যাইতেছে। যুবরাজের

আদেশ লঙ্ঘন, তাহার উপর অবজ্ঞার হাসি, মল্লরাওয়ের আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল—পলাতকের গতি অনুমান করিয়া তীর চালাইয়া দিলেন। ঈপ্সিত স্থানেই তীর গিয়া আঘাত করিল, সঙ্কেত পাইলেন করুণ আর্তনাদে। নারীর কাতর স্বরে যুবরাজ সচকিত হইয়া উঠিলেন, কালক্ষেপ না করিয়া জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার মস্তিষ্কে বাতুলতার ক্রিয়া সুরু হইয়াছে। যে স্থানে দিবালোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ সেই গভীর অরণ্যে তিনি কিসের সন্ধানে চলিয়াছেন? স্থির চিন্তায় অসম্ভবকে সফল করার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের বাহিরে আসিবার জন্য ফিরিলেন। বাহিরে আলোর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। পদবিক্ষেপ মানুষের মত, নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত চলা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন, অনুসরণও সঙ্গে, সঙ্গে থামিয়া গেল। আবার আগাইতে লাগিলেন, পুনরায় অনুসরণকারীও চলিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন, কখনও এই জাতীয় অসুবিধার সহিত পরিচয় হয় নাই। যুবরাজ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন, মনে হইতে লাগিল তিনি অলৌকিক শক্তির কবলে পড়িয়া গিয়াছেন—অদৃশ্য অনুসরণকারী তাঁহাকে অজানা অনিশ্চিতের পানে টানিতেছে। অস্বাভাবিক প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি নিজের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। লোকালয়ে এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কেহ দেখিলে বাতুল বলিয়া মনে করিত।

আপন মনে কথা বলিতে বলিতে আরও খানিকটা অগ্রসর হইলেন। অনুসরণকারীর আর কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য নিজের কাছেই লজ্জিত হইলেন। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পড়িবার দরকার ছিল, কিন্তু যে আলোক এতক্ষণ বাহিরের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, স্থানে স্থানে চন্দ্রালোক তীক্ষ্ণধার বল্লমের ফলার মত উপর হইতে পত্রাবরণ ভেদ করিয়া মাটিতে বিদ্ধ হইয়া আছে, আলো জ্যামিতিক সরল রেখার মতই নিরেট ও সোজা। ছটার বিস্তার অত্যন্ত স্বল্প পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিতে হইলে, বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্য-বস্তু নিরীক্ষণ করিতে হয়। যুবরাজ ঐটুকু আলোর উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে লাগিলেন। কয়েক পদ মাত্র গিয়াছেন, পিছন হইতে কেহ সাবধান করিয়া দিল, "আর অগ্রসর হইও না, রাজগোক্ষুরা নূতন রাণীর সন্ধানে বাহির হইয়াছে।"

সতর্কতার বাণী থামিয়া গেল; বনভূমি নিস্তব্ধ, বায়ুর গতি প্রায় নিশ্চল, নিকটেই কোন স্থান হইতে গলিত মাংসের পূতিগন্ধ আসিতেছে—নিশ্চয় বাঘের দ্বারা নিহত কোন জানোয়ারের। অদূরে বিষাক্ত সরীসৃপের ফোঁসফোঁসানি, সামনেই বাঘ এবং পিছনে প্রেতলোকের বাণী। অপূর্ব্ব যোগাযোগ, মৃত্যু যেন সমারোহ করিয়া তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিয়াছে। স্থির

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিকটেই মাংসভুকের ভোজন-শব্দ শুনিবার প্রত্যাশায়। কোনরূপ সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বাঘ তাহা হইলে আহার পরিত্যাগ করিয়া মানুষের গতিবিধি জানিবার জন্য নিকটেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে ; জন্তুটির আক্রমণরীতি বরাহের মত নয়, সম্মুখ দ্বন্দ্বে তাহার অভ্যাস নাই, অকস্মাৎ আড়াল হইতে শিকার ধরাই তাহার নীতি। এইরূপ অবস্থায় বৃক্ষের উপর আশ্রয় না লইলে, বাঁচার আশা অনিশ্চিত। ভাগ্যগুণে নীচু ডাল নিকটে পাওয়ায়, গাছের উপরে উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হইল না। যেখানে আসন গ্রহণ করিলেন সেখানে বিশাল সরীসৃপ ব্যতীত অন্য কোন হিংস্র জন্তুর আসিবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি সতর্কতার প্রয়োজন থাকায় কোষ হইতে ছোরা বাহির করিয়া সামনের শাখায় বিদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

বায়ুর গতি থামিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিক হইতে ভারী ওজনের মত তাঁহাকে চাপিতে সুরু করিয়াছে। কোন দিকেই প্রাণের সাড়া নাই, রাত্রি নিঝুম। যে-কোন প্রকারের ঝিমানো অবস্থা যুবরাজের পক্ষে পীড়াদায়ক। যুবরাজের বাহিরের রূপ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে, তাঁহার ভিতরে একটি দুর্দ্দান্ত জীব বাস করে। বিপদের সহিত খেলায় তিনি সুনিপুণ। যে বিপদ সম্মুখ হইতে আসে তাহার সম্বর্দ্ধনায় যুবরাজকে কখনও কেহ পশ্চাৎপদ হইতে দেখে নাই। শিকারে বাহির হইবার সময় কখনও দেহরক্ষীকে সঙ্গে লন নাই।

যে সময় ঝিমানোর ভাব তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত সেই সময় চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হইল—শুনিলেন বীণার ঝঙ্কার, তৎসহ নারীর কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর। স্বরকে সুর অনুসরণ করিতেছে, সুর চলিয়াছে মূর্চ্ছনার দিকে। বসন্ত রাগ মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া তানকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। সুরের বিস্তার কখনও খাদে নামিতেছে, কখনও অন্তরার চড়া পর্দ্দায় উঠিয়া যাইতেছে। মূর্চ্ছনায় আবেষ্টনী মদির প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

সুর যুবরাজকে নেশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল, তিনি যেন মাতাল হইয়া উঠিলেন। ভয়াল অরণ্য তখন তাঁহার নিকট পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়াছে ; যুঁই, বেল, মল্লিকা, রজনীগন্ধা একত্রে গন্ধ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। অপূর্ব্ব রসকেন্দ্রে যুবরাজের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঝিমানোর কবল হইতে মুক্তি পাইয়া তরুশাখা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। সুর ও গন্ধকে অনুসরণ করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। গম্য স্থল নির্দ্দিষ্ট না হইলেও ক্রমে ক্রমে পথরেখা বাহির হইয়া আসিতেছিল। বহুক্ষণ চলিয়া অবশেষে তিনি যেন এক রহস্যলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকারে দৃষ্টি অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল, সামনেই দেখিলেন পাষাণের স্থাপত্য নিরেট, বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, প্রবেশ-পথও অদৃশ্য। এই সময় সুর থামিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে বহু নারীর মিলিত হাসির শব্দ শুনা যাইতেছে,

শ্লেষের অভিব্যক্তি? যুবরাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে নারী তাঁহাকে রসমদিরায় নিক্ষেপ করিয়া এই রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে যে-কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

হাসি আর শুনা যাইতেছে না। যুবরাজ দেয়ালের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ সুরু করিয়া দিলেন। কোন দিকেই প্রবেশপথ বা জানালার চিহ্নমাত্র নাই। এক বার দুই বার বহু বার ঘুরিলেন, কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। রোখ চাপিয়া গেল, পণ করিয়া বসিলেন প্রাতঃকালের প্রথম কাজ হইবে এই পাষাণস্তূপকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা। যে কয়টি হস্তী সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে কার্য্যটি সম্পন্ন করা অসম্ভব নয়। এই সঙ্কল্প করিয়া ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় বীণার তারে পুনরায় ঝঙ্কার উঠিল, শব্দ যেন ভূগর্ভ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিতেছে। বদ্ধ বায়ু ও অভেদ্য পাথরকে অতিক্রম করিয়া যে ধ্বনি উপরে উঠিয়া আসিতে পারে তাহার সহিত মরলোকের কোন যোগ থাকা কি সম্ভব? যুবরাজের মত সাহসী পুরুষেরও মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তবে কি এই স্থাপত্য কাহারও সমাধি? লোকান্তরিতের অধিষ্ঠানস্থল? যুবরাজ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, স্থির হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ঘটনার ক্রমবিবর্ত্তন দেখিবার জন্য। নূতন কিছু ঘটিল না। যুবরাজ ইতিমধ্যে অনেকটা ধাতস্থ হইয়া আসিয়াছিলেন। উত্তেজনা ও ভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজিতে লাগিলেন। এইটুকু বুঝিয়াছিলেন রাত্রিবাস অরণ্যের ভিতরেই করিতে হইবে। দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পথ খুঁজিতে যাওয়াটা যতই সাহসের হোক, সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সমাধির উপরদিকে তাকাইলেন—সেখানে দৃষ্টি চলে না। অতিকায় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সমাধিস্তূপকে এমন ভাবেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, স্থাপত্যের শেষ দেখিবার উপায় নাই। অগত্যা গাছের উপরেই উঠিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, কখনও কখনও বন্য কুক্কুট চীৎকার দ্বারা অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। উষা-সমাগমের আভাস পাইয়া, যুবরাজ তন্দ্রার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছিলেন—নীচের দিকে দৃষ্টি পড়িতে মনে হইল যেন কেহ সমাধির ভিত্তিতল হইতে মাটির উপর উঠিয়া আসিতেছে। যে উঠিয়া আসিতেছিল, সে নারী, অবগুণ্ঠনবতী, দক্ষিণ হস্তে তাহার বল্লমের মত একটি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র। নারী উপরে উঠিয়া যে ভাবে সমাধির আশেপাশে ঘুরিতে লাগিল তাহাতে মনে হইল কিছু বা কাহাকেও খুঁজিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নারী স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং উত্তরীয় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া নীচু হইয়া দেয়ালে ঠোকা মারিল—সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালগাত্র হইতে একটি দ্বার খুলিয়া গেল। নারী ভিতরে ঢুকিয়া তখনই বাহির হইয়া আসিল। বল্লম প্রাচীরগাত্রে ঠেসান দিয়া চক্‌মকির সাহায্যে ছিন্ন বস্ত্রে অগ্নি-সংযোগ করিল—সঙ্গে সঙ্গেই আগুন

সহজেই ধরিয়া উঠিল। জ্বলন্ত অগ্নি সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেই পতনস্থলে মুহূর্তে আগুন লাগিয়া গেল।

আগুন ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তার করিয়া চলিল, দেখিতে দেখিতে একটি শুষ্ক বনলতা সহজেই অগ্নিকে বৃক্ষচূড়ায় উঠাইয়া দিল। বনে আগুন ছড়াইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই। যুবরাজ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া থাকিলে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। নারী মানবী হউক বা ডাকিনী হউক, ঐ সমাধির ভিতর আশ্রয় লওয়া উপস্থিত বাঁচিয়া যাওয়ার একমাত্র পন্থা। উপর হইতে আদেশ করিলেন বল্লম দূরে ফেলিয়া দাও অন্যথায় তীর দিয়া বিদ্ধ করিয়া ফেলিব।

নারী হয়ত সন্ধানের বস্তু দেখিতে না পাইয়া অন্যমনস্ক ছিল। বৃক্ষচূড়া হইতে অপ্রত্যাশিত আদেশ শ্রবণে তাহার কিঞ্চিৎ সচকিত ভাব দেখা গেল, ক্ষণিকের ত্রস্ততা—পরক্ষণেই নারী বল্লম দেয়াল হইতে তুলিয়া দৃঢ় মুষ্টির ভিতরে ধরিল এবং উপর দিকে তাকাইল। মুখে ক্রূর হাসির রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূর উত্থান-পতনের সহিত গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম ভাব ধারণ করিয়াছে—নারী যেন দংশনোদ্যতা নাগিনী। অগ্নিশিখার আভা তার সর্ব্বদেহের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে—যুবরাজ দেখিলেন, পরিপূর্ণযৌবনার গঠনশ্রীতে অবর্ণনীয় রেখার সমাবেশ, যেন ওস্তাদ শিল্পীর সুনিপুণ কারিগরির চরম সফলতা। প্রতিটি অঙ্গ সামঞ্জস্যের সীমায় আবদ্ধ হইয়া নিজের রূপেই অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। অগ্নি কামনার ইন্ধনে প্রজ্বলিত, রূপবহ্নি মোহমুগ্ধদের আত্মোৎসর্গের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আকর্ষণ এমনই প্রবল যে, পরিত্রাণ-লাভ সাধ্যের অতীত। যুবরাজ রূপবহ্নির ভিতর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার যাবতীয় অস্ত্র বর্জ্জন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অতি নিকট হইতে দৃষ্টির দ্বারা নারীর সর্ব্বদেহ স্পর্শ করিলেন, আশা আর মিটিতে চায় না। রূপের সম্মোহিনী শক্তিতে যুবরাজ নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন, আত্মাভিমান নারীর পদতলে অর্ঘ্য দিয়া কৃপাপ্রার্থীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। নারীর নয়নযুগলে যে বাণ রক্ষিত ছিল তাহার ব্যবহারে যুবরাজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল। এমন পুলকমিশ্রিত বেদনা জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই।

অকস্মাৎ জঙ্গলের আগুন নিবিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অতর্কিতে পিছন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। যুবরাজ আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া বাধা দিবার অবসর পাইলেন না। কাজেই তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে আততায়ীদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। হাত ও পায়ের বন্ধন শেষ হইতে, উষ্ণীষ খুলিয়া দৃষ্টিও ঢাকিয়া দিল। অতঃপর তাহারা যুবরাজকে বহন করিয়া নীচের দিকে নামিতে লাগিল। শূন্যে থাকিয়াই যুবরাজ অনুভব করিতে লাগিলেন সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথ ফুরাইতে আর চায় না। হঠাৎ একটি ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলেন, লোকগুলির চলা যন্ত্রবৎ থামিয়া গেল।

তাহারা তাঁহাকে মাটিতে দাঁড় করাইয়া দিল—পরক্ষণেই শুনিলেন—কোন নারী বলিতেছে—দক্ষিণ মণ্ডড়ায় পঞ্চম বট বৃক্ষের দ্বার তোমাদের পাহারায় রহিল—"রাজকুমারীর এই আদেশ।" লোকগুলি কোন উত্তর দিল না, যেন নিঃশব্দে চলিয়া গেল। যুবরাজ একই স্থলে দাঁড়াইয়া আছেন—নারী আসিয়া তাঁহার হাতের ও পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলিল—আমার হাত ধরুন, বিহার-গৃহে লইয়া যাইতেছি—চোখের বাঁধন সেইখানে খুলিয়া দেওয়া হইবে। আপত্তি অর্থহীন জানিয়াই যুবরাজ নারীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার আঁকাবাঁকা পথ—তবে সিঁড়ি ওঠা-নামার প্রয়োজন হয় নাই—অবশেষে যেখানে আসিয়া থামিলেন, সে স্থানটি মধুর গন্ধে ভরপুর হইয়া ছিল, অজানা গন্ধ ধীরে অবগুণ্ঠনবতীর দিকে মন ফিরাইয়া দিল, ঠিক এই গন্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য পাইয়াছিলেন—যখন বল্লমধারিণী নারী তাঁহাকে নয়ন-বাণে বিদ্ধ করিতেছিল। এই সময় পথপ্রদর্শিকা নারী অগ্রসর হইয়া আসিল তাঁহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিবার জন্য। বস্ত্রের খস খস শব্দ যখন নিকটবর্তী হইতেছিল, তখন যুবরাজের চিত্তচাঞ্চল্য চরমে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনাকে কঠোর ভাবেই সংযত করিয়া রাখিলেন। অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীকে চিনিবার জন্য চোখের বাঁধন উন্মোচনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চক্ষু উন্মীলিত করিতে দেখিলেন, তিনি গভীরতম অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছেন। মাথার ভিতর যেন চক্র ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইতে আলোর সন্ধান পাইতে লাগিলেন। স্বল্প সময়ের ভিতর দৃশ্যস্থল আলোকিত হইয়া উঠিতে লাগিল; তখন কোন মানুষই তাঁহার নিকটে নাই।

যুবরাজ দেখিলেন—সুসজ্জিত প্রশস্ত ঘর, এক দিকে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। যে পালঙ্কের উপর তাহা স্থান পাইয়াছে, তাহা স্বর্ণময় কারুকার্যখচিত। পদতলে বহু মূল্যবান গালিচা। দেয়াল খোদিত করিয়া কঠিন পাথরকেই নারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে। সুকুমার কান্তি লইয়া মূর্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। গঠন এমনই সজীবতায় পূর্ণ যে মনে হয়, যে-কোন মুহূর্তে পাথরের বাঁধন বিদীর্ণ করিয়া দেয়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে। বস্ত্রাবরণের আভাস যেটুকু আছে তাহাও কারিগরি কৌশলে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। স্বচ্ছ আবরণী রূপকে অধিকতর চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছে।

পালঙ্কের পার্শ্বেই খর্ব পিঠিকা, তাহার উপর স্বর্ণপাত্র, পানীয় বস্তুর আধার। প্রকোষ্ঠে কোন প্রদীপ নাই তথাপি কেমন করিয়া আলোক-রশ্মি প্রাচীরগাত্রে প্রতিফলিত হইতেছে। যুবরাজের দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া পাষাণ মূর্তিগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। দৃষ্টি আবিষ্কার করিল উহাদের ভিতর একটি অবগুণ্ঠিতার প্রতিমূর্তি। মূর্তি নড়িতেছে, মানুষ হইয়া গিয়াছে—দেয়াল ছাড়িয়া গালিচায় পা দিয়াছে। ক্ষণিকে যুবরাজের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। এই সময় আলোক-

রশ্মি ঝাপসা হইতে হইতে এমন একটি আলো-আঁধারিতে আসিয়া থামিয়া গেল যে, দৃষ্টিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে স্পর্শের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।

যুবরাজ যখন নিজেকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন নবজাগরিত দিবালোক অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে ঘরের চিহ্নমাত্র নাই, পাশ ফিরিতে চমকাইয়া উঠিলেন। অতিকায় বাঘ তাঁহার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া আছে। মুহূর্ত্তে যেন তাঁহার রক্ত চলাচল থামিয়া গেল। অতি সন্তর্পণে ঘনিষ্ঠতা হইতে সরিয়া আসিলেন, দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, শার্দ্দূলকে ঠিকই দেখিয়াছিলেন, তবে তাহা অসাড়, বল্লমের আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। পরিচিত অস্ত্রের পুনঃপ্রয়োগ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঠিক বরাহ যে ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রথায় বাঘও নিহত হইয়াছে।

গত রাত্রের ঘটনাগুলি অগোছাল অবস্থায় মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—প্রাণময়ী পাষাণ তাঁহার সামনে শক্তির প্রতীক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শক্তির নিকট নত হইতে পারায় আনন্দ বোধ করিতেছেন, হৃদয়ের গোপন কথা স্বীকার করিতেও আপত্তি নাই। যে মানুষ নারীকে ক্ষণিকের ভোগ্যা ব্যতীত অন্য কিছু ভাবেন নাই, যে মানুষ নারীর প্রেমকে কেবল বিপজ্জনক ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই মানুষ এক রাত্রির দীক্ষায়, পুরোপুরি বদলাইয়া গিয়াছেন, দাতা হইয়া উঠিয়াছেন কৃপাপ্রার্থী। অবগুণ্ঠনবতীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্কল্পকে তখনকার মত স্থগিত রাখিয়া শিবিরে ফিরিলেন।

যুবরাজ যখন নিজের আস্তানায় আসিয়া পড়িয়াছেন তখন দেখিলেন শান্ত্রী পাহারা ব্যতীত সকলেই প্রাতঃনিদ্রায় অচৈতন্য। প্রথমে ঢুকিলেন সর্ব্বাধিকারী বীরভদ্রের আস্তানায়। প্রবেশপথেই যে সব নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে প্রাতঃনিদ্রার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। চতুর্দ্দিকে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রদর্শনী এমনই বিকট হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁবুর ভিতরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। এই নরককুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তিনি ত্বরিতপদে আপন শিবিরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অপরাহ্ণ সময় পার হইতে যুবরাজের নিদ্রাবসান হইল। শিবিরের বাহিরে বীরভদ্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। যুবরাজ ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত পত্র যুবরাজের হাতে দিলেন। পত্রের বহিরাবরণ পরিচিত গন্ধ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বীরভদ্র আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রেম বড় সাংঘাতিক ব্যাধি, ঐ ছোঁয়াচে রোগ হইতে এতকাল তিনি যুবরাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ব্যাধিটি কি অবশেষে যুবরাজের মধ্যেও সংক্রামিত হইল।

যুবরাজ পত্র খুলিলেন—পাঠকালীন তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যেন

প্রতিটি ছত্র চীৎকার করিয়া তাঁহাকে উত্তেজক বার্ত্তা শুনাইতেছে। যুবরাজের মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বীরভদ্র সবই লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবরাজকে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত দেখিয়া বিনীত ভাবে জানাইলেন, অধীনের স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিয়া পত্রটি আমাকে পড়িতে দিন, দেখি কোন প্রতিকারের সন্ধান পাইতে পারি কিনা?

যুবরাজ তাঁহার হাতে পত্র দিবার উপক্রম করিয়াও শেষে ক্ষান্ত হইলেন। বক্তব্যে যে রসিকতা ছিল তাহার অর্থ জটিল নয়। পত্র নিজের কাছেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, পত্রবাহককে এখুনি উপস্থিত কর।

বীরভদ্র মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, ধর্ম্মাবতার, যাহারা পত্র আনিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে।

যুবরাজ অনেকক্ষণ কোন উত্তর না দেওয়ায় বীরভদ্র জানাইলেন, একটি আরজি আছে।

মল্লরাও বিরক্ত হইয়াছিলেন, উত্তর দিলেন, এখুনি না বলিলে নয়?

বীরভদ্র—ব্যাপারটা লৌকিকতার সহিত জড়িত তাই এখুনি শেষ করিবার আজ্ঞা কামনা করি।

মল্লরাও—বল।

বীরভদ্র—আমরা যে জঙ্গলে আসিয়াছি, তাহা হিন্দুপুর রাজ্যের অধীনে। প্রবেশের জন্য কোন আদেশ লওয়া হয় নাই, তথাপি রাজকুমারী—এখানকার ভাবী রাণী, বহুবিধ উপহার পাঠাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, উপহারের সঙ্গে কতকগুলি অস্ত্রও আসিয়াছে, দুইটি আপনার নামাঙ্কিত ত্রিফলাবিশিষ্ট তীর এবং অপর দুইটি কারুকার্য্যখচিত ক্ষুদ্রাকার বল্লম—দেখাইতেছি। বলিয়া, দ্বারীকে অস্ত্র দুইটি আনিবার আদেশ দিলেন। দ্বারী অস্ত্রগুলি আনিলে যুবরাজের সামনে ধরিয়া জানাইলেন, এইগুলি লইয়াই ফাঁপড়ে পড়িয়াছি। এই ধরণের অস্ত্র সাধারণতঃ রাজকুমারীরা মৃগয়ায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুর্দ্দান্ত সাহসী ও অব্যর্থ লক্ষ্যভেদীকে এইরূপ অস্ত্র উপহার দেওয়ার কোন অর্থ বুঝিতেছি না। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই বল্লম, তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, আপনার সম্বন্ধে ত ওকথা অবান্তর।

মল্লরাও ভাবিতে লাগিলেন, সখা দেখিতেছি সন্ধান না করিয়াই বিদ্রূপের পুঁজি বাড়াইতেছে! সপ্রশ্ন দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর পড়িতে তিনি বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম, ঐ বল্লম লইয়া রাজকুমারী যদি ··কথাটা শেষ করা হইল না, সহসা চন্দ্রগিরির কুমার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সুগোল নধরকান্তি, যুবরাজের মান্য অতিথি। মৃগয়ায় তাঁহার তেমন প্রবৃত্তি নাই, আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ বেশী। সংক্ষেপে তিনি বিলাসপ্রিয়।

কুমার বেসামাল অবস্থায়ই ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। চলার শ্রী দেখিয়া মল্লরাও বীরভদ্রকে

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ঘণ্টাচারেক রাগিণী আলাপের পর মল্লরাও দুঃখের দরদী বীণাকে সযত্নে যথাস্থানে রাখিয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অস্ফুট চাঁদের আলোয় চারিপাশের দৃশ্য আবছা দেখাইতেছে। নিকটেই স্রোতস্বিনী হইতে ক্ষীণ কুল কুল ধ্বনি আসিতেছিল, যুবরাজ রাজকুমারী-প্রদত্ত বল্লম লইয়া ঐ দিকে চলিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর পত্রে শ্লেষপূর্ণ উক্তিগুলি যেমন এক দিকে তাঁহার আত্মাভিমানকে আহত করিতেছিল অন্য দিকে তেমনই এই পত্রপ্রেরিকা কেমন প্রকৃতির নারী তাহা জানিবার জন্য যুবরাজ অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে বহু বার পাষাণ-মূর্ত্তির ভিতর রাজকুমারীকে আবিষ্কার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। প্রয়োজনীয়তার তাগিদে অনেক কিছুই তিনি কল্পনায় গড়িয়া তুলিতেছিলেন। অবশেষে যুবরাজ নিজের সম্বন্ধে একটি সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহা নির্ম্মম হইলেও একান্ত সত্য,...তিনি প্রেমে পড়িয়াছেন ঐ পাষাণীর সহিত। লোকে জানিলে অবাক হইবে, তাঁহাকে বাতুল ভাবিবে, কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধান।

চিন্তাস্রোত যে সময় তাঁহার মনকে অকূলের দিকে টানিতেছিল সেই সময় তাঁহার পিছনে কোন ধাতব দ্রব্যের পতনের শব্দ শুনিলেন। অরণ্যে সতর্কতা শিকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক হইয়া গেলেন, পুনরায় বল্লমের আবির্ভাব! অস্ত্র নৃত্য সুরু করিয়াছে। কোন জন্তুর অস্তিত্ব নাই, বল্লম প্রায় খাড়া হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। চলন্ত বল্লম লক্ষ্য করিয়াই তাহার গোড়ার দিকে অস্ত্র চালাইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথম অস্ত্রটির অগ্রগতি থামিয়া গেল, কিন্তু ভিন্ন অস্ত্র তখন নাচিতেছে। যুবরাজের অস্ত্র নরম মাটি পাওয়ায় বল্লম মজবুত হইয়া নিজেকে দাঁড় করাইয়াছিল। অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করিলেন যে প্রাণী বল্লমকে নাচাইতেছিল সে কোন বৃহৎ সরীসৃপ না হইয়া যায় না। লক্ষ্যভেদের সফলতায় শিকারীর কৌতূহল এমন একটি স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল যে কি মারিলেন পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

নিকটে আসিতে দেখিলেন, তাঁহার অনুমান কিছুমাত্র ভুল হয় নাই, অতিকায় ময়াল তাঁহাকেই ভক্ষণীয় ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কে তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইল? প্রথম নিক্ষিপ্ত বল্লম পরীক্ষার জন্য সরীসৃপের আরও নিকটে গেলেন, সাপের মাথা যুবরাজের দিকে ফিরিল, ময়ালের বাকি দেহটা যে তখন মাটিতে গাঁথা অস্ত্রকে ভাঙিয়া ফেলার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল সেদিকে যুবরাজ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই, উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল তাঁহাকে অস্ত্র-পরীক্ষায় সব কিছুই ভুলাইয়াছিল। নিকটে আসিতে গোড়ালিতে ঠাণ্ডা কিছুর ছোঁয়া লাগিল। সতর্কতাকে কৌতূহল বহুদূরে সরাইয়া দিয়াছে। ছোঁয়ায় চাপ পড়িতে লাগিল, তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি অস্ত্র-পরীক্ষায় ব্যস্ত, হঠাৎ সাপের দেহ দুইটি পায়েই বেষ্টন করিয়া ধরিল; যুবরাজ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বাঁধনের চাপ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। হাড়ে

হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়া গিয়াছে, অসহ্য যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া আসার উপক্রম; ইতিমধ্যে আর একটি বেড় আসিয়া পড়িল তাঁহার কোমরের উপর। নূতন বাঁধন তাঁহাকে উপুড় করিয়া ফেলিল, সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবার ক্ষমতা নাই, যেটুকু আওয়াজ গলা হইতে বাহির হইল তাহা শ্লেষ্মাজড়িত কাশির মত ঘড়ঘড়ানি শব্দ। চাপ বাড়িয়া চলিয়াছে, শেষে জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া গেল।

পরের দিনের ঘটনা—যুবরাজের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তিনি শিবিরে শুইয়া আছেন, বৈদ্য গোড়ালিতে ঔষধের প্রলেপ লাগাইতেছেন। বীরভদ্র নিকটেই দাঁড়াইয়া। মল্লরাও প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল।" বীরভদ্র উত্তর দিলেন, "রাজকুমারীর বল্লম।" তাহার পর বিশদ বর্ণনায় জানাইলেন, অতিকায় অজগর যুবরাজকে বাঁধিয়া হাড়গোড় চূর্ণ করিবার চেষ্টায় ছিল এমন সময় কেহ সাপকে বল্লমের সাহায্যে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। যে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াই কাজটি করিয়াছে।

যুবরাজ—শিবিরে খবর দিল কে?

বীরভদ্র সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন, খবর পাইয়াই আমরা এই দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, সংবাদদাতাকে সনাক্ত করিয়া রাখিবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

যুবরাজ—দিক নির্ণয় করিলে কেমন করিয়া?

বীরভদ্র—এদিকে ঝরণা তো একটিই এবং আমাদের শিবিরের ঠিক পিছনে।

যুবরাজ বৈদ্যকে বাহিরে যাইবার আদেশ দিলেন। বীরভদ্র পর্দা ফেলিয়া নিকটে আসিতে যুবরাজ অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, সখা আমাকে দগ্ধাইয়া মারিও না, বল কে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

বীরভদ্র উত্তর দিলেন; কে আপনাকে বাঁচাইয়াছিল বাস্তবিকই জানি না, তবে যিনি সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি নারী। ইহার বেশী জানিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ আমি নিজে জানিতে পারি নাই কে তিনি। সংবাদদাতাকে অধিক প্রশ্ন করিবারও সময় ছিল না, কারণ তখন আপনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে।

সপ্তাহখানেক কাটিয়া গেলে যুবরাজ চলাফেরা করিবার আদেশ পাইলেন। পায়ের হাড় না ভাঙ্গিলেও মাংসপেশী রীতিমত জখম হইয়া গিয়াছিল—সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে।

যে সময় যুবরাজ পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী, সেই সময় শিবিরে বিচিত্র ঘটনা ঘটিতে লাগিল। দুর্ঘটনার সংবাদ কেমন করিয়া হিন্দুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল—ফলে মহারাজ স্বয়ং

আসিয়া যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন—তাহার পর প্রত্যহ রাজার প্রেরিত অশ্বারোহী তাঁহার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাই শেষ নয়—মহারাজা বীরভদ্রের নিকট প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র কন্যা, হিন্দুপুরের ভবিষ্যৎ রাণীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইলে হিন্দুপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান। প্রস্তাবটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যুবরাজের নিকট পেশ করিতে এক কথায় তিনি "না" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। জীবন্ত পাষাণকে তিনি দেহমন সবকিছুই অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অন্য পাত্রীর স্থান নাই। শুধু অসম্মতি জানাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বীরভদ্রকে উপদেশ দিলেন চন্দ্রগিরির কুমারের সহিত রাজকন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতে।

মল্লরাও চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইতেই প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাহির হইতে লাগিলেন—প্রেম-দীক্ষাদাত্রীর সন্ধানে। এক দিন দুই দিন করিয়া সময় কাটিয়া যাইতেছিল—সেই পাষাণময় সমাধির আর সন্ধান পাইলেন না।

সেদিন প্রাতে অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্লান্তি দূরীকরণার্থে বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। সহসা আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গুরুগম্ভীর নিনাদের সহিত মুষলধারায় বৃষ্টি নামিল। বিশ্রামের স্থান পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন—সামান্য চেষ্টাতেই বিরাটকায় এক বটবৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেল। যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন সে জায়গাটি শুধু অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কারই নয়—মানুষের পদচিহ্নও সেখানে রহিয়াছে। পদচিহ্ন এত স্পষ্ট যে অনুমান হয় একটু আগেই এখানে কেহ দাঁড়াইয়াছিল। যুবরাজ সামনে মুখ রাখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিলেন। হঠাৎ বৃক্ষমূলে দরজা খোলার আওয়াজ শুনিলেন—মরিচা পড়া কব্জার ঘর্ষণ। পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই বৃক্ষত্বকে আচ্ছাদিত কপাট সামান্য খুলিয়াছে—পাল্লায় নরম আঙ্গুলের ডগা দেখা যাইতেছে। যে দরজা খুলিতেছিল সে নিশ্চয়ই যুবরাজকে দেখিতে পায় নাই—আঙ্গুল দেখিয়াই বুঝা যায় তাহার মুখ যুবরাজের দক্ষিণ দিকে। এই সময় যুবরাজের মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি আসিল। তিনি এক হাতে দরজার উপর চাপ রাখিয়া অপর হাত দিয়া ভিতরের মানুষটির কব্জি ধরিয়া টান দিলেন। স্বল্প চেষ্টাতেই আঙ্গুলের মালিককে বাহির হইয়া আসিতে হইল। যে আসিল, সে নারী—লজ্জাবনতা। জোর করিয়া মুখ তুলিয়া ধরিতে দেখিলেন, ভুল করিয়াছেন। যাহাকে খুঁজিতেছিলেন, এ সে নয়। যুবরাজ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর দেবী, কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় গভীর অরণ্যে এই বিচিত্র গুপ্তস্থানে তুমি কি করিতেছ। দরজার গহ্বরে দেখিতেছি সুড়ঙ্গ-পথ; পথটি কোথায় গিয়াছে বলিতে পার?"

নারী জোড়হস্তে বলিল, আপনার সন্ধানেই আমি রাজকুমারীর আদেশে আসিয়াছি—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মাটির নীচে রাজকুমারী ? তবে কি যাহাকে খুঁজিতেছেন সেই রহস্যময়ী বনচারিণীই যুবরাজকে স্মরণ করিয়াছে ? সন্দিগ্ধ পুলক যুবরাজের মনকে আগুয়ান করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, চল, আমি প্রস্তুত। রমণী জানাইল তৎপূর্ব্বে রাজকুমারীর একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে। আপনার চোখ বাঁধিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে।

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, চোখ ত বাঁধিবে তুমি, ঐ নরম আঙ্গুলের বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে কতক্ষণ, মাঝ রাস্তায় এইরূপ ইচ্ছা হইলে তোমাদের গোপন পথ ত অজানা থাকিবে না।

রমণী—গোপন পথ একটি মাত্র, কিন্তু মাটির তলায় সুড়ঙ্গ যে অনেক আছে। 'রাজকন্যা এই সুড়ঙ্গপথ দিয়াই বরাহ ও বাঘের সন্ধানে ঘুরিয়া থাকেন। এই জঙ্গলে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গগুলি পৌঁছাইয়া না দিতে পারে। তা ছাড়া আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে আপনি বাহির হইবামাত্র আপনার জানা পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, প্রয়োজন হইলে পথের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এইখানেই সাবধানতার শেষ নয়, আদেশের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করিলেই, আপনার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে। কয়েক দিন আগেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন।...একটু থামিয়া রমণী আবার বলিতে লাগিল ঃ

আসলে এই সুড়ঙ্গ-পথগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। স্থলপথে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে জঙ্গল অতিক্রম না করিয়া উপায় নাই, এবং জঙ্গলে বিপক্ষের সেনা ঢুকিলে আমাদের যোদ্ধারা অলক্ষ্যে থাকিয়া কি ভাবে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিবে সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এই সুড়ঙ্গের সাহায্য ছাড়া রাজকুমারী আপনাকে অজগরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমণী ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাতে যুবরাজের মোটেই চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল না। তিনি পুনরায় রাজকুমারীর প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের রাজকুমারীর কি মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে ? আমি যেন তাহা দেখিয়াছি।

রমণী—আমি যাহা বলিলাম তাহার অধিক জানিতে হইলে রাজকুমারীকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন ভিতরে আসুন।—তাহার কথামত যুবরাজ বৃক্ষগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, রমণী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গাঢ় অন্ধকার, তথাপি রমণী তাঁহার চোখ বাঁধিতে আরম্ভ করিল, সুকোমল স্পর্শ যুবরাজের মন্দ লাগিতেছিল না।

বন্ধন শেষ হইতে রমণী যুবরাজের হাত ধরিয়া বলিল—চলুন। সেই আঁকা-বাঁকা পথ, সেই সিঁড়ির ধাপ। যখন চলা থামিল তখন রমণী হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি রাজকুমারীকে সংবাদ দিয়া আসি। রমণী চলিয়া গেল, কিন্তু ফিরিল না। যুবরাজ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, স্বহস্তেই বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে

যাইতেছিলেন। হঠাৎ কপালে নরম আঙ্গুলের ছোঁয়া পাইলেন। চোখের বাঁধন খুলিয়া গেল, কিন্তু যে খুলিল, তাহাকে দেখা যায় না, জমাট অন্ধকারে দৃষ্টি অবরুদ্ধ। যে চোখের বাঁধন খুলিয়া দিতেছিল, সে নিঃসন্দেহ নারী—হাতের তেলোর স্পর্শ হইতেই তাহা অনুমান করা চলে। ধীরে ধীরে নারী অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, নারীর তপ্ত নিঃশ্বাস যুবরাজ গণ্ডের অতি নিকটে অনুভব করিতেছেন। এই সময় পূর্ব্বেকার মতই ধীরে আলো আসিতে লাগিল। যাহাকে দেখিলেন, তাহার সহিত পাষাণ-মূর্ত্তি বা পথপ্রদর্শিকা রমণীর কোন সাদৃশ্য নাই। যে উত্তেজনা এতক্ষণ যুবরাজকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ক্ষণিকে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন তিনি প্রবঞ্চনার মায়াজালে আটকা পড়িয়াছেন। নারীর প্রেমকে তিনি চিরকাল ক্রীড়ার বস্তু ভাবিতেন। সেই নিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটাইল অপরিচিতা প্রেমিকা। অকস্মাৎ যুবরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রমণীকে আদেশ দিলেন—তোমাদের রাজকুমারীকে ডাকিয়া দাও, তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভের আশাতেই এখানে আসিয়াছি। রমণী পরম নির্লিপ্ততার সহিত উত্তর দিল—রাজকুমারী প্রমোদ-বিহারে ব্যস্ত আছেন, এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোন আশা নাই। আপনাদের চন্দ্রগিরির কুমার নৃত্যশালায় উপস্থিত।

যুবরাজের হৃদ্‌গহ্বরে একটি বারুদখানা লুকানো থাকিত; ঠিক তাহার মাঝখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গিয়া পড়িল। বিনা শব্দে বিস্ফোরণ ঘটিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন—প্রমোদ-বিহারের সঙ্গী হইবার জন্য নিত্য নব নব পুরুষ আসিয়া থাকে নাকি ?

রমণী সে প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়া ঘোরালো ভাবে বলিল—আপনার অভ্যর্থনার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। যুবরাজ বলিলেন—প্রবঞ্চনা তোমাদের অভ্যর্থনার অঙ্গ জানিলে এখানে আসিতাম না; এখন বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করা হইবে। উত্তর কিছু আসিল না, কিন্তু ঘর মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া গেল, পুনরায় নারীদেহের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন, স্খলিত বাক্যে নারী ব্যাকুল ভাবে আত্ম-নিবেদন করিয়া চলিয়াছে।

যুবরাজ ঈষৎ বলপ্রয়োগেই নারীর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন। স্থানটি তাঁহার নিকট নরককুণ্ড সামিল হইয়া উঠিয়াছিল। নারীর কবল হইতে মুক্তি পাইয়াও নিজেকে নিষ্কণ্টক ভাবিতে পারিতেছিলেন না। যে-কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। এই সময় ঘরের ভিতর সুমিষ্ট পরিচিত গন্ধ বহিতে সুরু করিল। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় যে চিত্তচঞ্চলকারী মাদকতা অনুভব করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার কোন প্রভাব নাই—বরং একটি অপরূপ স্নিগ্ধতা অনুভূত হইতেছে। গন্ধের সহিত আলো আসিতে লাগিল—তাহার সহিত নূপুরের রিমিঝিমি রব ধ্বনিত হইতে লাগিল। ধ্বনি নর্ত্তকীর পদবিক্ষেপ হইতে আসিতে-

ছিল না। মনে হইল একাধিক নারী যেন তাঁহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। যুগপৎ কুতূহলী ও সতর্ক হইয়া যুবরাজ নূতন ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ দেখিলেন সখীপরিবেষ্টিতা হইয়া মন্থর গমনে মাল্যহস্তে আসিতেছেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী—যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পাষাণমূর্ত্তিই সচল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে চন্দনের টিকা, বাহুতে বাজুবন্ধ, অঙ্গবাসে রাঙা জবার রং উপচাইয়া পড়িতেছে, যেন কোন পবিত্র উৎসব-সম্মেলনে চলিয়াছেন। একান্ত বাঞ্ছিতার নব রূপ দর্শনে যুবরাজের মন গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

রাজকুমারী যুবরাজের নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পদধূলি মাথায় লইয়া মালা যুবরাজের গলায় পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ প্রথমে এমনই বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন যে, প্রবঞ্চনা, আত্মাভিমান ইত্যাদির কথা মনে আসে নাই। কিন্তু নারী পুরুষের পাদস্পর্শ করিয়াছে—যুবরাজের ক্ষুণ্ণ পৌরুষ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠিল, রাজকুমারীর পত্রের শ্লেষ-বাণী মনে করাইয়া দিল—"তোমার সময় আসিয়াছে, যা-কিছু বলিবার আছে প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ কর।" যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, মালাটা কি চন্দ্রগিরির কুমার ব্যবহার করেন নাই বলিয়া আমার জন্য লইয়া আসিয়াছ?

যুবরাজের প্রশ্ন শুনিয়া রাজকুমারীর মাথা নত হইয়া গিয়াছিল। অবনত মস্তকেই জানাইলেন, এই সুড়ঙ্গ-পথে যুবরাজ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ জীবন্ত অবস্থায় প্রবেশাধিকার পায় নাই। আমার সখীরা আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিল, আমারই আদেশে। প্রভুকে যেদিন দেখিয়াছি, সেই দিনই নিজেকে আপনার দাসী ভাবিয়াছি, আপনার চরণতলে দেহ ও মনকে অর্ঘ্য দিয়াছি। আমাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা আপনার ইচ্ছা।

মাল্যদানের পরই সখীরা ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। যুবরাজের আত্মাভিমান তখনও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। পত্রের শ্লেষপূর্ণ কথাগুলি তখনও অন্তর জ্বালাইতেছিল, বলিলেন—তোমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমাকে কুৎসিত প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করিলে কেন? রাজকুমারী উত্তর দিলেন, প্রভু, আপনি যে ভোগী, ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া যদি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও দূষণীয় বলিতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে আপনাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম সেই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মতঃ আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং স্ত্রী হইয়া যদি কামনা-উদ্দীপক ছলা-কলার আশ্রয় লইয়া থাকি তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত বলেন কেমন করিয়া? আপনাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় সখী দুইটি ব্যর্থ হওয়ায় আপনার প্রেমের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছি। চন্দ্রগিরির কুমারের জন্য উহাদিগকে আপনার শিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছি।

যুবরাজ তুষ্ট হইয়াই বলিলেন, এখন আমাকে যাইতে দাও, তাহা না হইলে কাল সকালে ঐ

কুমারের সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে উপস্থিত হইবে। কথা শুনিয়া রাজকুমারী কঠোর হইয়া উঠিতেছিলেন—সুস্পষ্ট আলোকেই যুবরাজ উৎকোচ দিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

শিবিরে পৌঁছিয়া যুবরাজ শুনিলেন, কুমারের আস্তানায় দুইটি নূতন নর্ত্তকী আসিয়াছে। যুবরাজ ভাবিয়া দেখিলেন, রাজকুমারীর সহিত কুমারের বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে চলিয়া গিয়া থাকিলে পরিবর্ত্তন লজ্জাকর ব্যাপার। প্রস্তাবটি মহারাজার হাতে পড়ার আগে যেমন করিয়া হউক হস্তগত করিতে হইবে।

বীরভদ্রকে আলাদা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রগিরির কুমারের বিবাহ-প্রস্তাব চলিয়া গিয়াছে নাকি ?

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কুমারের কাজ ত পাকা হয়ে গিয়েছে, তোমার আদেশেই মহারাজার কাছে খবর গেছে একটু আগে।

যুবরাজ প্রমাদ গণিলেন। বীরভদ্রকে বিদায় দিয়া ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ছুটিলেন হিন্দুপুরের প্রাসাদাভিমুখে।

—*—

ব্যর্থ অভিযান

আগুন। চতুর্দ্দিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছে, আকাশে নীল দেখা যায় না, অগ্ন্যুত্তপ্ত ধূলিকণা বেগবান বায়ুর সহিত মিশিয়া দৃশ্যপট প্রায় কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গাছে সবুজ নাই, মাটি দগ্ধ। পোড়া মাটি ফাটিয়া ফাটিয়া কঠিন পাথরের আকার ধারণ করিয়াছে।

সর্ব্বত্র লোহিত আর পিঙ্গলের সমাবেশ। ভয়াল গৈরিক বেশে প্রকৃতি যেন রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছে, অগ্নিবর্ষণে সব কিছু জ্বালাইয়া দিতেছে।

এই আবেষ্টনী ভেদ করিয়া আমাদের মোটরবাস হু হু শব্দে পাহাড়ের পথে ছুটিতেছিল।

বেলা তখন তিনটা হইবে, কাডাপ্পার ডি, এফ, ও মিঃ আমির পাতসার নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া স্থানীয় রেঞ্জারের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন বাহিরের মত ভিতরটাও জ্বলিতেছিল, আহার জোটে নাই। আত্মাভিমান দলিত করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, শিকারের কথা পরে বলিব, এখন কিছু খাইতে দিন।

ভদ্রলোক আমার মতই সঙ্কোচহীন। নিষ্ঠাবান হিন্দুর যাবতীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন যথেষ্ট উজ্জ্বল থাকা সত্বেও অতিথি-সৎকারের মহাপুণ্য বর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন—জানাইয়া দিলেন, দিবার মত আহার তো কিছুই নাই। যাহার গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায়,—অবেলায় এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং···।

বিদেশীপন্থী মার্জ্জিতদের নিকট অসময়ে ক্ষুধার কথা বলা বা সামান্য এক কাপ চায়ের উল্লেখও গর্হিত কর্ম্ম। প্রার্থীকে অসভ্য, ছোটলোক বা জঘন্য নিম্নস্তরের জীব ভাবিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মে অভুক্ত অতিথিকে ভগবান বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। রেঞ্জার প্রাচীনপন্থী ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু, তথাপি অবলীলাক্রমে ধর্ম্মকেই অগ্রাহ্য করিতে তাঁহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা আসিল না। বুঝিলাম ভদ্রলোক হুঁসিয়ার মানুষ। পেনসন লইবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে---ভবিষ্যতের সঞ্চয়টা সময় থাকিতে সুরু করিয়াছেন।

অপর দিকে জ্বলন্ত চিতার কাঠ ফাটার মতই উদরাভ্যন্তরে তখন দাহক্রিয়া ধুম করিয়া চলিয়াছে। উত্তপ্ত পাকস্থলী মোচড় খাইতে খাইতে থাকিয়া থাকিয়া যে হুঙ্কার ছাড়িতেছিল, তাহা দূর হইতে শ্রুত ক্ষুধিত ও ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্রের রোষধ্বনির মত। ভিক্ষাদানে দাতা বিমুখ হওয়ায় চটিয়া উঠিয়াছিলাম। খুবই স্বাভাবিক, ভিতরকার জ্বালার বাহিক প্রকাশ সহজেই দৃশ্য হইয়া উঠিল। রাগটা পিয়নের উপর চড়াইয়া দিলাম, কঠোরভাবে তাকাইলাম, দৃষ্টির দ্বারা বুঝাইতে চাহিলাম—উঠিবার আগেই আহারের ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন? ইহা বেয়াদপির অন্তর্ভুক্ত,

সুতরাং শাস্তি হইবে না কেন ? কঠোর দৃষ্টিতে পিয়নের কিছু হইল না—উপরন্তু দেখিলাম, ক্লান্তিতে তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত বাণযোজিত ধনুকের ন্যায় নীচু দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। টঙ্কার পড়িলেই উভয় উভয়কে অন্তর্দাহের কথা শুনাইতে থাকিব। ফলে বাণে বাণ ক্ষয় হইবে মাত্র, জ্বালা থামিবে না। দৃষ্টি আপনা হইতে নরম হইয়া গেল। অনুসন্ধিৎসু চোখ অন্ন খুঁজিতেছিল —ভাজার গন্ধ পাইতেছিলাম।

রেঞ্জারের কোয়াটারসের সামনে দূরগামী বাস থামে, যাত্রীরা লেমনেড খায়, পথের জন্য ভক্ষণীয়ও কিনিয়া লয়, সেই কারণে রাস্তার ধারেই বোড়ে দোষে কারাবুন্দী, আর নানা প্রকারের ভাজা-ভুজি জাতীয় ভক্ষণীয় পাওয়া যায়। আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ঐ ভাজার দিকে। ইহার ভিতর দুই একজন বিক্রেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাহারা রেঞ্জারের রোয়াকের নীচেই বসিবার অধিকার পাইয়াছে। রেঞ্জার স্বয়ং নাকি তাহাদের ক্রেতা। বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসার কারণ খুব সম্ভবতঃ তাঁহার রোয়াক ঝাঁট দেওয়া ধূলি ও রাস্তার যাবতীয় উড়ন্ত ময়লার সংমিশ্রণে ভক্ষণীয়গুলি উপাদেয় হইয়া থাকে। পাক-প্রণালীর বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য—ভাজা কখনও বাসি হয় না। এক সপ্তাহের পুরাতন খাদ্যকে সামনে ভাজিয়া দিলেই তাহা টাট্‌কা হইয়া যায়।

আমি ভাজার দিকে লোলুপ দৃষ্টিসহ অগ্রসর হইতেছি দেখিয়া পিয়ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাকপ্রণালীর খবরটি আমাকে দিয়াছিল। সবই শুনিলাম, হাইজিনের নানা প্রশ্নও উঠিল, শেষ পর্য্যন্ত জঠরাগ্নির জ্বালা সহ্য করিতে পারিলাম না, যা থাকে কপালে হইবে ভাবিয়া কিনিয়া ফেলিলাম মোটা মোটা দোষে। রোয়াকে উঠিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে গ্রাসগুলি বৃহত্তর করিয়া ফেলিতেছি দেখিয়া পিয়নও আমার পথানুসরণ করিল। অন্য বাস-যাত্রীদের সহিত তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সঙ্কল্প অকেজো হইয়া গেল।

আহারের পর পুরা দুই গেলাস জল নিঃশেষিত হইতে রেঞ্জারের একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। নিকটে আসিয়া বলিলেন—ওরা রাঁধে ভাল। প্রকারান্তরে রাত্রের আহারটাও কিনিয়া লইতে বলিলেন কি না কে জানে।

এইবার গো-যান ব্যবহারের পালা, চৌদ্দ মাইল পথ পাড়ি দিতে হইবে। চাকা থামিলে আট মাইল হণ্টন—পথের শেষে জি, এল, ভাবীর ফরেষ্ট বাংলো। জঙ্গলের ভিতর দিয়া গো-যান যাইবার পথ নাই, ফরেষ্ট বাংলোয় পৌঁছাইতে রাত হইয়া যাইবার ভয়ে তখুনি গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া মালসহ উঠিয়া পড়িলাম। রেঞ্জার উপরআলার পত্র ইতিমধ্যে আর একবার পড়িয়াছিলেন। অভয় দিলেন—জঙ্গলের আহারাদির ব্যবস্থার তিনি সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। তখন রাখিলে আছি মারিলে গেছির উপর বেশ আস্থা আসিয়া গিয়াছে—প্রত্যুত্তরে জানাইলাম তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই বনবাসে চলিয়াছি।

সমস্ত পথটাই আগুনের মত হাওয়া ও তৎসহিত অবিশ্রান্ত ধূলার ঝাপটা ভোগ করিতে করিতে পায়ে হাঁটা পথের নিকট আসিয়া পড়িলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

মালবহনকারী লোক রেঞ্জারের কৃপায় ইটলী খাইবার জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পিয়নকে বলিলাম, জঙ্গলে ঢুকিবার আগে দোনলটা ছোট ছর্‌রা ও লিথেল বল ভরিয়া রাখিতে। এত মানুষের গোলমালে বাঘ বা হরিণ ত্রিসীমানায় আসিবে না, তবে ভালুক আর সরীসৃপকে বিশ্বাস নাই। প্রথমোক্তটি অকস্মাৎ কোন ঝোপ হইতে সামনে বাহির হইয়া পড়িলেই সোজা দাঁড়াইয়া আলিঙ্গন দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে চাহিবে এবং সাপ পথ চলিতে যদি পায়ে জড়াইয়া মনের সাধে বিষ ঢালিতে চায় তো কিছুই বিচিত্র নয়। একটি নলে নয় নম্বর ছর্‌রা পূরিতে বলিলাম। উপযুক্ত দূরত্ব হইলে গুলী চালাইলে গুঁইসাপ হইতে পাইথন পর্য্যন্ত চলৎ শক্তি রহিত হইয়া যাইবে। ভরা বন্দুক হাতে উঠিতেই মেজাজটা ভিন্ন রকমের হইয়া গেল—মালবাহীদের পিছনে রাখিয়া আগে আগে চলিতে লাগিলাম। পায়ে চলা পথ যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, কারণ এ রাস্তায় মানুষ একরকম চলে না। দুর্দ্দান্ত হাওয়ায় হ্যারিকেন আলো জ্বালা গেল না,—পথ দেখিবার শেষ অবলম্বন বৈদ্যুতিক টর্চ—তাহাও আট মাইল পথ একটানে জ্বালিয়া রাখিলে আলোর আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। অনন্যোপায় হইয়া খানিকটা পথ টর্চ জ্বালিতেছি, খানিকটা অন্ধকারে চলিতেছি। ফরেষ্ট বাংলো ওয়াচার পথপ্রদর্শক হিসাবে সামনে হাঁটিতেছে। হঠাৎ ঠিক আমার পিছন হইতে রব উঠিল, পাম্বু পাম্বু (সাপ), থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম, এদিক ওদিক আলো ফেলিতে দেখি আমার ডান পাশে একটি ঝোপের ভিতর সাপের লেজ ঢুকিয়া যাইতেছে, দেহের শেষাংশ দেখিয়াই অনুমান করা চলে, একটি পুষ্ট ও বয়ঃপ্রাপ্ত বিষধর। গতিশীল সরীসৃপকে দুইজনেই টর্চের আলো সত্বেও ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছি। ছোবল মারিলে ন' নম্বরের ছর্‌রা বাঁচাইতে পারিত না—ভাগ্যগুণে উভয়েই মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইলাম। পথ চলিতেছি, আট মাইল পথ আর শেষ হয় না। বাংলো ওয়াচারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আর কত দূর'? উত্তর আসিল, 'বেশী না, যতটা আসিয়াছি আরো ততটা যাইতে হইবে।' ইতিমধ্যে আমরা নিবিড় বনে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। টর্চের তীব্র আলো নিবাইয়া দিলে অন্ধকার অকস্মাৎ যেন কালো ভারী ওজনের মত ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে—গত্যন্তর নাই—সবটা পথ আলো জ্বালাইয়া রাখিলে আসল শিকারের সময় অসুবিধায় পড়িয়া যাইব।

ক্লান্তি শেষ পর্য্যন্ত অবসাদে আসিয়া পড়িল। কোন প্রকারে পা দুইটা হেঁচড়াইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। একটা পাহাড় অতিক্রম করিতে জঙ্গলের আবেষ্টনী বদলাইতে আরম্ভ করিল, এদিকে বড় গাছ বিরল, সবই নাতিবৃহৎ ঝোপে পূর্ণ, মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড় দেখা যায়, খাড়াই ঘাস পর্য্যন্ত নাই। আকাশ হইতে অগ্নিবর্ষণে সব পুড়িয়া গিয়াছে—অধিকাংশ গাছই পল্লবহীন।

দূরে দেখিলাম—কালোর মাঝে সাদা—ওয়াচার বলিল ঐ আমাদের বাংলো। চলাটা আপনা হইতেই দ্রুত হইয়া উঠিল—আস্তানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পৌঁছাইয়া প্রথমেই প্রাণ ভরিয়া খানিকটা জল খাইয়া লইব। দ্রুত চলিয়াছি, সাদা কিন্তু নিকটে আসিতেছে না—পাহাড়ের দূরত্ব অধিকাংশ স্থলে যে ভ্রমাত্মক তাহা প্রমাণ হইয়া গেল, তবু সান্ত্বনা—আস্তানা দৃষ্টির ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। চলিতেছিলাম, সামনের মোড়টা ফিরিলেই আমরা বাংলোর অতি নিকটে আসিয়া পড়িব, ওয়াচার আমার অনেকটা আগে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। মোড়ের কাছে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। জঙ্গলীর দৃষ্টিশক্তি সাংঘাতিক প্রখর, তাহার আচরণ দেখিয়াই অনুমান করিলাম, একটা কিছু দেখিয়াছে। তাড়াতাড়ি টর্চটা বন্দুকে সংলগ্ন করিয়া দুইটা নলই বল দিয়া ভরিয়া লইলাম। তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া আলো ফেলিতে দেখি একটি বিশাল বন্য বরাহ, নিশ্চলভাবে ২৫, ৩০ গজের ভিতর ওয়াচারের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সন্দেহ কাটিলেই আক্রমণ করিবে। টর্চের আলো পড়িতেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করিয়া মাথা নীচু করিল, বন্দুক তুলিয়া ট্রিগার টিপিতে যাইব এমন সময় লোকটা হাউমাউ করিয়া বন্দুকের নলের সামনে আসিয়া পড়িল। বরাহ তখন বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, ক্ষিপ্রতাসহ বন্দুকের মুখ সরাইয়া ওয়াচারের মাথায় সজোরে নল দিয়া আঘাত করিলাম। লোকটা ছিটকাইয়া পাশে পড়িয়া গেল, উহাই চাহিয়াছিলাম—ইতিমধ্যে জানোয়ার দশ গজের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে—ট্রিগার পড়িল, তাহার সহিত জন্তুও ধরাশায়ী হইল।

ওয়াচারের মাথাটা রীতিমত ফাটিয়া গিয়াছিল, প্রায় বেহুঁসের মত মাটিতে পড়িয়া ছিল, তাহাকে তুলিয়া পিঠে ঝুলাইলাম— কুস্তীর ওজন নেওয়া এখানে কাজে আসিয়া গেল।

বাংলোয় উঠিতে আর এক ফাঁপরে পড়িলাম। ওয়াচারকে অকারণ মার দিতে পিছনের মালবাহক দুইটি কুলী পলাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন জল বহন করিতেছিল। বন্দুকের বাক্সের কুলী পালাইতে পারে নাই, কারণ দুইজনে একটি ভারী বাক্স বহন করিতেছিল। ইচ্ছা করিলেই নামান যায় না। ওয়াচারকে পিয়ন ও অন্য কুলীর জিম্মায় রাখিয়া তৃতীয়টিকে লইয়া পলাতক কুলীর সন্ধানে বাহির হইলাম। কুলীদের পাওয়া গেল না, কিন্তু জলের বড় ফ্লাস্কের সন্ধান মিলিল। প্যাঁচ খুলিয়া সেইখানে বসিয়াই খানিকটা জল খাইয়া ফেলিলাম।

বাংলোয় ফিরিয়া ওয়াচারের ক্ষত স্থানটির first-aid-এর ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে জানাইলাম তাহাকে বন্দুকের নল দিয়া না পিটাইলে—নয় বরাহের দাঁত তাহাকে চিরিয়া দোফালা করিয়া ফেলিত অথবা তাহার পূর্ব্বে আমার বন্দুকের গুলীতেই সে মরিত। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিব না—কারণ ভবিতব্যের ফলে ঘটনাটি ঐরূপ ঘটিয়াছিল—নেহাৎ লোকটির এবং আমার কপাল জোর না থাকিলে কি হইত বলা শক্ত। দুর্ঘটনাগুলির ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পুনরায় জলের কথা মনে পড়িল, ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিতে

অর্দ্ধেকের উপর ফ্লাস্ক খালি হইয়া গিয়াছে, অপর দিকে ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণায় ছাতি শুকাইয়া উঠিতেছে—জল চাই—রাত্রেই চাই।

ওয়াচার মারের কারণ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। জলের কথা উঠিতে বলিল, জল তো কাছেই আছে কিন্তু রাত্রে ওখানে কে যাইবে? এ তল্লাটে বৈরণী ছাড়া আর কোথাও জল নাই, সব জানোয়ার ওইখানেই জল খাইতে আসিয়া থাকে—বাঘ, লেপার্ড, স্যামবার, ভালুক সব।

ওয়াচার উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান দেখি কি ব্যবস্থা হয়, কুলীদের নিকট গিয়া কি বলিল জানি না—তাহারা দেখি হৃষ্টমনে আমার নিকট আসিয়া হাজির হইল। ওয়াচার আসিয়া জানাইল, বাংলো হইতে একটি কলসী ও সাহেবের ফ্লাস্ক করিয়া জল আনিতে কুলীরা রাজি আছে যদি আপনি বন্দুক লইয়া উহাদের সহিত যান। অন্ধকার রাত্রে মাটিতে হাঁটিয়া, শিকার যদি পাইয়া যাই মন্দ কি—বাংলোতে উঠিবার আগেই ভাগ্যগুণে একটি পাওয়া গেল বিরাট দাঁতাল বরাহ—মাউণ্ট (mount) করিয়া রাখিবার মত ট্রোফি (trophy)। জলাশয় কাছেই, হঠাৎ 'কাছেই' কথাটার মানে আমাকে দমাইয়া দিল, পাহাড়ের বাসিন্দারা যাহাকে কাছে বলে, তাহা আমার নিকট কতটা দূর হইবে কে জানে! মন দ্বিধান্বিত হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় ওয়াচারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছে মানে কোথায় কত দূর, সে অবলীলাক্রমে বলিল, বেশী নয় আড়াই মাইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার তৃষ্ণা আরো বাড়িয়া গেল। ফ্লাস্কটা খুলিয়া দেখিলাম, জল বাড়ে নাই বরং তলার সামান্য ছিদ্র হইতে ফোঁটার পর ফোঁটা ঝরিতেছে।

বাংলো ওয়াচার ও পিয়ন বাদে চার জন কুলী বাঁশ আর দড়ি লইয়া বরাহ আনিতে গেল। ছাড়িয়া আসিলে হায়নায় খাইয়া ফেলিবে। জন্তুটিকে আনিল হেঁচড়াইয়া, মাত্র চারজনে ঝুলাইয়া আনিতে পারে নাই। পথের ঘষ্টানীতে পেটের খানিকটা অংশ হইতে নাড়ীভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যাক, মাথাটা নষ্ট করে নাই রক্ষা।

ঘরের ভিতর হ্যারিকেন জ্বালা হইয়াছে—পিয়ন মেজের উপর বিছানা (বিছানা অর্থে মাত্র সাধুবাবার সরঞ্জাম—দুইটি মোটা কম্বল) পাতিয়া দিয়াছে—রাত্রে আহার নাই, ধূলা পায়েই তাহার উপর কাৎ হইলাম। সবে বালিসটা যুৎসইভাবে মাথার তলে রাখিয়াছি এমন সময় অনুভব করিলাম, কোন ক্ষুদ্রাকার দন্তী—হয়ত ছোট ইঁদুর আমার আঙ্গুলের ডগায় দাঁতের ধার পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। মনের মত করিয়া শুইয়াছিলাম আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, অপর পা দিয়া ঝটকা দিলাম। দন্তী চলিয়া গেল, ঠিক এই সময় পিয়ন কি কাজে আর একটি আলো লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতেছিল—চৌকাঠের বাহির হইতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, সার, get up, get up.

বাল্যকালে gymnastics-এর নানা কৌশল অভ্যাস করিয়াছিলাম—শুইয়া লাফ মারায়

বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। বিছানায় দাঁড়াইতে দেখি একটি অতিকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোমশ কাঁকড়া বৃশ্চিক দাঁড়া খাড়া করিয়া আমার যেখানে পা ছিল, সেদিকে চলিয়া আসিতেছে—কি সর্ব্বনাশ আনুমানিক বিতাড়িত দন্তী দাঁতের নয়, দাঁড়ার ধার পরীক্ষা করিতেছিল। বৃশ্চিক মারার পর মাপিলাম লম্বায় প্রায় ১০ ইঞ্চি। এতবড় জীবন্ত কাঁকড়াবিছার সহিত ঘনিষ্ঠতা ইতিপূর্ব্বে আমার হয় নাই। বিষাক্ত কীটকে খালি সিগারেটের টিনে পুরিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল—পুষ্টকায় ঢুকিতে চায় না। কীটটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম বালক পুত্রকে উপহার দিব বলিয়া। বর্ত্তমানে সে ২২ বোর রাইফেল দিয়া সাপ মারার হাত পাকাইতেছে। বৃশ্চিক মারা তাহার নিত্যকর্ম্ম। বাবা যে তাহার অপেক্ষা বড় শিকারী প্রমাণ করিবার জন্যই কীটটি পাত্রস্থ করিতে হইল।

সকালের কথা, ঘুম ভাঙ্গিতেই নাড়ীর তল্লাটে দাঙ্গার খবর পাইলাম—হাইজীনের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক মত অগ্রাহ্য করিয়া ইটলী, কারাবুন্দী, বোড়ে সব হজম হইয়া গিয়াছে—ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত—ভিতরে লাঠালাঠি চলিয়াছে। তখনও রেঞ্জারের প্রতিশ্রুতি সফল হইবার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। বাংলো ওয়াচারকে দুঃখের কথা জানাইলাম। সে বলিল—জঙ্গলী কুলীরা এখুনি শূয়োরটাকে পোড়াইবে—লবণ লঙ্কা আনিতে ইতিমধ্যে দুইজন চলিয়া গিয়াছে—আপনার কি হারামের মাংস চলিবে? শূয়োর হারাম হইল কেন জানি না, কিন্তু পেটে যাইলে যে হারাম থাকিবে না তাহা জানিতাম। Pork আমার নিকট একটি সুখাদ্য—কিন্তু বড়া মাংস সুখাদ্য হইয়া ওঠে পাকপ্রণালীর উপর। মসলার যাহা নাম শুনিলাম এবং যাহার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে জঙ্গলীদের রান্না খাইতে সাহস হইল না।

পিয়ন ও প্রভু উভয়েই পাচক হিসাবে নামকরা মানুষ অর্থাৎ রাঁধিলে তাহা খাদ্য হয় না। তথাপি এক চাঁই পিছন দিককার মাংস লইয়া রাইফেল পরিষ্কার করা গজটা মাঝখানে ফুঁড়িয়া দিলাম। আগুনের ব্যবস্থা হইতে লবণ দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আচ্ছা করিয়া পুড়াইলাম, শিককাবাব রাঁধিতেছিলাম। সঙ্গে table salt ও টিনে পোরা প্রাচীন টাটকা মাখন ছিল—মনের সাধে তাহা লেপন করিলাম। অধ্যবসায়ীর চেষ্টা বা আন্তরিকতা থাকিলে কি হইবে—মাখন মাংসের ভিতর ঢুকিল না—আগুনের আঁচে গলিয়া উনানের ভিতর পড়িয়া গেল। এক ধাক্কায় আধ টিন মাখন শেষ করিয়া ফেলিলাম। পিয়ন অভিজ্ঞের মত বলিল—আর বেশী ঝলসাইলে মাংসটা পুড়িয়া যাইবে, উপদেশ মানিলাম। এইবার খাইবার পালা, পিয়নের জন্য খানিকটা রাখিয়া প্রায় সমস্ত মাংসের চাঁইটাই নিজের করিয়া লইলাম। পিয়নের ভাগ যতটা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে একটি জোয়ান পুরুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে কিনা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না—তখন 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' প্রবাদ-বাক্যটির অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিতেছি। রোস্টের বহিঃদৃশ্য বড় লোভনীয় হইয়াছিল—পিয়ন সামনে না থাকিলে হয়ত এক কামড় দিয়া

ফেলিতাম। জীবনে এই প্রথম রান্না করিলাম—স্বপাক অন্নের প্রতি আকর্ষণ রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পিয়নকে বলিলাম, তাড়াতাড়ি খাওয়ার পালা শেষ করিয়া ফেলিতে—এখুনি মাচান বাঁধানর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পিয়ন তাহার ভাগ লইয়া চলিয়া গেল, আমি তিন দিনের জমা দাড়ী গোঁফ কামাইতে উঠিলাম। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলে আহারে তৃপ্তি আসে? গণ্ড মনোমত করিয়া মসৃণ করিবার জন্য উল্টা দিকে ক্ষুর ধরিয়াছি, এমন সময় বমনের শব্দ শুনিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি—পিয়ন সশব্দে দামী pork বাহির করিয়া ফেলিতেছে—নিকটে যাইবার প্রয়োজন হইল না—পাকপ্রণালীর বিভ্রাটই যে পিয়নের দুরবস্থার কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না—ঝলসান মাংসটার দিকে তাকাইলাম, তৎসহিত টিনের মাখনও দেখিলাম—হিসাবে ঠিক হইল আরেকটু ঝলসান প্রয়োজন ছিল। স্বপাক রান্না খাইতে আর সাহস পাইলাম না।

বেলা হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে—আহারের বন্দোবস্তের কোন শুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। প্রথম দিনেই মন বিগড়াইয়া গেল—প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম টাকা দিয়া স্বাচ্ছন্দ্য কিনিবার ক্ষমতা না আসিলে আর শিকারে আসিব না—এই আমার শেষ অভিযান। রুখিয়া দুর্ভাগ্যকে চোখ রাঙ্গাইতে পারিলে অনেক সময় ফল শুভই হইয়া থাকে। যে সময় ভাগ্যকে শাসন করিতেছিলাম, সেই সময় নিকটেই গরুর গাড়ীর চাকার আওয়াজ শুনিলাম।

যাক বাঁচা গেল, উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলাম—যদি রেঞ্জার 'ওরা রাঁধে ভাল'র নূতন দৃষ্টান্ত কিছু পাঠাইয়া থাকেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, আমার কল্পনা ভিত্তিহীন। রেশন (ration)-এর সহিত ফরেষ্টার ও পাচক আসিয়াছিল। মনে বল পাইলাম—সময় হউক অসময় হউক আহার জুটিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ পথে গাড়ী চলিল কেমন করিয়া? উত্তর পাইলাম—দিনের বেলায় চলে। জঙ্গলের আবেষ্টনীতে মনটাও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছিল। বলিতে ইচ্ছা করিল—লোকগুলা ছোটলোক। এতটা পথ অযথা হাঁটাইল।

ফরেষ্টারকে আদেশ করিলাম—'লোকদের আহারের ব্যবস্থা করিতে বল,' ইতিমধ্যে আমরা বাঘের চলার পথ দেখিয়া আসি। শুনিলাম বৈরণীর জলাশয়ে নাকি প্রায় জল খাইতে আসে।'

ফরেষ্টার কাঁচুমাচু করিয়া জানাইল—বাঘ চলার পথ দেখাইবার কথা তো রেঞ্জারের আদেশপত্রে উল্লেখ নাই। আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা লিষ্টমাফিক করিয়া ফেলিয়াছি।

এইবার মনে পড়িয়া গেল ধর্ম্মের কথা, উহার নানা দিক আছে। ব্ল্যাক মার্কেটের মাল চালানর কথাটাই ভুলিয়াছিলাম—তীর্থে আসিয়া পুণ্যলোভী যাত্রীরা বেপরোয়া হইয়া স্বর্গদ্বারী পুরোহিতদের ঘুষ দিয়া থাকে পথ পরিষ্কারের জন্য। উৎকোচের ভদ্র নাম দক্ষিণা। আমি না হয় বখশিস্‌কে দক্ষিণা ভাবিয়া আত্মসান্ত্বনা লাভ করিলাম। আহার, পানীয় ও শিকারের

যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য—এইখান হইতে উপরি দক্ষিণা স্বরু হইল—স্বাচ্ছন্দ্যের লিস্ট ছাপাইয়া অনেক উপরি কাজ আপনা হইতে হইয়া যাইতে লাগিল।

বাঘ আসার জায়গা দেখিয়া আসিলাম। টাটকা পদচিহ্ন কোথাও নাই। গভীর অরণ্যে বাঘের প্রধান খাদ্য স্যামবার, তাহারও পায়ের দাগ দেখিলাম না। এক জায়গায় লেপার্ডের দাগ পাওয়া গেল, খুব স্পষ্ট নয়, বরাহ সেইখানটায় শুইয়াছিল। তবু জায়গাটা বেশ বাঘা বাঘা লাগিল। মাচান বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মাচানে বসিবার আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—পাঁচটা বাজিতেই তোড়জোড় করিয়া যথাস্থানে হাজির হইলাম—মাচানের রূপ দেখিয়া পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল—ঐ মাচান দেখিলে বাঘ এদিকে আসা দূরের কথা, আধ মাইল দূর হইতে ভড়কাইয়া পলাইবে। গাছের উপর একটি ছোটখাট ঘর বাঁধা হইয়াছে। মাচান বাঁধিবার আগে ফরেস্টারকে বলিয়া আসিয়াছিলাম—রাত্রে আমি মাচানেই ঘুমাই—একটু পা ছড়ানর মত জায়গা রাখিতে। বকশিশের তাড়ায় সে এমন করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য দিবে ভাবিতে পারি নাই। তখনো যেটুকু বেলা ছিল তাহাতে মাচান ভাঙ্গিয়া ফেলা চলে। তাড়াতাড়ি মাচান ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ দিয়া জলাশয়ের নিকটেই বাঘ চলার নির্দ্দিষ্ট পথে ঝোপ খুঁজিতে লাগিলাম। একটু দূরে কুচকাঁটার ঝোপ পাওয়া গেল। ভিতরটা পরিষ্কার করিতে পারিলে মওড়ার কাছেই বসিবার সুযোগ পাওয়া যায়। একটু দূরে দাঁড়াইয়া ঝোপের ভিতর সব দিক লাঠি দিয়া আঘাত করিতে বলিলাম। চতুর্দ্দিকে অগ্নি বর্ষণের মাঝে শীতল স্থানটি যে সাপের আড্ডা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না—অভিজ্ঞতা-নির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা ভুল হয় নাই। দুই-এক ঘা লাঠি ঝোপের উপর পড়িতেই একটি বাঁটফুল (viper) বাহির হইয়া আসিল, চারিদিক খোঁচাইতে বলিলাম, আরো একটা যে নাই তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ? লোমশ কাঁকড়া বিছার বংশধররা যে এখানে কলোনী বসায় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? যথেষ্ট ঠোকা-ঠুকিতেও আর কিছু বাহির হইল না। উই-এর গর্ত্ত যে কয়টা দেখা যাইতেছিল, তাহাও পাথরের কুচি দিয়া বন্ধ করাইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। ঢুকিবার পথেই মাথার টাক ও ঘাড়ের কিয়দংশ কাঁটায় ছিঁড়িয়া গেল। সময়ের অভাবে সামনেটাই অর্থাৎ বাঘ চলার দিকটা কোন প্রকারে আড়াল দিতে পারিয়াছিলাম—পিছনটা একেবারে খোলা থাকিয়া গেল—অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই চলিলাম—জানিতাম বাঘ বিপথে কখনও চলিবে না।

শিকারের উত্তেজনা maximum degree-তে উঠিয়া পড়িয়াছিল। অনেক শিকারীর নিকট শুনিয়াছি, কত সময় ওৎপাতা বাঘ নিকটে মানুষ নাই জানিতে পারিলেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ভাবিলাম আমার বেলাতেও ঐরূপটি ঘটিবে না কেন। দিনের আলোয় বড় বাঘ কখনও মারি নাই—বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার জন্য হাত নিসপিস করিতেছিল। বাঁধা মহিষটার দিকে তাকাইয়া শিকার আসিলে কিভাবে বন্দুক চালাইব কল্পনায় তাগমারির কসরৎ শেষ করিয়া

লোকগুলিকে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। ফকিরুদ্দিনকে কাশি, হাঁচি, সশব্দে হাইতোলা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া কম্বলের উপর বসিলাম।

মানুষের কথা দূরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মহিষটা নরকণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া একদৃষ্টে মানুষের গতির দিকে তাকাইয়া আছে কান খাড়া করিয়া। মাঝে মাঝে পদতলে ঘাস খাইতেছে, আবার সকর্ণে উদ্‌গ্রীব হইয়া মানুষের গলা শুনিবার জন্য একই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে,—দৃশ্যটি করুণ—অনেক সময় শিকারীর মন দমাইয়া দেয়।

হঠাৎ উপর হইতে পিছনে দুই-তিনটি নুড়ী স্থানচ্যুত হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলিয়া বগলে বসাইলাম—বুক দুরু দুরু করিতেছে—প্রশ্ন উঠিল বাঘ পিছন দিক হইতে আসিতেছে কেন—তবে কি আমাকে দেখিয়াছে? এখন বন্দুক ঘোরাই কেমন করিয়া? শিকার করিতে পারি বা না পারি প্রাণরক্ষার জন্যই ঘুরিয়া বসার প্রয়োজন ছিল। নড়িয়া বসিবার স্থান নাই। জোর করিয়া ঘুরিলাম এবং বন্দুকের নলও ঘুরাইলাম। নল শুকনা কাঠে ঠেকিয়া খটাং খট করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আরো নিকটে একরাশ নুড়ীর পতনধ্বনি শুনিলাম।

মুহূর্ত্তে একটা কিছু ঘটিয়া যাইবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। যে দিক হইতে নুড়ী পড়ার শব্দ আসিল, ঠিক সেই স্থানটি দেখিবার উপায় নাই। ঝুঁকিয়া দেখিবারও সাহস পাইতেছি না—একটু নড়িলেই দিনের আলোয় বাঘকে আমার দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিব। প্রতিটি মুহূর্ত্ত দারুণ উদ্বেগের ভিতর দিয়া কাটিতেছিল—এমন সময় হুউপ শব্দের সহিত নিকটেই উপরিস্থিত ডাল সাংঘাতিক ঝাঁকুনি খাইল—বাঘ নয়, হনুমান আমাকে দেখিয়াছিল—কাছে আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া পলাইয়াছে। সব উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া গেল। হনুমানরা যেরূপ সহজ চিত্তে মাটির উপর লাফালাফি করিতেছে, তাহাতে বুঝিলাম বাঘ বা লেপার্ড এ অঞ্চলে নাই। উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মহিষটার প্রতি দয়া অন্তর্দ্ধান করিল—আবেষ্টনীর সামঞ্জস্য হিসাবে নিজের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিলাম।

ফকিরুদ্দিনকে পালা করিয়া রাত জাগার জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে বলিলাম—বড় বাঘ বা লেপার্ড এদিকে নাই। বেলা থাকিতে থাকিতে পিছনটা ঢাকিয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয়—গাছে উঠিয়া কিছু পাতাসমেত ডাল ভাঙ্গিয়া আন, আমি নীচেই বন্দুক লইয়া দাঁড়াইব। সে অসন্তুষ্ট চিত্তেই উঠিল—ঝোপটা তবু আড়াল ছিল—খোলায় দাঁড়ান কেই বা জঙ্গলে ভালবাসে।

গাছে ওঠার আর্ট সে পূরা মাত্রায় দখল করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আগডালে উঠিয়া গিয়া দ্রুত ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। আড়ালের ব্যবস্থা হইতে আমরা ঝোপের নিকট ফিরিয়া আসিলাম এবং যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাসহ পিছনটা ঢাকিয়া দিলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলিবার অবকাশ পাইলাম। দিনের আলো তখন শেষ হইয়া যাইতেছে—অন্ধকারের আবরু আমাদের রহস্যময় অবগুণ্ঠনের ভিতর টানিতে সুরু করিয়াছে। আঁধারের আড়ালে পর্দ্দানশীন হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছি। বাঘ আসিবার পথের দিকে চলন্ত শব্দের প্রতীক্ষায় কান খাড়া হইয়া আছে। যথাসময় বনানী ঘোর কালোর আবরণে ঢাকিয়া গেল—ক্রমে আবেষ্টনী নিঝুম হইয়া আসিতে লাগিল।

উত্তেজনা পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছিল। এই সময় হইতে বাঘের প্রথম অভিসার সুরু হয়। শিকারের নেশার ঘোর লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে এমনি সময় চেনা চলার শব্দ শুনিলাম ঠিক যে দিক হইতে আশা করিয়াছিলাম। সন্তর্পিত পদক্ষেপে একটি, দুইটি নুড়ী নড়িতেছে—পরক্ষণেই শব্দ থামিয়া যাইতেছে।

হাওয়া বাঘের আসার বিপরীত দিক হইতে বহিতেছিল, মহিষটা ভয়ঙ্করের আগমন-সঙ্কেত পায় নাই।

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নাই, মনে হইল বাঘ নিশ্চয় আমাদের গন্ধ পাইয়াছে—মাটিতে অত নিকটে বসিয়া আছি—সুতরাং আমার সন্দেহ অমূলক হইতে পারে না। তোলা বন্দুক নামাইয়া রাখিলাম,—হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম—কিন্তু কপাল ফিরিল—দেখিলাম অনতিদূরে সমতল জমির ফ্যাকাসে রং-এর উপর একটি কালো ছায়ার ন্যায় কায়া চলিয়া আসিতেছে মহিষটার দিকে। মহিষ তখন ভিন্ন দিকে মুখ রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারে বাঘের আয়তন বেশ বড়ই মনে হইতেছিল।—বাঘ খোলা জায়গা হইতে ঝোপের আড়ালে যাইবার চেষ্টা করিতেছে—খানিকটা হামাগুড়ি দিয়া চলে—পদস্খলিত নুড়ীর শব্দ হইলেই আবার থামিয়া যায়। মহিষকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই বাঘ মারিতে পারিলে একটা বাহাদুরীর ব্যবস্থা হইয়া যায়—শিকারীর পক্ষে যশটি সহজলভ্য নয়। বন্দুক-সংযোজিত টর্চ টিপিলাম—তীব্র আলো গিয়া পড়িল আক্রমণরত জানোয়ারের উপর—মন দমিয়া গেল—বড় বাঘ নয়,—লেপার্ড তাহার উঞ্ছবৃত্তি লইয়া বাঘের আহার খাইতে আসিয়াছে। অযাচিত আগন্তুকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, আমাদের গন্ধ পাইয়াও লোভ সামলাইতে পারে নাই, মরা বাঘ পরীক্ষার জন্য দুই-চারিটি নুড়ী ঝোপের ভিতরেই হাতের নাগালে রাখিয়াছিলাম—বন্দুক নামাইয়া ছুঁড়িলাম লেপার্ডের দিকে—ঝোপ হইতে হাত বাহির করিয়াই ছুঁড়িতে হইয়াছিল। নুড়ীর আওয়াজে মহিষটা ঘুড়িয়া দাঁড়াইল, তাহার সহিত লেপার্ডও আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিল—কিন্তু ঝোপের অতি নিকটেই বিকট আলো ও বন্দুকের নল দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। লেপার্ড পলাইতে রাজি নয়—নিরুপায় হইয়া কাশিলাম—মানুষের কাশি ফলপ্রদ হইল—অনাহুত লাফ দিয়া পাশের ঝোপে গা-ঢাকা দিল। টর্চ নিবাইবার আগে ফকিরুদ্দিনকে খাবার জল দিতে বলিলাম, মাটি হইতে বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি তাহার মুখের

উপর আসিয়া পড়িয়াছিল দেখিলাম—ভয়ে তাহার মুখশ্রীর অদ্ভুত ,পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—কথা বলিতে পারিতেছে না—জিহ্বা আড়ষ্ট। আধা পাগলের মত ফ্লাস্ক আমাকে অগ্রসর করিয়া দিল। জল খাইয়া বলিলাম—বাঘ আর আসিবে না, তবে তোমাদের চিতাগুলি (leopards) আবার ফিরিতে পারে।

লেপার্ড চলিয়া যাইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, জঙ্গলে আর কোন সাড়াশব্দ নাই। রাত্রি ক্রমান্বয়ে গভীর হইয়া চলিয়াছে, তাহার সহিত ঘুমের ঘোরও বাড়িয়া উঠিতেছে—শিকারের আশা ছাড়িয়া দিলাম। ফকিরুদ্দিনকে জাগিতে বলিয়া বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। চোখ বুজিতেই ঘুমের অতল গহ্বরে তলাইয়া গেলাম। অভ্যাসটি শিকারের সখেই আয়ত্ত হইয়াছিল।

ভোরের দিকে ময়ূরের কেকা রবে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রেষ্ট হাউসে ফিরিয়া নানা জেরার দ্বারা বাহির করিলাম বৈরণীর পাহাড়ে আজ মাসাবধিকাল কেহ বাঘের খবর পায় নাই।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প তুলিয়া কাডাপ্পায় ফিরিবার বন্দোবস্ত করিলাম—ফিরতি পথে আট-নয় মাইল অতিক্রম করিতে লামবাড়ি (বেদুইন জাতীয় গোয়ালা)-দের গ্রামে আসিয়া পড়িলাম।

পথেই লামবাড়িদের মোড়ল মিনতি করিয়া জানাইল—সাহেব একেবন্দু গাড় (অতিকায় লেপার্ড) আমাদের ছাগল আর গরু মারিয়া মারিয়া নাজেহাল করিয়া ফেলিয়াছে—সাহেব না রক্ষা করিলে আমরা গেলাম। কালকেই একটি বৃহৎ ছাগল ঘর হইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

যে লেপার্ডকে ঢিল মারিয়া তাড়াইয়াছিলাম তাহাই মারিবার ইচ্ছা ফিরিয়া আসিল। পাইলে সুধু হাতে ফেরা অপেক্ষা ভাল হইবে। গাড়ী হইতে নামিলাম স্থানটি পরীক্ষার জন্য। অত্যন্ত নীচু কুটীর প্রায় হামা দিয়া ঢুকিতে হয়। ভিতরে রক্তের উপর লেপার্ডের পদচিহ্ন দেখিলাম। থাবা এত বড় যে, লেপার্ড না বলিলে Stripes ভাবিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা আসিত না—অবশ্য লেপার্ড যত বড়ই হোক, পায়ের তলার pad-এর আকৃতির টাটকা দাগ ভিজা বালিতে পড়িলে বাঘের সহিত প্রভেদ বাহির করা যায়—কিন্তু রক্তে যে দাগ পড়িয়াছিল তাহা একই স্থানে ঝটাপটিতে জাবড়াইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরেও টাটির দেয়াল দেখিলাম—অনেকটা জায়গা ফাঁক হইয়া আছে। মাটি খটখটে শুকনা—তাহার উপর জোড় হাওয়া থাকায় তাহার যাইবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। মাটিতে কোন দাগ দেখা যায় না। পাশেই আর একটি গোয়াল ঘর ছিল, তাহার বাহিরে বেট (bait) রাখিয়া বসিব ঠিক করিলাম।

শিকারের স্থানটিতে নূতনত্ব ছিল, স্বল্পপরিধির ঘর—মেজে গোবর ও গোচনায় কর্দ্দমাক্ত হইয়া আছে। এক কোণে স্তূপীকৃত পচা গোবর চাষের সারের জন্য যত্ন করিয়া সঞ্চয় করা হইয়াছে—ইহারই মাঝে খড় বিছাইয়া কম্বল পাতিলাম। প্রথমটা দুর্গন্ধে নাড়ী ওলট-পালট খাইতেছিল কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আতর ব্যবহার করিতে ক্রমান্বয়ে গোবরপচা গন্ধ সহনীয় হইয়া

গেল। কীটযুক্ত পচা মাংসের সামনে যে লোক আতরের আশ্রয় লইয়া বাঘের আশায় দুই দিন অষ্টপ্রহর বসিয়া থাকিতে পারে, তাহার পক্ষে পচা গোবরের গন্ধ ভয়ঙ্কর পরীক্ষা নয়।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, দিবারাত্র গোয়াল ঘরে কাটাইলাম, লেপার্ড আসিল না। এখানে হতাশা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম—ভিন্ন প্রকারের শিকার খেলিয়া, ছবির শিকার অর্থাৎ মডেল, নানা রকমের জুটিয়াছিল—রঙ্গীন ছবি ও কলমের খসড়া গল্পের সহিত দিলাম। আশা করি, পাঠক শিকারের প্রধান আকর্ষণ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবেন না।

সুবিধাটি পাইতাম না যদি তাহারা আমাকে ডাক্তার সাহেব ধরিয়া না লইত। একজনকে Mild Laxative দিয়াছিলাম; পরের দিন সে বিশেষ উপকার পাওয়ায় গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল সাহেব একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক, ফলে দেখিতে দেখিতে শিশি বড়ী শূন্য হইয়া গেল—সকলেরই ধারণা, সব রোগেরই সেরা দাওয়াই হইল ঐ বড়ী। যাক, অনেকের উপকার ও অপকার করিয়া লামবার্ডিদের গ্রাম ছাড়িলাম।

কাডাপ্পায় পৌঁছাইতেই স্থানীয় পুলিস ইন্সপেক্টর রহমান সাহেব খবর দিলেন, নিকটেই রায়চুটিতে বড় বাঘ আসিয়াছে; একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন—আমাদের দেশে আসিয়াছেন, শুধু হাতে ফিরিতে দিব না। মাত্র চার দিন ছুটি, তাহার ভিতর অন্ততঃ একদিন না জিরাইলে উপায় নাই। মোটমাট ৮।১০ দিন আহার জোটে নাই—তার উপর রাত্রে নিদ্রা নাই। জিরাইবার জন্য উৎসুক হইতাম না। আমার ধারণা জন্মাইয়াছিল ডি এফ ও হইতে রহমান সাহেব পর্য্যন্ত—আমাকে শিশুর মত লাড্ডুর লোভ দেখাইতেছেন, ভদ্রতাজড়িত অতিথিসেবা, লোকটা এতদূর আসিয়াছে যখন—তখন জঙ্গলটা দেখাইয়া দেওয়া ভাল। শিকার আমার নিকট যে কতবড় রোমান্স তাহা জানিলে নিশ্চয়ই কেহ আমাকে অনাহারে, অনিদ্রায় ঘুরাইতেন না।

শিকারে আমার উৎসাহ স্তিমিত হইয়াছে দেখিয়া রহমান সাহেব খুসী হইলেন; D. F. O. সাহেব রাত্রে খানাই খাওয়াইয়া দিলেন। অনেক দিন পর মুসলমানের জাত-পোলাও খাইতে রোমান্সের (Romance) কথাই ভুলিতে বসিয়াছিলাম। কোপ্তা কাবাব, কোর্ম্মা খাইয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। পরের দিন মাদ্রাজে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছি এমন সময় রহমান সাহেব কাহার মোটর সংগ্রহ করিয়া আমার 7. B. তে আসিয়া হাজির। রীতিমত ব্যস্তভাব—ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, চৌধুরী সাব, আপ্‌কো সের মিল গিয়া—১২ মাইল কি অন্দর বয়েল মার দিয়া, এভি চলিয়ে মোটর তেয়ার হায়।

যতই ব্যর্থতা আসুক, শিকারীর নিকট বাঘের নূতন খবর সাংঘাতিক লোভনীয় সংবাদ। মাত্র দোনলাটা আর কিছু কার্তুজ লইয়া রহমান সাহেবের গাড়ীতে উঠিলাম, Natural Kill—সুতরাং বাঘ যায় কোথায়?

এখানেও আশ্রয় জুটিল লামবাড়িদের গোয়াল ঘরে। গরুটার পিছন দিক সব খাইয়া ফেলিয়াছে। মারিয়াছিল খোলা মাঠে, লোক সাক্ষী রাখিয়া, দুর্দান্ত সাহসী বাঘ। যেখানে বসিয়া খাইয়াছিল সেইখানে থাবার চিহ্ন পড়িয়াছে—বিরাট ব্যাপার কিন্তু মাচান বাঁধি কোথায়! অধিকাংশ ঝোপই হাঁটুর উপর উঁচু নয়, আসশেওড়ার আগাছা।

মরা গরু হইতে বেশ খানিকটা দূরে বন্দুকের পাল্লার প্রায় শেষ সীমানার কাছাকাছি একটি হাত তিনেক উঁচু অতি ছোট ঝোপ পাওয়া গেল, তাহা বহু কষ্টে মাত্র একজনের আড়াল হইতে পারে—জায়গাটা মনঃপূত হইল না। লোকেদের জানাইলাম, কিলে বসিব না কাছাকাছি বাঘের ফিরিবার পথে বসিব। ট্রাক ধরিয়া বাহির করিলাম, আহারের শেষে বাঘ কোন্ দিকে গিয়াছিল। ভাগ্যগুণে পথেই একটি আম গাছ পাইয়া গেলাম। স্থানীয় শিকারীকে জানাইলাম, এই পথেই বাঘ ফিরিবে, তাড়াতাড়ি মাচান বাঁধ। শিকারী তাচ্ছিল্যের সহিত নিজের অভিজ্ঞতা জাহির করিয়া বলিল, বাঘের চলার পথ কি একটি? অযথা তর্ক করিতে ভাল লাগিল না। এরূপ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মত বেশী প্রকাশ হইতে থাকিলে, তর্কের মীমাংসা আমি হাত দিয়া সারিয়া থাকি এবং রদ্দার প্রতিক্রিয়া সামলাইতে অনেক সময় বকশিশের অজুহাতে মোটা টাকা ট্যাঁক হইতে খসিয়া যায়। বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে—শিকারী বলিল, আহার শেষ করিয়াই সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসিবে। তাহার পর আমার উত্তর না শুনিয়াই সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল। সেলামটায় Good-bye-এর স্পষ্ট আভাস ছিল। শিকারে এইরূপ অবাধ্যতা আমি ক্বচিৎ সহ্য করিয়াছি, তখন আর শিকারের discipline শিখাইবার সময় ছিল না, জলের ফ্লাস্ক আর বন্দুক পিঠে ঝুলাইয়া গাছে উঠিয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত কাটাইতে হইবে—ঠেস দিবার মত ডাল খুঁজিয়া বাহির করিতে খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। যেখানে বসিলাম সেখান হইতে গরুটা স্পষ্ট দেখা যায়—বাঘ আসিবার পথটিও দৃশ্য—। সামনের কয়েকটি ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সব কিছুই ভাল লাগিল, কেবল মাচানটা পাইলেই সোনায় সোহাগা হইত।

লামবাড়িরা তখন গরু লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। দূর হইতে গোপালকের ডাক নিকটে চলিয়া আসিতেছে—গ্রামের কাছ বরাবর হইতেই হৈ হৈ আওয়াজ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গরুর পালের বিশৃঙ্খল ছুটাছুটির ক্ষুরধ্বনি শুনিলাম, অনুমানে ঠিক করিলাম আর একটা গরু মরিল।

একই বাঘ যদি উপরি উপরি দুইটি গরু মারিয়া থাকে তো টাটকা ছাড়িয়া এদিকে আসিবে না, আর যদি দুইটি বাঘ হয় তো আমার কপাল অত্যন্ত সুপ্রসন্ন—জোড়া বাঘ মারার ফোটো তুলিতে পারিব।

দীর্ঘকাল একই ভাবে বসিয়া থাকায় পায়ে ঝিনঝিন ধরিয়া গিয়াছিল, একটু নড়িয়া না বসিলে আর চলে না, আসনটা গুছাইয়া বসিয়াছি অমনি শুনিলাম একটি শুকনা ডাল ভাঙ্গিয়া গেল, আওয়াজ আসিল মরা গরুটার দিক হইতে—ও আওয়াজ ভুল করিবার নয়—বন্দুক

তুলিয়া বগলে বসাইতে যাইব এমন সময় শব্দ গতিশীল হইয়া উঠিল—পট পট পট করিয়া লামবার্ডিদের পরিত্যক্ত জ্বালানি কাঠের টুকরা ভারী ওজনের চাপে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। শিরে করাঘাত করিলাম---বাঘ আসিয়াছিল—আমাকে নড়িতে দেখিয়া পলাইয়াছে। দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া নিজের প্রতিই আক্রোশ আসিয়া পড়িল, পাগলামি মাথায় চাপিল—ঝোঁকের মাথায় গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম; বৃক্ষারূঢ় অবস্থায় আর রাত্রি কাটাইব না---আস্তানায় ফিরিয়া যাই অথবা যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাক—লোকদের বলিতে দিব না—আমি জঙ্গলে আসি কেবল ছবির মডেল শিকারের জন্য।

গাছে বসিয়া পাতার আড়াল হইতে দেখিতে পাই নাই, নীচে নামিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম কিলের নিকটেই আমার আবিষ্কৃত আশসেওড়া ঝোপের পিছনে বাঘ বসিয়া আছে—তিন ফুটের উপরে বাঘের মাথাটা দেখা যাইতেছে। আহারে বসিবার পূর্ব্বে একবার গরুটার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া লইয়াছিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় অনেক সময় ঝোঁপের অংশ মনগড়া জন্তুর মত দেখিতে লাগে। নিশ্চিত না হইয়া গুলী চালাইলে কেবল ঝোপের খানিকটা অংশ উড়িয়া যাইবে—বাঘকেও এ তল্লাটে পাওয়া যাইবে না।

অতি সন্তর্পণে পিছাইতে লাগিলাম গাছটার আড়াল লইব বলিয়া, ট্রিগারে আঙ্গুল রাখিয়া নড়িতেছিলাম। অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া ফেলিলাম, বাঘ আমার ধীর গতি লক্ষ্য করে নাই, একদৃষ্টে গরুটার দিকে তাকাইয়াছিল। পায়ের তলায় একটি সামান্য কুটি ভাঙ্গিয়া যাইলে কিরূপ অবস্থাটি দাঁড়াইত, অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন। উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছে, বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস আওয়াজ শুনিতেছি, আর দেরী করিলে হয়ত নিশানের সময় হাত কাঁপিয়া যাইবে—সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সুইচ টিপিলাম,···বিরাট বয়ঃপ্রাপ্ত বাঘ, আলো পড়িতে চোখ তাহার ঝলসাইয়া গিয়াছিল, টর্চ্চের দিকে তাকাইয়াছিল---বেশ ভাল করিয়া টিপ করিবার সময় পাইলাম। বাঁচা মরার মাঝখানে পড়িয়া গিয়াছিলাম—আমাদের মাঝে যে ব্যবধান ছিল—তাহাতে এক গুলীতে বাঘ না পড়িলে শিকারীর মৃত্যু সুনিশ্চিত। ট্রিগার টিপিলাম, ঘোড়া পড়িল না—বেশ জোর দিয়া আর একবার টানিতে যাইব, এমন সময় বাঘ লাফ মারিতে মারিতে দূরের ঝোপের দিকে পলাইতে লাগিল; আলোও তাহার পিছু ধাওয়া করিয়াছিল কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই পড়িল না—সেফটি ক্যাচের (safety catch) কথা মনে পড়িতে ঠেলা মারিলাম, কচ করিয়া আওয়াজের সহিত বন্দুক ready হইয়া গেল। বাঘ তখন ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে—উত্তেজনায় বন্দুককে অপ্রস্তুত অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছিলাম। এইরূপ অবস্থায় দুইজন জানা শিকারীকে মরিতে শুনিয়াছি—এখন আলো নিভাইলেই বাঘ আমাকে দেখিয়া ফেলিবে। আহার হইতে বিতাড়িত শার্দ্দূল, জঙ্গলে মানুষকে একলা পাইলে ছাড়িয়া দেয় না। ভাবিলাম দুপাল্লাতেই গুলী চালাইব—গায়ে না লাগিলেও

ফল হইবে—আমার নিকট হইতে পলাইয়া যাইবে। তখন আত্মরক্ষার চিন্তা প্রাধান্য পাইয়া বসিয়াছে—আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়াছি। Ready trigger লইয়া দূরের ঝোপে আলো ফেলিতে লাগিলাম, যদি দুইটি জ্বলন্ত চোখ দেখিতে পাওয়া যায়—অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিতে নিশ্চিন্ত হইলাম, বাঘ নিকটে নাই—থাকিলে নিশ্চয় একবার আলোর দিকে ফিরিয়া তাকাইত।

সামনের বাঘ পলাইতে ভয় আরো বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিল, আস্তানায় ফিরিবার পথেই আর একটি গরু মার খাইয়াছে। গো-খাদক নিশ্চয় আহার ছাড়িয়া নড়ে নাই। উত্তেজনায় দিগভ্রম হইয়া গিয়াছে—কোন দিক হইতে হৈ হৈ শব্দ শুনিলাম, ঠিক নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না। আস্তানায় চলিবার পথে অকস্মাৎ আহাররত বাঘের সামনে পড়িয়া যাইলে বগলে বন্দুক তুলিবারও সময় পাইব না। মনে পড়িল রাজপথের কথা, আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম তাহার অতি নিকটেই পূব দিকে অর্থাৎ চাঁদকে পিছনে রাখিয়া চলিতে পারিলে সড়কে গিয়া উঠিতে পারি। কোন প্রকারে বোর্ডের রাস্তার উপর আসিতে পারিলে সাড়ে নয়টায় বাস পাইয়া যাইব—অথবা দলবদ্ধ পথিকের সহিত দেখা হইয়া যাইবে।

মতি স্থির হইতেই পূব দিকে মুখ ফিরাইলাম, তাহার পর চলা সুরু হইল—ক্রমান্বয়ে ঘন কাঁটা-বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িতেছি, বাধা সামনে আসিলে বন্দুকের ডগা দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছি। কুঁচ ঝাড়ের বন কত আর পরিষ্কার করা যায়, চলার পথে সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। তুচ্ছ আঁচড়ে গতি থামে নাই, অনেকটা পথ আসিয়া পড়িয়াছি। মনে হইল ঠিক রাস্তায় চলিতেছি না, আম গাছ হইতে সড়ক তো এত দূরে নয়। আলো জ্বালাইলাম—সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বিরক্তিপূর্ণ ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনা গেল একটু দূরে। প্রমাদ গণিলাম—যেরূপ ঘন ঝোপের মধ্য দিয়া চলিয়াছি তাহাতে বাঘ তাড়িয়া আসিলে ইচ্ছামত বন্দুকও ঘুরাইতে পারিব না; তবু আন্দাজমত বন্দুক যথাসম্ভব শব্দের দিকে রাখিয়া পুনরায় সুইচ টিপিলাম, সামনা সামনি আক্রমণ মানিতে রাজি আছি—কিন্তু পিছন হইতে লাফাইলে ভবিষ্যতে শিকারের গল্প লেখা আর সম্ভব হইবে না। বাঘ একই জায়গা হইতে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইলাম, আহার ছাড়িয়া বনের রাজা উঠিতেছে না—কিন্তু এখনও নিশ্চিত হইতে পারি নাই, বাঘ একটি না দুইটি। এখন করি কি? স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এবং একের জায়গায় দুইটি বাঘ হইলে পলাতকটি যদি ফিরিয়া আসা মনস্থ করে তো কোন্ দিক দিয়া ফিরিবে, নিশ্চয়তা নাই। ঘাবড়ান বাঘ চলা-পথে সচরাচর ফিরিয়া আসে না—কিলকে কেন্দ্র করিয়া দূর হইতে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শিকারের নিকটস্থ হয়। চিন্তার মাঝে বহু দূরে মোটরের হর্ণ শুনিতে পাইলাম, কাডাপ্পা যাইবার শেষ বাস আসিতেছে—এবার রাস্তা কোন্ দিকে সন্ধান পাইয়াছি। মোড় ঘুরিলাম—কাঁটা-বনের মধ্য দিয়াই একটু দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম, তাড়াতাড়ি চলিবার পথে মাথা ও মুখ কাঁটার ক্ষত হইতে

বাঁচাইতে গিয়া হঠাৎ আল্‌গা শুকনা কণ্টকপূর্ণ ঝোপে পায়জামা আটকাইয়া গেল। আল্‌গা শুকনা ঝোপগুলি ঝড়ের বেগে তালগোল পাকাইয়া অতি বৃহৎ ফুটবলের আকারে বাধাপ্রাপ্ত স্থানে আটকাইয়া থাকে। এই জাতীয় একাধিক গোলাকার ঝোপের মাঝে পড়িয়া গেলে অনেক সময় বাঘ পর্য্যন্ত মাকড়সার লালায় জড়ান কীটের অবস্থায় পড়িয়া যায়। কিছুতেই উহাদের বেষ্টন হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। একটার কাঁটা ছাড়াইলে আর একটি গড়াইয়া গায়ে আসিয়া পড়ে। আমি কাঁটার ব্যূহে পড়িয়া গেলাম, মোটা খাকির পাঞ্জাবী ও পায়জামার সর্ব্বত্র জড়াইয়া গিয়াছে—বাস্তবিক মৃত উদ্ভিদ যেন আমাকে বাঁধিয়া বাঘকে ডাকিতেছিল।

শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া হইয়া টর্চ জ্বালাইয়া পরিচ্ছদ হইতে কাঁটা খুলিতে লাগিলাম। অনেকটা সময় অতিবাহিত হইলে মুক্তি পাইলাম—কতকগুলি কুঁচের কাঁটা দেহে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল।

শুকনা কাঁটা হইতে রক্ষা পাইয়া সবে খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়াছি—অকস্মাৎ বাঘ বেশ জোরে ডাকিয়া উঠিল—আওয়াজটা বিরক্তির নয়, আক্রমণের, বেজায় মোটা গলায় শ্লেষ্মা-জড়িত কাশির মত। মুখ ঘুরাইয়া আলো জ্বালিলাম—নিকটের কোন ঝোপ নড়িতে দেখিলাম না। অনুমান করিলাম, বাঘ মরা গরুটা হইতে দূরে অথবা নিকটে হায়নাকে দেখিয়া থাকিবে। এবার আর আলো নিভাইলাম না। যে দিক হইতে বাঘের আওয়াজ আসিতেছিল, সেই দিকে প্রজ্বলিত আলো ও ভরা বন্দুক ঠিক রাখিয়াই পিছাইতে লাগিলাম, আসশেওড়ার ঝোপ ভাঙ্গিয়া চলিতেছিলাম—খানিকটা এই ভাবে চলিতে পায়ের তলায় সড়কের অনুভূতি পাইলাম। যাক্, ফাঁকায় আসিয়া পড়িয়াছি, রাস্তার অপর ধারে আসিতে অনেকটা নিরাপদ বোধ করিলাম—প্রায় ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা—জঙ্গলের ওপাশ হইতে এতটা খালি জায়গা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ করিতে বাঘেরও বুকের পাটার দরকার হইবে।

অনেক আগে বাসের হর্ণ শুনিয়াছি, এখন গাড়ী এদিকে আসিতেছে কেন, অবশেষে কল বিগড়াইল নাকি?

ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অনতিবিলম্বে বাসের আলো দেখিলাম—আমিও সেই দিকে আলো ফেলিয়া জানাইলাম—মানুষ অপেক্ষা করিতেছে। আলোটা উপরে নীচে ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া-ছিলাম, তাহা না হইলে মোটর-সাইকেল বা গাড়ী ভাবিয়া আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইত।

গাড়ী নিকটবর্ত্তী হইতে একলা মানুষকে দেখিয়া ড্রাইভার গতি থামাইল। গাড়ীতে একটি মানুষেরও স্থান নাই। মাডগার্ডে উঠিয়া বসিলাম, সঙ্গে একটি কপর্দ্দকও ছিল না, কণ্ডাক্-টারকে তাহা জানাইয়া দিলাম। লোকটা আমাকে দয়া করিয়া নিজের সিটে বসাইয়া বাকি পথটার জন্য মাডগার্ডেই স্থান করিয়া লইল। কৌতূহলী হইয়াছিলাম—মাঝপথে বাস থামাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শোনা গেল বাঘ রাস্তায় বসিয়াছিল। অর্থাৎ জঙ্গলে দুইটি বাঘই ঢুকিয়া-

ছিল—পথেরটি আমার আলো দ্বারা বিতাড়িত শার্দ্দূল। সামান্য সহিষ্ণুতার অভাবে হাতে পাওয়া শিকার ছাড়িয়া আসিলাম—এ আক্ষেপ যেমন সারাটা জীবনই আমাকে জ্বালাইবে—তেমনি শিকারে আসিয়া এবার যে শিক্ষা লাভ করিলাম, তাহাও সারাটা জীবন মনে থাকিবে—হৃদয়-মন কণ্ট্রাক্‌টারের দয়া এবং পেনসন-লোভী মিতব্যয়ীর সঞ্চয়।

জঙ্গল

খোসগল্পের মাঝে জঙ্গলের কথা উঠতে, মুখুজ্জে বলতে লাগলেন : গত বৎসরের ঘটনা, কোয়েমবাটোর থেকে জরুরী তার এল, "এখুনি রওনা হও, তিনটে মানুষকে বাঘে নিয়েছে।"

মুখুজ্জেমশাইয়ের শিকার-কাহিনী মানে খাঁটি সত্যি ঘটনা। আমরা গুছিয়ে বসলাম, মুখুজ্জেমশাই বলে চললেন :—

শিকারের তোড়জোড় আমার প্রস্তুতই থাকে, যে কোন একটা ছুটি পেলেই শহর ছেড়ে পালাই। কালবিলম্ব না করে টিকিট কিনতে পাঠিয়ে দিলাম।

কোয়েমবোটরে যখন এসে পৌছলাম তখন বেলা চারটের কাছাকাছি। বন্ধু তাঁহার কারবারের লড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ঘণ্টাখানেকের ভিতর কারখানায় এসে উপস্থিত হলাম।

জঙ্গলে যাবার জন্য গরুর গাড়ী ঠিক করা ছিল। হাতে কিছু শুকনো খাদ্য দিয়ে বন্ধু বললেন, "মা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়, এখন তোমার সঙ্গে ঘরোয়া কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যেতেও হবে অনেকটা পথ, আলো থাকতে থাকতে সব বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়া ভাল। একটু সাবধানে চলো বাপু, মানুষখেকো বাঘ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আছে। বাঘিনীর চরিত্র তেমন সুবিধার নয়, আবরু মানে না। দিনের বেলাতেই খোলা জায়গায় লোকজনের সামনে বেরিয়ে আসে। 'Shoot to kill', কথাটা মনে রেখো।"

ভদ্রাচার সম্বন্ধে বন্ধুর উদারতায় বাধিত হলাম। বাস্তবিকই সংসারের যাবতীয় জীবের কুশল জিজ্ঞাসা করার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না।

ব্যস্ততার তাড়ায় গাড়ীতে উঠে বসলাম। কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়োয়ানকে বললাম, চালাও।

পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে চলেছি। ঘণ্টাখানেক ধরে চাকা চলেছে, যাবতীয় হেঁচকা সহ্য করে গন্তব্য স্থানের অপেক্ষায় বসে আছি। শেষ পর্যন্ত গাড়ী জঙ্গলের দিকে ফিরল। গাড়োয়ান চারদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "এইখানেই দুটো মানুষকে নিয়েছিল।" সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত অর্থপূর্ণ মনে হল। রাইফেলে টোটা ভরে নিলাম। হাই ভেলসিটি (High velocity) ভরা বন্দুক হাতে আসতে একটু হামবড়া ভাব এসে গিয়েছিল। তাগমারি সম্বন্ধে আমি একটি নাম করা ব্যক্তি, সুতরাং মনের এইরূপ পরিবর্ত্তন দোষণীয় ভাবা উচিত নয়।

এক কদম, দুই কদম করে গাড়ী খাড়াইয়ের দিকে উঠছে, গতি অতি মন্থর। অনেকটা পথ এসে পড়েছি, অথচ মাচান বাঁধার লোকেদের সঙ্গে দেখা নেই। জঙ্গল এদিকে ক্রমান্বয়ে

গভীর হয়ে আসছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক সেই যে স্থরু হয়েছে তার থামবার নামটি নেই। মাইলের পর মাইল এক নাগাড়ে ঐ ডাক স্বকর্ণে না শুনলে বোঝাবার উপায় নেই, কেন মনে হয় বিপদ সর্ব্বত্র ওৎ পেতে আছে।

জঙ্গলের রাস্তা 'Rolls Royce' চলার জন্য প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং লেভেল সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উঠতে পারে না। মাথা উচু করা, নুড়ীর ঠোক্করে চাকার উত্থান ও পতন সমভাবে চলেছে। লোহা এবং পাথরের সংঘর্ষণে পাহাড়ের গায়ে যে শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছিল তা আধুনিক ধর্ম্মান্ধ শহরে লোক বোমা ফাটা ভাবলে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নেই। হাওয়া অনুকূল হলে জঙ্গলে ঐ ঠক্করের আওয়াজ মাইলখানেক দূর থেকে শোনা যায়।

রাস্তার বাঁদিকে, চাকার হাতখানেক পাশেই গভীর খাদ। নীচে খানিকটা সমতল জমি দেখা যায়। সমতল জমির প্রান্তে ঘন ঝোপ। আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ঐ ঝোপের দিকে।

ডগা নড়ছে এবং পিছন থেকে আমাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ী ও ঝোপের মাঝে যে ব্যবধান তা কতকটা নিরাপদ বলা চলে। ঝোপের তলায় যে জানোয়ারই থাক জখম হয়ে তেড়ে এলেও আর একবার গুলি চালানোর অসুবিধা ছিল না। নিশানার অহমিকা ও দিনের আলোর যোগ ঘটায়, একটা নল খালি করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম, আন্দাজেই গুলি চালাব ঠিক করে ফেললাম। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, বন্ধুর উপদেশ চাপা পড়ে গেল। বাঘের শিকারে এসে জঙ্গল ঘাবড়ে দেওয়া যে কতটা বোকামি তা আমি জানতাম, তথাপি ছেলেমানুষি কেন আমাকে পেয়ে বসল বলতে পারি না।

গাড়ীর হেচকার সঙ্গে নিশানা করা চলে না। আদেশ অনুসারে গাড়োয়ান গাড়া থেকে নেমে বলদ দুটোর সামনে দাঁড়াল। বন্দুক তুলে ট্রিগার (Trigger) টিপতে যাব, হঠাৎ বলদের ঝটকায় নিশানা নড়ে গেল। ফিরে দেখি বাঁদিকের বলদ রুখে দাঁড়িয়েছে, চাকা একেবারে খাদের কিনারায়, গাড়োয়ান কিনারার বলদটাকে রাস্তার মাঝখানে আনবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি স্থরু করে দিয়েছে।

গতিক সুবিধার নয়, ভরা রাইফেল নিয়েই রাস্তায় লাফিয়ে পড়লাম। চাকা ডিঙ্গিয়ে আসতে হয়েছিল, টাল সামলাতে না পারায়, বন্দুকের ডগাটা মাটিতে গেল ঠুকে। মাছি (front sight) স্থানভ্রষ্ট হল কিনা কে জানে। পরীক্ষায় দমে যাবার মত কিছু পেলাম না বটে, কিন্তু রেডি (ready) ট্রিগারের উপর আঙ্গুলের চাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, কি সর্ব্বনাশ, ভরা বন্দুকের নল গাড়োয়ানের দিকে। ট্রিগার পড়লেই মানুষ খুনের দায়ে জড়িয়ে যেতাম।

আঙ্গুল সরাতে গিয়ে দেখি কল ঠিক চলেছে তবে টোটা ফাটে নি। বন্দুক খুলে টোটা বার করে আনলাম। যা সন্দেহ করেছিলাম তাই ঘটেছে, শিকারের গোড়াতেই গলদ বাধিয়ে বসেছি। তাড়াহুড়োয় নতুন কার্ত্তুজ ফেলে পুরাতন গুলি নিয়ে এসেছি।

ইতিমধ্যে আর একটি বিপদ এসে উপস্থিত। নিশানার লক্ষ্যস্থল থেকে দুটি বাঘের বাচ্চা, বেশী বড় নয়, বেরিয়ে এসে খোলা জায়গাটায় হাজির। হাওয়া ঐদিক থেকেই বইছিল, ডান দিকের বলদ সন্দিগ্ধ হয়ে বাঁদিকে ফিরতেই খাদ্য খাদকের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গেল। পরিচয়ের পালা যে দৃশ্যের সৃষ্টি করলে, তা slow motion cine camera-র ছবি ছাড়া বোঝাবার উপায় নেই। ডান দিকের বলদ যোৎ ছিঁড়ে সোজা সামনে ছুট দিলে। সঙ্গে সঙ্গে এক বগ্‌গা গাড়ী বলদসহ উল্টে বাঁদিকের গভীর খাদে গড়াতে লাগল।

বাঘের বাচ্চা শিকারকালীন এইরূপ ঘটনা বোধ হয় কখনও দেখেনি। বলদসহ ওলট-পালট খাওয়া গাড়ী তাদেরই দিকে তেড়ে চলেছে দেখে, ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। এই সময় ঝোপের ভিতর থেকে যে গর্জ্জন শুনলাম, তাতে অতি বড় সাহসীকেও একবার ইষ্ট দেবতা স্মরণ করে নিতে হয়। আমাদের ভাগ্য ভাল, বড় বাঘ বেরিয়ে এল না।

গাড়ী গড়াতে গড়াতে একটি গাছের গুঁড়িতে আটকে গেল— বলদ চাল-খসা কুমড়োর মত তখন গড়িয়ে চলেছে। মাধ্যাকর্ষণের টান শেষ পর্য্যন্ত তাকে সমতল জমির উপর নিয়ে এসে ছাড়ল। জন্তুটার হাড় গোড় বোধ হয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই পারল না।

গাড়োয়ান এই সময় সামনের গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে নীচে নামতে লাগল। বাঘের মুখে এগোবার সময় আমাকে কাতরভাবে অনুরোধ করলে বন্দুক প্রস্তুত রেখে পিছু নিতে। ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্ধকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধ মত।

টোটাহীন বন্দুক নিয়ে, তাড়া-খাওয়া বাঘের সামনে যাবার সাহস আমার ছিল না। আমি উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভাঙ্গা ডাল ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়োয়ান বলদটার নিকটে গিয়ে উপস্থিত। পিঠ চাপড়ান, আদর, তিরস্কার, পদাঘাত সব কিছুই চলল কিন্তু বলদ উঠে দাঁড়াল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে গাড়োয়ান উপরে উঠে আসতে লাগল। দুচার পা উপরে ওঠে, পিছন ফিরে তাকায় আবার সামনে অগ্রসর হয়—এইভাবে রাস্তায় এসে উপস্থিত হল।

দৃষ্টি তার করুণাপ্রার্থী নয় বরং ভ্রূ-কুঞ্চিত। আমার প্রতি কেমন একটা অবজ্ঞার আভাস পাচ্ছিলাম। খুবই স্বাভাবিক। প্রথম কারণ, আমার সাহসের পরিচয়, দ্বিতীয়, বলদটার দুরবস্থার জন্য আমিই দায়ী। সামান্য বকশিসের লোভে বেচারাকে বিরাট মূলধন হারাতে হল।

অতবড় ক্ষতির কারণ হয়ে, সান্ত্বনা দেবার সাহস ছিল না। গাড়োয়ান নিকটে আসতে বললাম, আমার টোটা নেই, শিকার হবে না, গ্রামে ফিরে চল। গাড়োয়ান আমার বন্দুকের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসির পিছনে শ্লেষ মারমুখি হয়ে উঠেছিল, জানালে, গ্রামে ফিরবার আগেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আর কিছু বলবার ছিল কিন্তু চেপে গেল। অব্যক্ত যা রইল তা

অনুমান করে নিতে অসুবিধা হল না। লোকটা অধিক বাক্যব্যয় না করে সামনে এগোতে লাগল। মহাজনের পথানুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

মোড়ের পর মোড় ঘুরে চলেছি। কোথায় চলেছি, আর কতটা যেতে হবে, জানবার তাগিদ এলেও মনের কথা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। গাড়োয়ানের চলার ভঙ্গী দেখে বুঝেছিলাম, এ তল্লাটে ওকে থামিয়ে কথা বলা যাবে না।

গভীর খাদ অনেকক্ষণ পিছনে ফেলে এসেছি। আর খানিকটা এগোতে সামনে খোলা জমি পাওয়া গেল। রাস্তার উপরেই সদ্য-কাটা ডাল-পালা পড়ে রয়েছে।

এতক্ষণে গাড়োয়ানের মুখ ফুটল, জানালে কাছেই মাচান আছে—লোকজনদের ডাকলেই পাওয়া যাবে। আশ্বাসবাণীতে মারাত্মক হাসি ক্ষমা করে ফেললাম। বার তিন চার সিটি মারতেও কোন উত্তর না পেয়ে—আমাকে অনুসরণ করতে বললে। একটু ঘোরাঘুরি করতেই মাচান খুঁজে পাওয়া গেল। লোকটার গা ঘেঁসেই প্রায় অনুসরণ করেছিলাম।

মাচানের কাছে এসে দেখি, গাছের গুঁড়ির চারধারে বিষাক্ত কাঁটা-বন। ঐ কাঁটার সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় একবার সেপটিক হয়ে মরতে বসেছিলাম। ঠিক মাচানের নীচেই উইয়ের ঢিপি, আশঙ্কাপূর্ণ গহ্বর গায়ে জড়িয়ে আছে। গহ্বরগুলোকে আমি যমের মত ডরাই। কতবার যে ঢিপির কাছে বিভীষিকা দেখেছি বলতে পারি না। ঘটনাগুলি চলচ্ছবির মত চোখের সামনে উপস্থিত হতে গাড়োয়ানকে আগে উঠতে বললাম, কথায় বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' তলায় যদি কিছু থাকে তো গাড়োয়ানকেই আগে নেবে।

গাছে ওঠার আদেশ এমন ক্ষিপ্রতার সহিত পালিত হল যে, কি ভাবে উপরে উঠে গেল দেখবার অবকাশ পর্য্যন্ত পেলাম না। ওদিকটা নজর রাখতে পারলে অন্ততঃ কোন্ কোন্ ডালে পা দিয়ে উপরে গেল হিসাব রাখতে পারতাম, ওঠা সহজ হয়ে যেত। হিসাব না রাখলেও ওঠার তাড়া কম ছিল না; চোখ কান বুজে কোনপ্রকারে মাচানে এসে পৌঁছালাম। রাইফেলের বোঝা নামাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম।

মাচান অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বসবার জায়গায় একটিমাত্র এড়ো ডাল, অত্যন্ত সাবধানে না বসলে হঠাৎ নীচে পড়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। গাড়োয়ানের পাশে এবং আমার পিছনটায় আড়াল দেবার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। সামনে এবং আমার পাশে একেবারে খোলা।

শিকার যখন নেই তখন কথা বলার বাধা ছিল না। অসমাপ্ত মাচান ও লোকেদের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলাম, কৌতূহল দমন করা সম্ভব হল না, জিজ্ঞাসা করলাম, "লোকগুলো গেল কোথায়?" উত্তরে গাড়োয়ান আচ্ছা করে চিমটি কেটে ইসারায় কথা বলতে বারণ করলে। ছোটলোক সুবিধা পেয়ে মনের সাধে নখ বসিয়ে দিয়েছিল।

বিরক্তির উচ্ছ্বাস সরল ও সঙ্গত হলেও আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল, অকস্মাৎ কোন একটা দুর্ঘটনার জন্যই সব পালিয়েছে। অধিকতর অশোভনীয় ব্যবহার সুনিশ্চিত জানতাম তথাপি মহাজনের আদেশ অমান্য করে জিজ্ঞাসা করতে হল, "কথা বলতে বারণ করছ কেন, বাঘ কাছে থাকলে তো মানুষের গলা শুনে পালাবে।"

গাড়োয়ান কানের কাছে এসে, ত্বক ও জিহ্বার শোষণ শব্দের সহিত, চুপি চুপি জানালে, এ মহাল্লার বাঘ পালায় না, আর কাছে আসে, পুস্ট মানুষ বাছাই করে শিকার ধরে। প্রশ্নোত্তরে আমার উপর বিশেষ ইঙ্গিত ছিল, নিরুপায় হয়ে কৌতূহল সংযত করলাম।

ঠিক এই সময় ওজন করা, সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ শোনা গেল, আগন্তুক পরিচিত, বাঘ কাছে এসে গিয়েছে। একটু পরেই হাড় ভাঙ্গা আর মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ আসতে লাগল। যেটুকু আড়াল ছিল তারই আশ্রয় নিয়ে গাড়োয়ানের গা টিপলাম। সে একই প্রথায় জানাল, নীচে যা ঘটছে তা সে জানে।

নরভুক্ বাঘের নানা চরিত্রের ব্যাখ্যা শুনেছি, যে এসেছে, তার চরিত্র যদি বিগড়িয়ে গিয়ে থাকে তা হলে···বেশী আর ভাবতে হল না, আশঙ্কা বাস্তব হয়ে উঠল। পরক্ষণেই একাধিক জানোয়ার মাচানের তলায় এসে উপস্থিত। ঠিক আমাদের তলার ডাল দারুণভাবে দুলতে লাগল। বাঘ মাচানের উপরে আসার চেস্টা চালিয়েছে—বার দুই ঝাঁকুনিতেই ডাল ভেঙ্গে গেল, তার সঙ্গে ভারী ওজনের শরীর—উইয়ের ঢিপির উপর আছাড় খেল। পরমুহূর্ত্তে সাপের ছোবল পড়তে লাগল একটার পর একটা।

নখী ও বিষধরের বোঝাপড়ার শেষ নিষ্পত্তি কোথায় দাঁড়াবে জানবার সুবিধা না থাকলেও তখনকার মত মাচানের মরণ-দোলা থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

অন্ধকার ইতিমধ্যে ঘনঘটা করে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক বন্ধ, জঙ্গল নিস্তব্ধ। একটু নিশ্চিন্ত ভাব আসছিল কিন্তু ধাতে সইল না।

মাচানের উপরে ঠিক আমার পিছন দিককার পাতা নড়া সুরু হয়ে গেল। সন্দেহ পিছু নিয়েইছিল, তবু মনকে স্তোক দিলাম, টিকটিকি বা গিরগিটি হবে।

নড়া ক্রমান্বয়ে আমার জানুর পাশে এসে উপস্থিত, সাংঘাতিক অনুভূতি, সাপ চলেছে গা ঘেঁসে, কপাল দিয়ে কালঘাম ছুটতে লাগল, কাঠ হয়ে বসে রইলাম। সরীসৃপ এগিয়ে চলল গাড়োয়ানের দিকে। পাতার আড়াল পেতেই গতি থেমে গেল। লোকটার দুর্ভাগ্য, এই সময়টিতেই তার নড়ে বসা দরকার হল। কোথায় হাত রেখেছিল কে জানে, হঠাৎ উঃ করে উঠল, বললে বিছে কামড়েছে। কাতর ধ্বনিতে আমার রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। কানের কাছে মৃত্যু ডাক দিয়ে চলেছে, কতকটা হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছি।

মিনিট পনের পরেই বিষের ক্রিয়া সাড়ম্বরে সুরু হয়ে গেল। যম আর মানুষে

ঘণ্টাখানেক ধরে ধস্তাধস্তির পর গাড়োয়ান নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত লোকটা মরল। আমি মুড়া আগলে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে রইলাম।

লোকটা অনেকক্ষণ মরেছে, পাতা নড়াও থেমে গিয়েছে। গাড়োয়ানের দারুণ ঝটাপটিতে সাপ নীচে নেমে গিয়ে থাকবে। ঝিন্‌ঝিনির যাতনা ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে ওঠায় মরিয়া হয়ে উঠলাম। যা থাকে কপালে হবে ভেবে, অতি সন্তর্পণে পা নাড়ালাম। কপালগুণে কিছু ঘটল না।

সময় কেটে যাচ্ছিল, গাঢ় অন্ধকার ভারী ওজনের মত আমাকে চাপ্‌তে আরম্ভ করেছে। অকস্মাৎ গুরুগম্ভীর ডাকে ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠল, প্রেত-লোকের সাড়া—ভূত—ভূত—ভূত। ডাকের সঙ্গে কে যেন ধাক্কা মেরে সামনে ঝুঁকিয়ে দিল। ঝাঁকুনির ঘোর কাটিয়ে দেখি, বিপদের মাঝেও তন্দ্রায় ঝুঁকছিলাম, হুতুম পেঁচটা তখন ডেকে চলেছে, ভূত—ভূত—ভূত। ঘুমের জের বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা গেল না, হাল ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন মুখের উপর রোদ এসে পড়তে জাগা-জগতে ফিরে এলাম। চোখ রগড়ে দেখি গাড়োয়ান মাচানে নেই। চমকে গিয়েছিলাম, ধীরে গত রাত্রের ঘটনা মনে আসতে লাগল। যেখানে গাড়োয়ান বসেছিল সেই জায়গাটা হাঁ হয়ে আছে। নীচে তাকাতে দেখি উইয়ের ঢিপির উপর গাড়োয়ান চিৎ হয়ে পড়ে আছে, চোখ দুটো খোলা, কোটরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, দিনের বেলা দেখলেও ভয় লাগে।

বেলা বেড়ে চলেছে, কুলীরা কেউ নিতে আসে নি। রাস্তা দিয়েও লোক চলে না, অথচ কুপেতে যাবার নাকি এই একটিমাত্র পথ। বিবেচনা করে দেখলাম, সাপের কেল্লার উপর বসে থাকা অপেক্ষা রাস্তায় নেমে পড়া ভাল। বিপদে পড়লে অন্ততঃ চোঁ চাঁ দৌড় মারতে পারব। সিদ্ধান্ত ঠিক হতেই মাচানের বাইরে পা বাড়ালাম। মনে পড়ল মাংস ছেঁড়ার কথা, সাবধানের মার নেই, ওদিকটা দেখে নেওয়া ভাল। সন্ধানের স্থান খুঁজে বার করতে সময় লাগল না। নিকটেই একটি ঝোপের তলায়, মানুষের ছিন্ন হাত ও পায়ের শেষাংশ দেখতে পেলাম। নীচে নামবার আগে অনেকক্ষণ কান পেতে রইলাম, কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। নিশ্চিন্ত হলাম নরভুক্ কাছাকাছি কোথাও নেই। সাপের তাড়া যখন খেয়েছে তখন এদিকে ফিরবে বলে মনে হয় না।

মাচান থেকে নেমে এলাম।

একলা পথে চলতে হলে আত্মরক্ষার জন্য কোন হাতিয়ার সঙ্গে থাকা দরকার। অকেজো রাইফেল কায়েমি করে পিঠে বেঁধে, এই মহাল্লার স্বদেশী অস্ত্র খুঁজতে লাগলাম। খোঁজায় আন্তরিকতা ছিল, একটি মাচান-বাঁধা পরিত্যক্ত ডাল সংগ্রহ হয়ে গেল।

চলতে সুরু করলাম। ঠিক করে ফেলেছিলাম আর জীবনে কখনও শিকারে আসব না। ভারী রাইফেলের ওজন প্রতিটি পদক্ষেপে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। দামী বোঝা ফেলেও দিতে পারছিলাম না, দিয়ে দিলেও একজনকে কৃতজ্ঞ করা যাবে। কৃতজ্ঞতার কথা মনে আসতে আপন মনেই হেসে উঠলাম, মহাত্মা বিদ্যাসাগরের কথা এই সূত্রে মনে পড়ল, তিনি না কি বলেছিলেন, "বল কি, লোকটা আমার নিন্দা করছে, কৈ আমি তো তার কোন উপকার করিনি।" এমন একটি দার্শনিক সত্য সামনে থাকতে কেমন করে কৃতজ্ঞতার কথা মনে এল বুঝতে পারলাম না।

পথ চলতে চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। রাস্তা গোলমেলে ঠেকতে চমক ভাঙ্গল। আনমোনা অবস্থায় একটা চৌমাথা ফেলে এলাম না? মাচানে যাবার পথে চারটি রাস্তার সঙ্গমস্থল তো চোখে পড়ে নি। তবে কি ভুল পথে চলেছি নাকি? দ্বিমতের ফাঁক ছিল না। পায়ের তলায় দেখি শ্লেট (slate) পাথরে বাঁধান প্রশস্ত রাস্তা—একসঙ্গে দুইটি গাড়া পাশাপাশি চলতে পারে। পাথরের বুকে গাড়ী চলার দাগ গভীর হয়ে বসে গিয়েছে। দাগের উপরেই বাবলা, তাল বা বটগাছ, কোথাও বেড়ে উঠেছে, কোথাও মরেছে। আদিম কালের পথ আজ পরিত্যক্ত। দাগের উপর গাছের জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

চলার পথে রাস্তার রূপও পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছিল। উপরে ওঠা ও নীচে নামার জন্য ঝকঝকে সিঁড়ির ধাপ। আমি চলেছি, ভুল পথেই চলেছি। যেখানে গিয়েই উঠি লবী চড়ার সড়কের দিকে কোন গ্রামে গিয়ে পৌঁছাব। চলার প্রধান উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে কোন প্রকারে লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছান, পেট ভরে ঠাণ্ডা জল খাওয়া। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, জল চাই।

অনেকটা পথ পাড়ি দেবার পর সামনে এড়োভাবে আর একটি রাস্তা দেখতে পাওয়া গেল। রাস্তার দু'ধারে বাবলা গাছের জঙ্গল। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে আকাশ-স্পর্শী মন্দিরচূড়া দেখা যায়।

মন্দিরের সন্ধান যখন পেয়েছি তখন তৃষ্ণা নিবারণ হবেই। দাক্ষিণাত্যে দেবালয়-সংলগ্ন জলাশয় প্রতিষ্ঠা একটি অবজ্ঞনীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান। জোরে পা চালিয়ে দিলাম। তে-মাথায় এসে মন্দিরের দিকে ফিরতেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হল। সামনেই কয়েক হাতের ভিতর প্রকাণ্ড বাঘ, আপন মনে থাবা চাটছে। মুহূর্ত্তে সম্মোহিতের মত হয়ে গিয়েছিলাম। বাঘ মুখ তুলে তাকাতে চারি চক্ষুর মিলন ঘটল। উভয়ের দৃষ্টি অপলক, উভয়ে নিশ্চল। কার সঙ্গে দৃষ্টির আদান-প্রদান চলেছে জেনেও চোখ ফেরাতে পারছি না। হঠাৎ কোন কঠিন পদার্থে মাথার পিছনটা ঠুকে গেল। ধাক্কায় টর্চ-লাগান বন্দুকের ডগা সামনে এসে পড়েছিল। এর ঠিক পরের ঘটনা মনে নেই, ভয়ে বেহুঁসের মত হয়ে গিয়েছিলাম।

ধাতস্থ হয়ে দেখি বাঘ নেই। আমি পাথরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কি ভাবে এখানে এসে পড়লাম বলা শক্ত। খুব সম্ভবতঃ সম্মোহিত অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতেই পিছু হাঁটছিলাম। পাশ ফিরতে নিকটেই কবাটহীন তোরণদ্বার দেখতে পেলাম—একটা কিছুর আড়াল দরকার হয়ে পড়েছিল, ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

সামনেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। উঠানের শেষে একটি ছোট মন্দির, কবাট ভগ্ন, লোহার আঁকশিতে ঝুলছে। ভিতর গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারই এখন আমার আশ্রয়। ভিতরে ঢুকতে চামসে গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল—তার উপর অসংখ্য চামচিকের ডানার ঝাপটা, ভিতরে থাকা গেল না।

বাঘের আড্ডায় মাটিতে থাকাও নিরাপদ নয়। উঁচু জায়গা খুঁজতে লাগলাম। পাঁচিলের উপর দৃষ্টি পড়ল, দেখতে কতকটা দুর্গপ্রাকারের মত। কামান চালাবার গর্ত্ত যখন আছে তখন উপরে ওঠার পথও থাকা স্বাভাবিক। সামান্য চেষ্টাতেই পথ খুঁজে পাওয়া গেল। কামান তোলার রাস্তা চক্রাকারে উপরে উঠে গিয়েছে। গাছের ছায়ায় স্থানটি অসূর্য্যম্পশ্যা হওয়ায় শেওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। বারকয়েক চেষ্টা করেও ওঠার সুবিধা করতে পারলাম না। গোড়ার দিকে কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হলেও মাঝপথে যদি পা পিছলায় তাহলে ১৩, ১৪ ফুট উপর থেকে গড়াতে হবে। পাশে আল নেই, গড়ালে কোথায় এবং কিভাবে পড়ব তারও ঠিক নেই—প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত অবস্থা।

তৈরী পথ ছাড়তে হল। এদিকে আসবার সময় একটি অতিকায় লতা দেখেছিলাম, পাঁচিলের গায়ে লাগা ঐ পথে ওঠা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখা দরকার। ছেলেবেলা অনেক রকম বাঁদরামি করেছিলাম, জিমনাষ্টিকের (Gymnastics) কেরামতি কাজে লেগে গেল। খানিকটা উপরে উঠে দোল খেয়ে পাঁচিলের উপর এসে উপস্থিত হলাম।

রীতিমত চওড়া পাঁচিল। পাঁচিল বললে ভুল হয়, পাঁচিলের ছাদ বলাই শোভনীয়। চার ধারে ভাঙ্গা আগ্নেয় অস্ত্র ও নরকঙ্কাল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, ওগুলো কোন্ ইতিহাসের নথী কে জানে। সামনে, বাঁয়ে, ডাইনে, কেবল বাবলা গাছের জঙ্গল, কোনদিকে জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

বাঘের ভয় ছিল না, রিফ্লেক্টারে রৌদ্র-রশ্মি পড়ায় নিশ্চয় ভড়কিয়ে পালিয়েছিল। তা না হলে পাতে তুলে দেওয়া আহার বাঘ ফেলে পালায় না। এটা অভিজ্ঞতার কথা, সুতরাং নিশ্চিন্ত হওয়ায় বাধা ছিল না।

তৃষ্ণায় টাকরা শুকিয়ে গিয়েছে, জলের সন্ধান না পেলেও—মন বেকার ছিল না, Auto-suggestion এর মত জলপ্রপাতের ক্ষীণ কলধ্বনি শুনতে পেলাম। শব্দ মন্দিরের পিছন থেকে আসছিল।

আশা-মরীচিকার মত ধাবণাকেই সত্য বলে ভাবতে লাগলাম। জলের ডাক ক্রমান্বয়ে এমনই বাস্তব হয়ে উঠল যে, পাঁচিল থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলাম।

ঠিক এই রকম শব্দ মহানন্দীর জঙ্গলে শুনেছিলাম। সত্যই অন্তঃসলিলা নন্দীকে স্নান করিয়ে বিরাট বাঁধান পুকুরের দিকে বয়ে যেত। পুকুব থেকেই ঝবণাব সৃষ্ট—অধিকন্তু জল স্রোতস্বিনী হয়ে পাহাড়ের তলায় পড়ত।

প্রাঙ্গণের চার ধারে পাঁচিল, জলাশয়ে যাবার পথ মন্দিরের ভিতর দিয়ে থাকা সম্ভব। অস্পৃশ্যদের বাধা দিবার জন্য পুরোহিত এইখানে দ্বারীর ন্যায় অপেক্ষা করত কিনা কে বলতে পারে। শুচিতা সম্বন্ধে এদের দৃষ্টি প্রখর, সুতরাং ধাবণা পরীক্ষা কবে দেখা ভাল।

গাঢ় অন্ধকার ও উৎকট গন্ধ অগ্রাহ্য করে পুনরায় মন্দিরের ভিতব ঢুকলাম। দ্বারের সন্ধানে ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কতবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম বলতে পারি না। খোজার তাগিদ আমাকে উন্মাদের মত করে তুলেছিল। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্য্যন্ত চক্র লেগে গেল। দেওয়াল ধরে বসতে যাবার সময় হাতে লোহার কড়ার মত কি ঠেকল।

চক্রের ঘোর সামলাতে কড়া ধরে টান মারলাম, মবচে-পড়া কড়ার সংঘষণ যে আওয়াজ তুলল তা জনমানবহীন আবেষ্টনীতে অস্বস্তিকর। শব্দ অস্বস্তিকর হলেও আশা তখন সতেজ হয়ে উঠেছে, দ্বারের সন্ধান পেয়েছি, শব্দের সহিত কিঞ্চিৎ আলোক-রশ্মি দেখতে পেলাম। উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম—সর্ব্বশক্তি দিয়ে কড়া টেনে চললাম, কিছুক্ষণ সচেষ্ট থাকায়, অকস্মাৎ বন্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। সামনেই বিরাট জলাশয়, বাঁধান পুকুব, স্ফটিক জল থৈ থৈ করছে।

ছুটে গেলাম পরম বাঞ্ছিতের দিকে। পানীয় জল এত মধুর হতে পারে কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না। পরম পরিতোষের সহিত জল খেলাম। আশা আর মিটতে চায় না। সমস্ত রাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কেটেছিল, শরীর তেতে আগুন হয়ে গিয়েছে। অবগাহন স্নানের লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

জলে ডোবা ধাপে পা পড়তেই, কে যেন তলা থেকে আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিলে। একসঙ্গে অনেকগুলি ধাপ পিছলে তলিয়ে গেলাম। অথৈ গভীবতায় এসে পৌঁছাতে অক্টোপাসের (Octopus) মত জীব চার ধার থেকে ঘিবতে লাগল। স্পর্শ তাদের নরম কিন্তু বাঁধন কঠিন ও জ্বালাময়। বাঁচার আশা তখন ছাড়ি নি—বহু চেষ্টায় হাত দুটো খালাস পেতেই ভেসে উঠতে অসুবিধা হল না।

সিঁড়ির কাছেই উঠেছিলাম, দম তখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, পায়ে ভব দিয়ে ওঠবার শক্তি নেই। ধাপের উপর ভর দিয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, যথাস্থানে সামান্য দেহভার পড়তেই আবার পিছলে গেলাম। এইটুকু রক্ষা, প্রস্তুত ছিলাম বলে তলিয়ে

যেতে হয় নি। শেষ পর্যান্ত বিপদসঙ্কুল কেন্দ্র থেকে দাঁড় সাঁতার কেটে শেওলা উপ্‌ড়ে ফেলতে হল। পাড়ে উঠে আসতে দেখি সমস্ত দেহে ঝাঁঝি জড়িয়ে আছে। সময়মত উপরে উঠতে না পারলে হিংস্র উদ্ভিদ আমাকে নিঃশেষ করে ছাড়ত।

প্রাণ নিয়ে টানা-পোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, দেহটা এলিয়ে দেবার জন্য একটি মনোমত জায়গা খুঁজতে লাগলাম। নিকটেই আম গাছ, তলায় ছায়া ছিল—ধুলো পরিষ্কার করে শুয়ে পড়লাম। বেলা পড়িয়ে ঘুম ভাঙ্গল।

ক্ষুধাগ্নি প্রবল হয়ে উঠেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে গাছের ফল খুঁজতে লাগলাম। শুষ্ক তরু, গাছের ডগাগুলো পাকিয়ে গিয়েছে—গাছে একটিও ফল নেই।

পুকুরের ও-পাড়ে অনেকগুলি আম গাছ দেখা যায়। এগুতে লাগলাম। পাড়ের দু'ধারেই ফলে ভরা নারকেল গাছ রয়েছে। উঠতে সাহস পেলাম না, বয়স পাহারায় ছিল, ভয় ধরিয়ে দিল। খানিকটা ঘোরাঘুরির পর রসাল ফলের সন্ধান পাওয়া গেল। পাকা আমগুলি সবই উপর ডালে। মালকোঁচা মেরে গাছে চড়তে হল।

সুমিষ্ট ফলাহারে আরাম পাচ্ছিলাম। আস্বাদের দিকটা খেয়াল রাখবার অবসর পাই নি। ক্ষুধার তাড়নায়, পরিমাণ তখন প্রাধান্য পেয়ে বসেছে। ফলে শাঁসের চেয়ে আঁশের ভাগই বেশী—নিংড়ে ভিন্ন খাবার উপায় নেই। নিষ্কাশনে রস একেবারে স্রোতস্বিনী হয়ে উঠল। অতি সভ্য কেহ কাছে থাকলে বলে বসত, এঃ—গাময় মেখে ফেলেছে। সত্যের ঐখানেই শেষ নয় - গাময় তো তুচ্ছ ব্যাপার, আসলে উপচে-ওঠা রস গাছময় ছড়িয়ে ফেলে ছিলাম। আহারে পূর্ণ তৃপ্তি আসার আগেই বিঘ্ন ঘটল, একটা দুটো করে পিঁপড়ে কামড়াতে সুরু করে দিলে। প্রথমটা গ্রাহ্য করি নি, পরে কামড়ের কেন্দ্র বাড়তে লাগল, বসার জায়গায় তাকিয়ে দেখি ডালময় পিঁপড়েয় ভরে গেছে। গাছের উপর থাকা চলল না—নীচের ডালে পা দিয়ে নামতে যাচ্ছিলাম, দেখলাম পিঁপড়ের বিরাট বাহিনী তিন-চার দিক দিয়ে উপরে উঠে আসছে—পা রাখবার আর খালি জায়গা নেই। আক্রমণকারী পল্টন চার ধার থেকে আমাকে ঘিরেছে—এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়—ডালের উপর থেকেই লাফিয়ে পড়লাম।

মাটিতে পড়ে আর উঠতে পারি না। মনে হল হাঁটু দুটো চিরকালের জন্য জখম হয়ে গিয়েছে। যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলাম তার কাছেই যে সৈন্যাধ্যক্ষ আমার অপেক্ষায় বসেছিল, কি করে জানব। রসসিক্ত চ্যাটচেটে কোট অনেকগুলি পিঁপড়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সেগুলিকে আলাদা করতে একটু সময় লেগেছিল, এর ভিতর একদল গাছের গুঁড়ি পরিত্যাগ করে আমার দিকে চলে আসতে লাগল। আমাকেও চলতে হলো হামা দিয়ে, বালসুলভ গতি আধুনিক আর্টে কাজে লাগলেও আমি সুবিধাজনক বোধ করলাম না, পিঁপড়ের দল শনৈঃ শনৈঃ আমার নিকটে এসে পড়ছে—উঠে দাঁড়াতে হল। জখমী হাঁটু নিয়ে আর কত দ্রুত চলা যায়—

পিপীলিকার দল ডিসিপ্লিন্‌ড্ (disciplined) চালে আমার পিছু নিয়েছে—গত্যন্তর না থাকায় বাস্তবিকই খুঁড়িয়ে ছুটতে লাগলাম—পুকুরের ওপাড় কি হাতের নাগালে। এপাড়ের মানুষ ওপাড়ের লোককে চিনতে পারে না। যাক্, মন্দিরের কাছে আসতে ধড়ে প্রাণ এল। সর্ব্বাগ্রে জামাটা ভাল করে কেচে শুকোতে দিলাম। জঙ্গলে রসের ক্রিয়া যে এতটা ভয়াল হয়ে উঠতে পারে ধারণা ছিল না।

মন্দিরের ভিতরে থাকার উপায় নেই, চৌকাঠের উপর বসলাম। কোন কাজ ছিল না, আনমনা অবস্থায় পুকুরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ক্ষণে ক্ষণে চোখ আপনা থেকে দূরে পুকুরের ওপাড়ে টলে যাচ্ছিল। এটা বনবাসের পুরাতন অভ্যাস, আতঙ্ক পিছু নিয়েই থাকে, কান খাড়া এবং দৃষ্টিকে সতর্ক না রেখে উপায় নেই। কান বেশীক্ষণ বেকার অবস্থায় বসে থাকতে পেল না, পুকুরের ওপাড় থেকে হনুমানদের কর্কশ ডাক দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ও ডাকের অর্থ আমি জানি, ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

দেখতে দেখতে পাঁচিলের উপর গাছের ডালে সর্ব্বত্র আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। বাঘ নিশ্চয় ভিতরে ঢুকে পড়েছে—তবে এদিকটার সহিত বাইরের যোগ আছে নাকি? কিছুই বিচিত্র নয়, ধ্বংসের ক্রিয়া যেখানে প্রতিনিয়ত চলেছে সেখানে খানিকটা পাঁচিল ভেঙ্গে গিয়ে বাঘের রাস্তা করে দিয়ে থাকবে।

শিকারীর কৌতূহল এমনি জিনিষ যে ঘটনাটি কি, না দেখে থাকতে পারলাম না। কবাট ঈষৎ ফাঁক করতেই বুড়ো আম গাছটার কাছেই দুই বীর হনুমানকে দেখা গেল—আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মল্লযুদ্ধে নেমে পড়েছে। উভয়ের পৃষ্ঠপোষকরা দূর থেকে কোলাহল সুরু করে দিয়েছে।

সাধারণতঃ এই জাত "মরি কি মারি," সূত্রপাত বীরভোগ্যার দখল নিয়ে হয়ে থাকে। মল্লযুদ্ধের কৌশল দেখতে লাগলাম, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার এমনি ওস্তাদি প্যাঁচ কোন কুস্তিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আঁচড়-কামড়ে উভয়ের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। উভয়েই নাছোড়বান্দা. একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বের রেহাই নেই! যার জন্য এই মরণ পণ সে কোন্ স্তরের সুন্দরী অনুমান করা শক্ত।

যুদ্ধের নিষ্পত্তি হল, দুর্ব্বল চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ায় সোজা কথা, ছাড়লে আছি, মারলে গেছি। বিজেতা ভোগের দখল নেবার জন্য চলে যেতে, পরাজিত নিকটের আম গাছটায় গিয়ে উঠল।

জঙ্গল নিস্তব্ধ, বাঘের ভয় ছিল না, দরজা সম্পূর্ণ খুলে দিলাম। বসে বসে আদিম প্রবৃত্তির কথাই ভাবছিলাম। মানুষ বুদ্ধি ও সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে এদিকে কতটা অগ্রসর হয়েছে, বিচারসাপেক্ষ হয়ে উঠেছিল। ভোগ ও প্রেম, Lust ও Love-এর মাঝে যে সূত্র মিলন ঘটায়, তা কি নিরবচ্ছিন্ন এই আদিম প্রবৃত্তি নয়। প্রকৃতির দুর্দ্দান্ত শক্তিকে যেভাবেই খোলস

পরান যাক, আসলে অন্তর্নিহিত রূপকে অস্বীকার করার উপায় নেই, তবু ছদ্মবেশে সত্যের উপর মাথা খাড়া করে আত্ম-প্রতারণায় সান্ত্বনা খুঁজে থাকি। আর অনেক কিছুই ভেবে চলেছিলাম, সব খেইছাড়া, ঘৃণ্য কথা। চিন্তার অনির্দ্দিষ্ট গতি বাধা পেলে হনুমানটা আমগাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে অযথা সামনে নৃত্য সুরু করে দিল। নৃত্যের তালও বিস্ময়কর, পিঠ, মাথা, কান, নাক, হাত সব একসঙ্গে চাপড়ে চলেছে। বেধড়ক তালের মাত্রার সহিত সোমের কোন সম্বন্ধ নেই। মাত্রা আপন মতলবে গড়ে উঠেছে। নৃত্যের কলা কৌশলেও কোন বিশেষ চালের মিল নেই, এমনকি ব্রতচারী নাচের সহিতও কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না, বরং জ্বালার যাতনায় অতিষ্ঠতাই নৃত্যের রূপ নিয়েছে মনে হল। সূত্র সহজেই দৃশ্য হয়ে উঠল—যুদ্ধের শাল রক্ত পিপীলিকার আবরণে কাল হয়ে গিয়েছে, ইস্, লাখ লাখ রক্ত-শোষক বেচারার তাজা মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

নৃত্যের পালা অল্প সময়ের ভিতর শেষ হয়ে এল—হনুমানের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই—মাটিতে শুয়ে পড়ে ছট ফট করতে লাগল। পরের ঘটনা দেখবার সময় ছিল না। রাত্রিবাসের জন্য পাঁচিলের দিকে রওনা হলাম।

ছাদে বসে আছি, একান্ত একেলা—ফেলে-আসা চিন্তাস্রোত ধীরে বেগশীল হয়ে উঠতে লাগল। ভাবছিলাম বনবাসের কথা, স্বকৃত নির্ব্বাসনের কথা :—

আশ্রয়ের বন্দীশালা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে, মৃত্যুর বরণডালা সাজিয়ে নিয়েই বার হতে হয়। তা পারছি কৈ, তবে কি এইখানেই আমার শেষ? ঐ যে নরকঙ্কালগুলো অজ্ঞাত ইতিহাস জড়িয়ে পড়ে আছে, ওদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যই কি নিয়তি আমাকে এখানে টেনে আনল? অহমিকা ও আত্মশ্রদ্ধাকে যে মানুষ সকল কাজে পথ-প্রদর্শক মনে করত, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অবিচলিত চিত্তে কঠোর কটূক্তি ব্যবহার করত, তাকেই অজ্ঞাতে হারিয়ে যেতে হবে? ভবিতব্যের পরিহাসে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল, জঙ্গল থেকে বার হবার জন্য মনকে দৃঢ় করে তুললাম—"মরি কি মারি"র আদর্শ আমার সিদ্ধান্তকে উৎসাহিত করে তুলল, কাল সকালেই এখান থেকে বার হব ঠিক করে ফেললাম। যে-সময় আশ্রয়ের কারাগার থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময় পাঁচিলের ওপাশে, কামান তোলার রাস্তার দিকে, দেয়ালের গা-ঘেঁসা একটি সরু ডালের উত্থান-পতন সুরু হল। প্রথম ভেবেছিলাম কোন হনুমান হবে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গল। এ সময় তো হনুমান গাছ থেকে নীচে নামতে পারে না।

সুধু হাতে বসে থাকাটা ঠিক নয়। একটি মোটা ও মজবুৎ হাড় কুড়িয়ে দোল-খাওয়া ডালের দিকে এগুতে লাগলাম।

কাছে আসতে দেখি, তাগ্ড়া কাল প্যান্থার (black panther) আমার সন্ধানেই পাঁচিলের উপর আসার পথ খুঁজছে। ডালের শেষের দিক পলকা হাওয়ায় পাঁচিলের নিকটে

এলেই নুয়ে পড়ছে। আমি সামনা-সামনি এসে পড়তে—পিছু হেঁটে পাতার আড়াল নেবার চেষ্টা করছিল, ঠিক ডালে পা না পড়ায় নীচে আছাড় খেল। ভাবলাম আপদ গেছে—কিন্তু বিপদ, যার পিছু নিয়ে থাকে তার নিশ্চিন্ত হবার অবসর কোথায়। বসবার জায়গায় ফিরতে যাব পাশেই পাঁচিলের আলে দুটি কাল থাবা এসে হাজির। পাথরের উপর নখ না বসায় জানোয়ার নিজেকে টেনে তুলতে পারল না—সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

আহার সন্ধানে বাঘের অধ্যবসায় অসাধারণ, বার বার আছাড় খেয়েও যে-জীব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে না তাকে বিশ্বাস নেই। ভীত হয়ে পড়লাম, কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হলেই তো আমি গেছি। জন্তুটাকে তাড়ান দরকার, সহায় একমাত্র অস্থিদণ্ড—পাঁচিলের গা ঘেঁসে দাঁড়ালাম।

সচরাচর বাঘের জাত আহত না হ'লে সামনে থেকে আক্রমণ করে না, উপস্থিত ক্ষেত্রে চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। আমাকে আলের পাশে দেখেও কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বরং উপরে আসার চেষ্টা আরও বাড়িয়ে তুলল।

আমিও হাড়ের হাতিয়ার বাগিয়ে ছিলাম, যুৎসইভাবে মাথাটা নাগালের মধ্যে পেতেই, সজোরে ব্রহ্মতালুর উপর এক ঘা বসিয়ে দিলাম—"মরি কি মারি"র মার, কাজে এল। অস্ত্র ভেঙ্গে গেল, তার সঙ্গে বাঘও পড়ল নীচে। মাটিতে পড়ে আর উঠতে পারে না। বহু চেষ্টায় যখন দাঁড়াল তখন মাতালের মত টলছে, ঐ ভাবেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

চলার ভঙ্গী দেখে বুঝেছিলাম, বাছাধনকে কিছুদিন ঝিমিয়ে থাকতে হবে। অস্থিদণ্ডের ভগ্নাংশ তখন হাতে রয়েছে, পরীক্ষা করে দেখি ভাঙ্গা জায়গাটা রক্তে ভিজে গিয়েছে, তার মানে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল, খুলীটা বোধ হয় চৌচির হয়ে গিয়েছে। নিরাপদে হাত দিয়ে পিটিয়ে বাঘ জখম করার বাহাদুরি এত সহজ-লব্ধ হতে পারে কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। যশ যেন আমার উপর জোর করে ঠেসে দেওয়া হয়েছিল।

রাত্রি, উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। শুক্লপক্ষীয় চাঁদের উঁকি ঘন মেঘের আড়ালের পাশে দেখা যায়। ফুর ফুরে হাওয়া বনফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে চলেছে—আবেষ্টনী রসভারাক্রান্ত। সুন্দর মূর্ত্তিময় হয়ে উঠেছে, জঙ্গলের রূপে আমি মুগ্ধ। নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছি।

কেন দান, কাকে দান, কিসের অর্ঘ্য কিছুই জানি না, কেবল অন্তরে উপলব্ধি করেছি, দিতে হবে পাওনা জমে উঠেছে। যার রূপে আমি বিভোর, তাকে নাগালের ভিতর পেলাম কৈ। বাস্তবকেই স্বপ্নের রূপ দিয়ে সাজিয়ে দেখি—নিজের কাছেই সান্ত্বনা খুঁজি।

জঙ্গলে জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। রাত ক'টা কে জানে। পাঁচিলের নীচে কঙ্কালভুক্ হায়না ডাক দিয়ে গেল, তার সঙ্গে ময়ূরের কেকা রব। ময়ূর থেমে যেতে, হনুমান ও বাঁদরের কোলাহল শুনতে পেলাম, সব কয়টিই বনের রাজার বিচরণ-সঙ্কেত।

অল্প সময়ের ভিতর গুরুগম্ভীর নাদে বাঘের ডাক জঙ্গলকে সচকিত করে তুলল। অভিসারের আয়োজন চলেছে। বাঘ স্বভাবতঃই মৌনী—ডাকের অর্থ প্রেমিকার সান্নিধ্যলিপ্সা। ডাক ক্রমান্বয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

রাত বেড়ে চলেছে, ঘুম আসতে লাগল, তন্দ্রার ঘোরে কত শব্দ শুনলাম, কত কি দেখলাম তার বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই।

পরের দিন সকালের কাজগুলো সেরে নেবার জন্য নীচে নামতে যাচ্ছিলাম এমনি সময় নিকটে একাধিক মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ভীড় ক্রমান্বয়ে মন্দিরের দিকে চলে আসছিল। চীৎকার করে জানাতে চেয়েছিলাম, আমাকে উদ্ধার করো। বলা আর হল না, হঠাৎ গোলমালের সঙ্গে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলার নির্দেশ পেলাম। পরক্ষণেই বন্দুক ছুটতে লাগল। একটা গুলি কানের পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। চিৎকার করে জানালাম, এ দিকে মানুষ আছে।

চিৎকার অপ্রত্যাশিত সুফল এনে দিল, বন্ধু আমার নাম ধরে জানতে চাচ্ছেন, তুমি কোথায় ?

অনতিকাল পরেই দলবলসহ বন্ধু পাঁচিরের নীচে এসে উপস্থিত। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। কালক্ষেপ না করে উপর থেকে নেমে এলাম। দৃঢ় আলিঙ্গন দ্বারা স্বল্পভাষী বন্ধু দুর্ভাবনার কথা উজাড় করে বলে দিলেন।

আনন্দস্রোতে আর একটি ঘটনা জড়িত ছিল। বন্ধু হৃষ্টচিত্তে জানালেন, এদিকে আসার পথে, কাছেই একটি প্রকাণ্ড কাল বাঘ মেরেছে, পিছনের লোকেরা নিয়ে আসছে। কাল বাঘের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, নিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকতে পারলাম না। বন্ধুকে টেনে নিয়ে গেলাম তাঁর শিকার দেখতে।

জানোয়ারের ব্রহ্মতালু ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গিয়েছে। পেটটা ফোলা, দেহ শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছে। আনন্দ চাপা দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। নিঃসন্দেহ বাঘটা কাল রাত্রেই মারা পড়েছে।

সত্য ঘটনা বলবার জন্য বন্ধুর দিকে ফিরে দেখি, তিনি গোঁফে চাড়া দিচ্ছেন, একেবারে ফোটো তোলার মেজাজ। বীরত্বের একাধিপত্যে এইরূপ একটি অশোভনীয় দাবি উপস্থিত হবে কল্পনাও করতে পারি নি। মেজাজের সঙ্গে রসিকতা বেড়েছিল—মুচকি হেসে বললেন, জঙ্গলী কি আর গাছে ফলে। গরু খোঁজার মত সারা জঙ্গল তোমার সন্ধানে দু'দিন ধরে ঘুরছি। বনবাস তোমার কাছে মোক্ষ লাভের ব্যাপার।

রসিকতা গ্রহণের জন্য মন প্রস্তুত ছিল না, নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, ভদ্রাচারের আড়াল নেওয়া সম্ভবপর হবে না—সোজাসুজি জানালাম, তিনি মরা বাঘের উপর গুলি চালিয়েছেন। মাটির বাঘ মারতে গিয়ে ছাদের মানুষ শিকার করে ফেলেননি বলে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে হল।

শিকার সম্বন্ধে বন্ধু এমনই উদাসীন যে, অমন একটা ট্রোফি (Trophy) হাত ছাড়া হয়ে যেতেও কিছুমাত্র দুঃখিত হলেন না বরং পিটিয়ে বঘে মারার জন্য আমাকেই তারিফ করতে লাগলেন। দাবীর ব্যাপার সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে জঙ্গলের অন্য ঘটনাগুলি বলতে যাচ্ছিলাম, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, ও সব হবে'খন, বাড়ী ফিরে চল। গ্রামের খবর তো রাখ না, ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বাঘ আসলে পিশাচ, জন্তু নয়, তোমাকে নাকি বাছাই করে কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। সন্দেহ ভাঙ্গবার জন্যই এ-দিকে এসেছিলাম। ফিরবার জন্য সকলে উন্মুখ হয়েছিল, বন্ধুকে অনুরোধ করলাম একটু দাঁড়াও, ভিতর থেকে রাইফেলটা নিয়ে আসি, ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

ভিতরে ঢোকবার পথে, আমগাছ তলায় দেখি, হনুমানটা উপে গিয়েছে—কেবল তার হাড়গুলো পড়ে রয়েছে।

ঘটনাগুলি বানান মনে করলে, বলব, আমার ঘর-আলোকরা কাল বাঘের চামড়াটা দেখে এস।

জঙ্গলের অভিজ্ঞতা

গল্পটা শোনা, নিজের মত করেই বলি। পোড়ো বাড়ী, ঝতিল ফরেস্ট বাংলো। সামনে বারান্দার মত খানিকটা জায়গা, এখন তার সমতল রূপ অদৃশ্য। বেশীর ভাগ স্থানেই ভাঙ্গা পাথরের চাঁই স্তূপীকৃত হয়ে আছে। যেটুকু জায়গা ব্যবহারোপযোগী সেটুকুও ভীতিপূর্ণ ছোট-বড় গহ্বরে ভরা। গর্তগুলি দেখলেই মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। আশেপাশে বিষধরের বিক্ষিপ্ত খোলস। দেওয়ালে চূণ-বালির বালাই নেই। খিলানের জায়গাটা ইটের গাঁথুনী—নোনায় জরে গিয়েছে। এইখানেই শিকারের আড্ডা গাড়া গিয়েছিল।

জায়গাটা লেগেছিল ভাল, উঁচু টিলার উপর থেকে সব দিক দেখা যায়। চারধারে মাইলের পর মাইল পাহাড় এবং গভীর জঙ্গল। বাংলোর পাশেই গভীর খাদ—কতশত ফিট খাড়াই ভাবে তলায় নেমে গিয়েছে বোঝবার উপায় নেই। নিকটে গিয়ে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। খাদের পাদমূলে বিস্তৃত সমতলভূমি কতকটা উপত্যকার মত, নূতন বর্ষার আগমনে পোড়া-মাটিতে সবুজের সাড়া পড়ে গিয়েছে। উপত্যকার বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরণা-বহা ক্ষীণ স্রোতস্বিনী দূরান্তরের দিকে।

আবেষ্টনীতে শব্দ নেই, সব নিঝুম। অকস্মাৎ দূরে স্যামবার হরিণের আর্তনাদ অথবা নিকটে পেচকের অস্বস্তিকর রব শোনা যায়।

দুপুরে আমার বন্ধু ফরেস্টার (forester) ও কুলীদের নিয়ে রসদ সংগ্রহ করতে সুদূর গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। ক্রোশ খানেক হাঁটলে জরিলের রাজপথেই মোটর বাস ধরা যায়। কথা ছিল, জঙ্গলীদের গ্রাম থেকে আলাদা কুলী পাঠিয়ে দেবেন মাচান তৈয়ারীর জন্য। তারাও আসেনি, একেবারে একলা পড়ে গিয়েছি। বেলা তখন পড়ে এসেছে। এতক্ষণেও যখন কেউ এল না তখন বুঝতে বাকি রইল না বন্ধু ফিরতি পথে বাস ধরতে পারেননি। কিন্তু মাচান বাঁধার জন্য নিকট গ্রামের জঙ্গলীরা এল না কেন ?

দেখতে দেখতে দিনের আলো শেষ হয়ে আসতে লাগল। পাহাড়ে গোধূলির রশ্মি অনেকক্ষণ থাকলেও হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়। বিবেচনা করে দেখলাম, এখন থেকেই হ্যারিকেন লণ্ঠনগুলো জ্বেলে রাখা ভাল। পূবমুখো ঘর, সেই দিকটাই নিরেট দেয়াল, মাত্র একটি দরজা, বিপরীত দিকে জানালা থাকলেও, গোধূলির আলো শেষ হলেই ঘর অন্ধকারে ভরে যাবে। ঘরের ভিতর যা অবস্থা তাতে মা মনসার শত দোহাই পাড়লেও আচমকা অন্ধকারে কিছুর উপর পা চাপিয়ে দেওয়া বিচিত্র নয়। উঠলাম আলো জ্বালতে।

ভিতরে ঢুকতেই মনে হল পিছনের ভাঙ্গা জানালাটার বাইরে কি যেন হঠাৎ সরে গেল,

হয়ত আমাকে দেখছিল। চলাটা মানুষের মত নয়, খট্‌কা লেগে গেল। মুখুজ্জো-মশাই-এর মহীশূরের নরভুকের গল্প চোখের সামনে সাক্ষাৎ ঘটনার মত হয়ে উঠল। কালবিলম্ব না করে ভরা দোনলাটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে ঘর থেকে বার হলাম। জানালার যে দিকে জানোয়ারকে চলতে দেখেছিলাম সেই গতি অনুসরণ কোরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম, যথাস্থানে এসে দেখি কোথাও কিছু নেই। অযথা আতঙ্কের জন্য লজ্জা এলাম। ফিরে এল ঘরে। ফিরে এসে, ম্যাগাজীন ভারী রাইফেলটা ভোরে রাখবার ইচ্ছে হল কিন্তু সেটা তখনো বাক্স থেকে বার করা হয় নি। ঘরের ভিতর বেশী আওয়াজ করার সাহসও ছিল না, ঠিক করলাম মাটির তলায় গর্ত্তের জীবকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

অল্প সময়ের ভিতর অন্ধকার যেন তেড়ে এসে সব কিছু ঘিরে ফেললে। এই সময়টা কি রকম লাগে তা গভীর জঙ্গলে একলা না থাকলে অভিজ্ঞতা হাত বদল করবার উপায় নেই।

ঘরে একটি জানালা, তার পাল্লাও গরাদহীন, হাঁ হাঁ করছে। আলো জেলে জানালার উপরেই রাখলাম, ভদ্র বাঘ হলে ঘরের ভিতর খানাতল্লাসী করতে আসবে না। একটি খবর জানা ছিল এ অঞ্চল বাঘে ভরা হলেও এমন কোনটা নরভুকের উচ্চাসন দখল করেনি।

দুটো লণ্ঠনই জ্বেলেছিলাম। একটা মেজেতে রাখতে আশ্বস্ত হওয়া গেল। বসতে গিয়ে মনে পড়ল দরজাটাও বন্ধ করতে হয়। দীর্ঘকাল ধরে বাংলো এই অবস্থায় পড়ে আছে। বাঘ না এলেও ঘরটি যে গুহার বাসিন্দা ভালুকের প্রেমকেলীর জায়গা নয় তা কে বলতে পারে। জোর করে দরজা বন্ধ করতে যেতে পাল্লার উপরকার কব্জার জোর খুলে গিয়ে কবাট আর একটু হলেই মাথায় পড়েছিল। কোনপ্রকারে মাথা বাঁচিয়ে সেটাকে ভেজান গেল। তবু খুঁৎখুঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। একদিকে খোলা জানালা, অপর দিকে মাত্র ভেজান পতনোন্মুখ দরজা। একটা দিক অন্ততঃ নিরাপদ হওয়া দরকার। দরজায় মোটা পাথরের চাঁই ঠেকা দিতে পারলে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। সামান্য সন্ধানেই মনের মত দুটি পাথরের চাঁই পেলাম, ভাঙ্গা ছাদের টুকরো। পাথর দরজায় ঠেকা দিয়ে বসতে যাব ছাদের ভাঙ্গা খোলা জায়গাটা ক্ষণিকের জন্য আড়াল পড়ল, তারপরই আলগা গাঁথুনির টুকরো ঝরে পড়তে লাগল। পাথরের নুড়ী, ঘরের ভিতর ছাদ-ধসা শুকনো বালিও পাথরের উপর পড়তে, লণ্ঠনের আলোয়, ধুলো হালকা ধোঁয়ার মত সারাটা ঘর ঘিরে ফেললে। ভগ্নস্তূপের নুড়ী পড়তে সতর্কিত হতে হয়েছিল। উপরে আলোর আড়ালে সন্দেহ এলেও ঘরের ভিতর সরীসৃপের ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলাম।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ছাদের আলো আড়াল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম পিছনে জানালার দিকে বেজায় ভারী দেহী জমাট তুলার উপর লাফিয়ে পড়ার মত আওয়াজ। ভাবলাম বন্দুক নিয়ে উঠে দেখি, কিন্তু দরজার কাছেই যদি সন্দেহের জীবটি লুকিয়ে থাকে

তাহলে তার দিকে বন্দুক ফেরাবার আগেই হয়ত আমার ভবলীলা শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্য্যন্ত ঘরের ভিতরই বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত। মনকে স্তোক দিলাম উপর থেকে সুড়ী পড়ার পরেও যখন কিছু অঘটন ঘটেনি তখন আমার আতঙ্ক অর্থহীন। যুক্তিগুলি আপনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য গড়ে উঠছিল। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আত্মনির্দ্দিষ্ট সতর্কতা যাবতীয় প্রাণীরই বাঁচার অবলম্বন—তবে মানুষ instinct ছাড়া বুদ্ধিকে ব্যবহার করে থাকে। উপস্থিত ক্ষেত্রে বুদ্ধি নানা রকম সম্ভাবনার ফাঁপরে ফেলে দিল।

ঘরের ভিতরও বসে থাকা যথেস্ট নিরাপদ মনে করতে পারছিলাম না।

সিদ্ধান্ত দাঁড়াল বিষধরের মত সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা যে কোন বিপদের সামনে এগিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত। পরিত্রাণের স্থান ছাদের উপরে। ওখানে উঠতে পারলে, আক্রমণকারীর সঙ্গে অন্ততঃ বোঝাপড়ার সুবিধা পাওয়া যাবে। দোনলা প্যারাডনসের (Paradon) দিকে তাকাতে আত্মনির্দ্দিষ্ট ভরসায় বলীয়ান হয়ে উঠলাম। ছাদ হাতের নাগালেই সাড়ে সাত ফিটের উপর হবে না। প্রাচীন কালের কম খরচায় জঙ্গলী বিশ্রামাগারের উচ্চতাকে শোভনীয়ই বলতে হবে। কিন্তু যেখান দিয়ে উঠব সেইখানেই তো সাপের কেল্লা। ইতস্ততঃ করছি এমনি সময় স্পষ্ট শুনলাম, ছাদের উপর কোন জন্তু লাফিয়ে উঠল। ভরা বন্দুক বাগিয়ে রাখলাম, ঠিক জানতাম এইবার একটা কিছু ঘটে যাবে। অনুমান প্রমাণিত হতে সময় লাগল না। একটু পরেই খোলা জায়গাটা থেকে ছোট সুড়ী ঝরে পড়তে লাগল। তার পরই দেখলাম একটি বিশালাকার থাবা সন্ত্রস্তভাবে খানিকটা করে ঘরের ভিতর বেশ খানিকটা ঢুকে আসছে আবার ছাদের উপর উঠে যাচ্ছে। বাঘের মুখ দেখতে পাচ্ছি না থাবা থেকে বুঝলাম আমার মুখোমুখি হয়ে বসে নি। থাবার উপরই গুলি চালিয়ে দিলে কি হয়? নিজের কাছে উত্তর পেলাম, বাঘ জখম হয়ে পালাবে এবং বেশী চলতে না পেরে যদি বন্ধুর ফেরার পথে কোথাও বসে থাকে, তাহলে একজনকে সে নেবেই, আহত বাঘ, হাতীর পল্টনকেও আক্রমণ করতে ভয় পায় না। পরক্ষণেই বন্ধুকে বাঁচান অপেক্ষা নিজের বাঁচাটা বেশী প্রয়োজন মনে করলাম। তখন মরা-বাঁচার সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি—অস্বাভাবিক শক্তির আশ্রয় পেলাম।

ছাদের ফুটোর দিকে টর্চ ঠিক করে সুইচ টিপে দিলাম। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোও জ্বলেছে আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাঘও ফুটো দিয়ে মুখ বার করেছে। রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম হল, টর্চ রেখে বন্দুক তুলে নেবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়েছি—কতকটা সম্মোহিতের মত হয়ে গিয়েছিলাম। অকস্মাৎ সাংঘাতিক তীব্র আলো চোখে পড়ায় বাঘ ভড়কে গেল, তারপরেই হুঙ্কার দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ল, তারপর লাফের পর লাফের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনলাম, নিশ্চিন্ত হলাম বাঘ আর এদিকে ফিরছে না, জন্তুটা পালিয়েছে। এইবার ঘর থেকে বার হতে হয়।

স্তূপের কাছ থেকে লাফ মেরে কড়ি কিংবা বরগা ধরে একবার ঝুলতে পারলে উপরে উঠে যাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু যেখানটা ধরব সেই জায়গাটা আমার ওজনে যদি ধ্বসে যায় তাহলে সশরীরে বিষধরের সম্বর্দ্ধনার জন্য মাটিতে পড়তে হবে।

সরীসৃপের কথা যতই ভাবতে লাগলাম ততই তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে উঠছিলাম, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করেছে, ঘরের ভিতর আর এক মিনিটও থাকা উচিত নয়, পলে পলে মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনা অপেক্ষা বাঘের কামড় ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়।

বন্ধুর বাঁধা হোলড্-অল (Hold-all) চোখে পড়ল, দ্বিধা না করে উঠে পড়লাম। পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে ধীরে বাঁধা বিছানা তুলে নিয়ে স্তূপের কাছে শুধু পায়ে এগুতে লাগলাম। অতি সন্তর্পণে বিছানা তার ওপর রেখে, কোটের পকেটে চৌকো শিকারের টর্চ পুরে ফেলতে সময় লাগল না। তারপর আরো সন্তর্পণে তার উপর উঠতে আমার মাথা ছাদের উপর এসে পড়ল— পিঠের বন্দুক ছাদে রেখে, দুটি হাত ভাঙ্গা জায়গার কিনারায় রাখতে পায়ের তলার একটু বেসামাল হয়েছিল। নড়াচড়ায় বিছানার তলার খানিকটা স্তূপ ধ্বসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝাঁকুনি দিয়ে প্যারালাল (Parallel) বারে ঝোলার মত মাটি থেকে উঠে পড়লাম। তখন কোমর থেকে দেহের নিম্নাংশ ঘরের ভিতর দোল খাচ্ছে। এই সময় ঘরের ভিতর যে সব শব্দ আরম্ভ হল তার সঠিক বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। একাধিক সাপের ছোবল একটির পর একটি পড়তে আরম্ভ করেছে, তাড়াতাড়ি উপরেও উঠতে পারছি না, হাঁটু দুটো মুড়ে মাটি থেকে শরীর আরো একটু উপরে তুলে কোন প্রকারে ছাদের উপরে এসে পৌঁছলাম। ধড়ে প্রাণ এল। উপরে উঠেই প্রথমে জঙ্গলের আশপাশ দেখে নেওয়া দরকার বোধ করলাম। উঠে দাঁড়িয়ে সবে টর্চ পিছন দিকে ফেলেছি, দেখি নীচেই প্রকাণ্ড বাঘ, উপরে লাফাবার জন্য অপেক্ষা করছিল, হয়ত আর এক মুহূর্ত্ত টর্চ জ্বলতে দেরী হলে আমার কোলের উপরেই এসে পড়ত।

আলো পড়তে বাঘ সামনের একটা ঝোপের দিকে ছুটতে লাগল। টর্চ ঠিক রেখে বন্দুক তুলে নিতে নিতে, জানোয়ার ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। টর্চটি বন্দুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেবার ব্যবস্থা ছিল। গোড়াতেই সংলগ্ন করে নিলে হাতে পাওয়া শিকার ফসকাতো না। নিজেকে স্তোক দিলাম, যাক সাপের ছোবল থেকে বেঁচে গিয়েছি এই ঢের।

কিন্তু বড় বাঘের এইরূপ আচরণ আমি কখনো দেখিনি। লেপার্ড (চিতা নয়) অবশ্য তাড়া খেয়েও বার বার ফিরে আসে কিন্তু বড় বাঘ (stripes) একবার ভড়কালে তাকে ক্‌খ... ফিরতে দেখিনি। আসলে জানোয়ারটা মূর্খ, কোন শিকারীর সঙ্গে পরিচয় হয়... হল। তবু তার সাহসের কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলাম। ছাদ পরীক্ষা... ভরা, সর্ব্বত্র জন্তুটির থাবার দাগ পড়েছে তার উপর, ভাঙ্গা জায়গাটার... জায়গা। অর্থাৎ, বাঘ প্রত্যহ এই ছাদটিকে observatory করে, শিকারে...

বসা সঙ্গত দাবী করে ফেলেছিল। ঘরের ভিতর আলো আর মানুষের গন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ায় অনধিকারচর্চ্চায় ব্যস্ত জীবটি কে জানবার কৌতূহল দমন করতে পারে নি। এইবার ঘরের ভিতর কি ব্যাপার চলেছে জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল, এগিয়ে গিয়ে বন্দুকে লাগান টর্চ্চের আলো ঘরের ভিতর ফেললাম। লোমহর্ষণকর দৃশ্য—চার পাঁচটা অতিকায় বিষধর, ঘরের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ফোলড অলের উপর একটি রাজগোক্ষুরা সাড়ে তিন ফিটের কাছা-কাছি খাড়া হয়ে ফণা ধরে দুলছে। আক্রোশ তার বাঁধা বিছানাটার উপর, হয়ত এক-আধটা ছোবল ইতিমধ্যে দিয়েও ফেলে থাকবে। বন্দুকে লিথেল বল ভরা ছিল, গুলি চালাতে সাহস পেলাম না। পাথরে লেগে ঠিকরে আমারই উপর ফিরে আসতে পারে। এইবার সামলে বসা দরকার, বাঘের যে বিচিত্র আচরণ দেখলাম তাতে সমস্ত রাত জেগে নিজেকে পাহারা না দিলে যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদে পড়তে পারি।

বাংলোটি এমন একটি জায়গায় প্রস্তুত হয়েছিল যার নিকটেই চার-পাঁচটি জন্তু চলার পথ এক জায়গায় এসে মিশেছে। খাদের নীচে পূর্ব্ববর্ণিত নদী ভিন্ন এ অঞ্চলে আর কোথাও জল পাওয়া যায় না। সুতরাং তৃষ্ণার্থীকে সঙ্গমস্থলটি মাড়িয়ে যেতে হবেই। মণ্ডপটি পছন্দ হয়েছিল বলেই এইখানেই আস্তানা গেড়েছিলাম। মাচান যেখানে বাঁধবো ঠিক করেছিলাম সে জায়গাটা এখান থেকে মাত্র ১০০ খানেক গজ দূরে, সঙ্গমস্থলটি পাশেই। টরচের আলোর পাল্লার পক্ষে বাংলো একটু দূরে।

আর একবার বন্দুক সংলগ্ন আলো ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। রাত জাগার উপকরণ শিকারে সব সময় সঙ্গে রাখি। পকেটেই থাকে। ফ্লাস্ক (flask) বার করতেই মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, রসের রাজ্যে হাজিরা দিতে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল। বুক পকেটে অধিকন্তু টোটাগুলি ঠিক আছে দেখে, প্রথম চুমুকের পর সিগারেট ধরালাম। নিটের ক্রিয়াই আলাদা, সঙ্গে সঙ্গে উগ্রতরল শক্তির সন্ধান দিতে লাগল, শিকারের আশায় বসিনি, সুতরাং সিগারেট আর তরলের গন্ধ লুকাবার তেমন প্রয়োজন দেখলুম না। উভয় দিক দিয়েই যশ---আমাকে স্বনামধন্য পুরুষ করে ছেড়েছে। শিল্পীরা বলে, আমার মুখের সামনে সিগারেটের সাদা ধোঁয়া না থাকলে না কি আমার চেহারাই মেলান যায় না। আর উগ্রতরল সম্বন্ধে বলাই বৃথা---সোজা কথা লুকো-ছাপার বালাই অনেক দিন কাটিয়ে বসে আছি। কথায় বলে, "ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।" গুণ কিছু থাকলে তবে তো তার হারানোর ভয় থাকে।

নিটের ক্রিয়া সুরু হতে সময় লাগল না—মৌজ বাড়তে আরম্ভ করেছে, একটার পর একটা সিগারেট নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। আবার ধরাচ্ছি,---সময় কেটে চলেছে, নিঝুম রাতে জোৎস্নার আলো আমাকে রসের রাজ্যে টেনে নিতে আরম্ভ করেছে।

মওড়ার দিকেই তাকিয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখলাম দুইটি বাঘ মুখোমুখি হয়ে বসে আছে। আমার কাছ থেকে একশ' গজ দূরে হবে--জঙ্গলের সরকারী পথের মাঝখানে একেবারে ফাঁকায় বন্দুক তুলে আবার নামিয়ে নিলাম। কেন বলতে পারি না--আমার হিংসাবৃত্তি স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন অপ্রত্যাশিত। তথাপি অনেক সময় অনেক জিনিষ ঘটে, যার সঠিক কারণ সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। কখন পশুরাজরা আমাকে দর্শন দেবার জন্য আসন গেড়ে বসেছিল জানতে পারিনি। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য বন্দুক প্রস্তুত রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে একটি উঠে আর একটির পিছনে যাবার চেষ্টা করতে, সাংঘাতিক গর্জ্জন করে অপরটি মাটি ছেড়ে দাঁড়াল। বুঝলাম রাজা ও রাণীর গোপনে দেখাশুনা হয়, প্রেমের দ্বন্দ্বে রাজায় রাজায় বোঝাপড়া চলেছে। অল্পক্ষণের ভিতরেই দ্বন্দ্বের প্রকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠল---একেবারে মল্লযুদ্ধ, কখনো সোজা দাঁড়িয়ে উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করছে, কখনো লাফের দ্বারা নানা পেঁচের প্রয়োগ চলেছে। নখে নখে, দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষণ, তারই সঙ্গে থেকে থেকে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। দ্বন্দ্বের মীমাংসা অতি সহজে নিষ্পত্তি হয়ে গেল, দেখলাম একটি রীতিমত ঘায়েল হয়ে পরিচিত ঝোপের দিকে ঢুকে গেল—আর বিজেতা চলতে লাগল জলাশয়ের দিকে। সতর্কিত গতি, খানিকটা চলে আবার পিছু ফিরে তাকায়। আমার এখান থেকে সিগারেটের ধোঁয়া, মদের গন্ধ, দেশলাই জ্বালা- কোনটা ভ্রুক্ষেপের মধ্যে আনা দরকার বোধ করেনি—এটাও অশিক্ষিত বাঘ—তার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হবার কিছু ছিল না।

বাঘ চলে গেল। জঙ্গল পুনরায় নিস্তব্ধতার মাঝে ডুবতে সুরু করল।

তখন ফ্লাস্ক খালির দিকে এগিয়ে চলেছে। পায়ের কাছে ছাদের মেঝে সিগারেটের টুকরায় বেশ খানিকটা সাদা হয়ে গিয়েছে। মৌজ জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ শুনলাম দূরে বহুদূরে প্রপীড়িত নারীর আর্ত্তনাদ। আওয়াজ থেকে থেকে অধিকতর করুণ ও দীর্ঘ হয়ে উঠছে, এবং আরো নিকটে চলে আসছে। তিরুপতি তীর্থে যদি কেহ ডোলী চড়ে গিয়ে থাকেন তো শব্দের অনুকরণ দৃষ্টান্তে বুঝতে পারবেন—আর্ত্তনাদ কতকটা ডোলী-বাহকদের টানা সুরের মত। কান খাড়া করে বসে ছিলাম, শব্দ যথেষ্ট নিকটে এসে পড়ল। বুঝলাম, ফেউ ডাকার মত বাঘের আগমনবার্ত্তা। শেয়ালের বিকৃত ডাক নয়, ভিন্ন জানোয়ারের স্বর। আমি জানোয়ারটিকে কখনো দেখিনি তবে শুনেছি পোহাড়গেল সাপের নাকি সগোষ্ঠী। যাই হোক, শব্দ বাংলোর নিকটে এসে থেমে গেল। আমি খাদের দিকে পিঠ করে প্রস্তুত হয়ে বসলাম। যে দিক দিয়েই রাজ্যেশ্বর আসুন না কেন আমার অজ্ঞাতে ছাদের উপর চলে আসা চলবে না। অনেকক্ষণ একই ভাবে বন্দুক হাতে বসে রইলাম, কোন সাড়া নেই। আরো খানিকটা সময় কাটতে দূরে জলাশয়ের দিক থেকে ভয়াল বার্ত্তা আসতে

লাগল, বাঘ ঐ দিকে চলে গিয়েছে। নিশ্চয় দূর থেকে আমাকে দেখে চলার পথ বদলে ফেলেছিল। এতক্ষণে একটি শিক্ষিত বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল, জন্তুটি এদিকে তিন-চার দিনের ভিতর মুখ দেখাবে কিনা সন্দেহ।

শিকারে তখন আমার কোন স্পৃহা ছিল না। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপ আমাকে মোহমুগ্ধের মত জঙ্গলী করে তুলেছিল, ভাবছিলাম কেন অহেতুক এই হত্যার সৌখিনতা, আর কত কি তা বলতে পারি না, সংক্ষেপে বিশাল বনস্পতিদের অবর্ণনীয় রূপ আমার অন্তরকে ভাবময় করে তুলেছিল। কারণ মুক্ত ভাবের স্রোত বাধা পেল।

ধাবমান স্যামবার হরিণের ক্ষুরধ্বনি শুনলাম। সোজা পথে অবর্ণনীয় দ্রুত গতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে।

নতুন ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বড় ঘোড়ার মত একটি বিপুলকায় হরিণ আমার চোখের সামনে দিয়ে জলাশয়ের বিপরীত দিকে চলে গেল। আমি আধ মিনিটের ভিতরেই আন্দাজ তিরিশ-চল্লিশটা জঙ্গলী কুকুরকে (আকার সাধারণ দেশী কুত্তার চেয়ে ছোট) বেগে ছুটে আসতে দেখলাম। বাংলোর কাছাকাছি এসেই সব কয়টা থমকে দাঁড়িয়ে গেল তারপর পলাতক হরিণের পিছু না গিয়ে জলাশয়ের দিকে মন্থর গতিতে মোড় ফিরাল। শিকার ছেড়ে দেবার কারণ অনুমান করলাম, বাংলোর আলো। ছাদ-ধসা বাংলোতে কোন সৌখীন শিকারী আসে না, সেই কারণে বৎসরের পর বৎসর পোড়ো বাড়ী হয়ত অনেক জন্তুর বিশ্রামের স্থান হয়েছিল। হঠাৎ পরিচিত জায়গার রূপ পরিবর্ত্তনে চালাক কুকুদের আতঙ্ক আসা বিচিত্র নয়। তৃষ্ণার্ত্ত বাঘের কথা মনে পড়ল, নিশ্চয় জানতাম কুকুরের পাল তার সন্ধান পেলে পালান শিকারের অভাব মিটিয়ে যেত, জীবন্ত বাঘের মাংস টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

কুকুরের পালও দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। মৌতাত ঝিমিয়ে আসছিল। নিজের অজ্ঞাতেই ফ্লাস্কের দিকে হাত চলে গেল। অপ্রীতিকর অনুভূতি—পাত্রটির ওজন কমে গিয়েছে। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সঞ্চয়ের কথা ভুললাম কিন্তু রসের টান এমনিই বেড়ে উঠল যে শেষরক্ষা করতে পারলাম না, বোতল খালি হয়ে গেল।

নিট রংদার হয়ে উঠল। বাঘ ভালুক তখন আমার দোস্ত হয়ে গিয়েছে। নিজেকে জঙ্গলের একজন বিশিষ্ট প্রাণী ভাবতে আরম্ভ করেছি।

নিঝুম রাত—বোধ হয় দ্বিপ্রহর পার হয়ে গিয়ে থাকবে। এমনই একটি স্থান যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক পর্য্যন্ত নেই। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মাঝে বসে আছি। নিটের ক্রিয়া দারুণ ভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে। অহিংসা মতবাদের প্রতি সঙ্গত আক্রোশ আসতে সুরু করে দিল। বন্দুক হাতে বসে থাকা বিড়ম্বনা মনে বোধ করছিলাম। ভাবলাম, যে-ঝোপটায় বার বার

বাঘকে ঢুকতে দেখলাম সেখানটা চেষ্টা করে দেখলে কি হয়। এখান থেকে ঝোপ পর্যন্ত একেবারে ফাঁকা। আমাকে নিকটে আসতে দেখে যদি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলেও চার-পাঁচ লাফের কমে আমার কাছে আসতে পারবে না। তবে আহত না হলে অত দূর থেকে বাঘ সহজে আক্রমণও করতে আসে না। একমাত্র উপায় আছে ঐ পাশের টিলাটার কাছে যেতে পারলে ২০-২৫ গজের ভিতর এসে পড়া যায়। তখন শিকার ও সুরার ডবল নেশায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছি, অবলীলাক্রমে সাড়ে সাত ফুট উপর থেকে লাফিয়ে পড়লাম। ভয় ছিল বন্দুকটিকে নিয়ে, সেটা সামনে দুহাতে ধরে লাফিয়েছিলাম। ঘরের ভিতর তখন আলো জ্বলছে, সেদিকে আর ফিরলাম না। টিলার দিকে চলতে লাগলাম। ঝোপের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রেখে চলেছি, একটু নড়লেই বন্দুক বগলে তুলে নেব বলে কিছুমাত্র বাধা না পেয়ে টিলার কাছে এসে পড়লাম, তার উপর উঠতেও সময় লাগল না। এইবার বাঘকে বার করি কেমন করে? বন্দুক বাগিয়ে নিয়ে কাশলাম, কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ঝোপের অপর পাশটিও খোলা জায়গা। জ্যোৎস্নার আলোয় একটা ইঁদুর চলে গেলেও দেখা যায়। তবে কি বাঘ আমাকে আসতে দেখে পালাল নাকি? পরক্ষণেই মনে হল মোটের উপর বাঘ ঝোপের ভিতর আছে কি না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। একটা ফাঁকা আওয়াজ করবার ইচ্ছা হল। পরে বিবেচনা করে দেখলাম শূন্যে গুলি উড়িয়েই বা লাভ কি। সত্যি বাঘ বেরিয়ে এলে মাত্র একটি গুলির উপর নির্ভর করতে হবে। এক গুলিতে না মরলে নতুন করে গুলি ভরবারও সময় পাব না। মানুষের কাশির আওয়াজ এত কাছ থেকে শুনেও যখন বাঘ কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি তখন সে নিশ্চয় এখানে নেই।

এখন করা যায় কি? আর ঝোপের বেশী কাছে যাওয়া চলে না, অতর্কিতে ঘাড়ের উপর এসে পড়তে পারে। বাংলোর দিকে ফিরতে হলে, আমার পিছনটি বাঘের সামনে ধরতে হবে। সামনে মুখ রেখে পিছু হাঁটাও বিপদসঙ্কুল, নিটের রস পায়ের উপরও প্রভাব জাহির করতে আরম্ভ করেছে, ইতিমধ্যেই তার আভাস দুবার পেয়েছি। টিলার উপর বাঘের সামনা-সামনি বসে রাত কাটান এ অবস্থায় অসম্ভব। গাছ খুঁজতে লাগলাম। টিলার নীচেই কয়েক হাতের ভিতর মন্দের ভাল একটি গাছ আছে বটে, ঢালুর দিকে পিছু হেঁটে নামতে পারলেই বাঁচা যায়।

নিটের প্রায়শ্চিত্ত না করে উপায় নেই। পলায়মান না হয়েই পিছু হাঁটতে লাগলাম। গাছের কাছে এসে পড়েছি এমনি সময় টিলার ওপাশ থেকে ঝোপ নড়ার আওয়াজ এল, শুকনো পাতার উপর খস্ খস্ চেনা পায়ের শব্দ, তারপরই একটি ভারী জন্তুর পড়ে যাবার আওয়াজ। বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে গেলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি টিলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছুটাছুটি করছে যে-কোন মুহূর্তে বাঘের সম্পূর্ণ দেহ টিলার উপর দেখব বলে। কিছুক্ষণ সময় কেটে

গেল, কিছুই ঘটল না, কেবল ঝোপের দিক থেকে ঘড়ঘড়ানি শব্দ এল, ক্রোধের প্রকাশ নয়, যন্ত্রণার কাতর ধ্বনি।

বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে গেলাম

আর বিলম্ব করা যায় না। বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে গাছে উঠতে লাগলাম। এ বিষয় অভ্যাস দ্বারা পারদর্শিতা লাভ করেছিলাম। বেশ উঁচু ডালে এসে পড়েছি। বসতে যাব· পা বেসামাল

হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। নিজেকে সামলাবার সময় বন্দুকের বাঁট গাছের ডালের সঙ্গে ঠুকে গেল, নিস্তব্ধ জঙ্গলে ঐটুকু শব্দেরই প্রতিধ্বনি ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ দারুণ ভাবে নড়ে উঠল, তারপর আবার ভারী ওজন পড়ার শব্দ। ইতিমধ্যে বসবার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

নিরাপদ স্থানেই বসেছিলাম, ধীরে এবং সাবধানে পিঠের অস্ত্র সামনে নিয়ে এলাম। নড়া জায়গাটা লক্ষ্য করে বন্দুক-সংলগ্ন টর্‌চের সুইচ টিপে দিলাম। প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি। আলো এদিক ওদিক ঘোরাতে, নজর পড়ল বাঘের লেজের উপর, মৃদু দুলছে বাঘ শুয়ে আছে, কখনো কখনো পিছনের পা দেখতে পাচ্ছি, কেমন একটা ছটফট ভাব অনেকক্ষণ আলো জেলে বসে থাকলাম, গুলি চালানোর উপযুক্ত জায়গা সুবিধামত পাওয়া গেল না। ক্রমান্বয়ে মাংসাশী নিশ্চল হয়ে আসতে লাগল, অল্প সময়ের ভিতর লেজের সামান্য দোলাও বন্ধ হয়ে গেল। রাতের বেলা নানা বিঘ্নের মাঝে বাঘ ঘুমায় এ রকমটি কখনো দেখিনি। গুলি চালাবার জন্য হাত তখন নিস্‌পিস্ করছে অথচ হৃদয় বা মাথা বহু চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারলাম না। নাচার হয়ে বন্দুক হাতে বসেই রইলাম। সময় কেটে চলেছে, মাঝে মাঝে টর্‌চ জেলে দেখছি বাঘ নড়ে কি না। লেজ অসাড়।

নেশার ঘোর আমাকে তখন চেপে ধরেছে। খালি পেটে কড়া ব্র্যাণ্ডির (Brandy ক্রিয়া, তার সঙ্গে কতক্ষণ টক্কর দিয়ে চলা যায়। বিপদ নিকটে জেনেও নিজেকে আর সামলাতে পারছিলাম না। কপালগুণে সামনেই দুটি কাছাকাছি ডাল পেয়ে গিয়েছিলাম তার উপর হাত ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। অল্পক্ষণের ভিতরই ঘুমের কবলে গিয়ে পড়লাম, বহু চেষ্টা করেও নেশাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হল না।

চোখ বুজবার সময় বন্দুকটা পিঠে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে ডালের সঙ্গে সুইচের ধাক্কা লেগে গেল। টর্‌চ জ্বলে উঠল। তখন এমন অবস্থা নেই যে বন্দুক সামনে এনে আলো নিভিয়ে দিই। তন্দ্রার ঘোরে ভাবলাম একটু পরে নিভিয়ে দিলেই হবে। আলস্য আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, অসহায়ের মত হয়ে গিয়েছিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম, কিছু মনে নেই, হঠাৎ ঝোপের ভিতর ঝটাপটির শব্দে তন্দ্রায় বিঘ্ন ঘটল। পরক্ষণেই মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম, নিস্তব্ধ জঙ্গলে মড়া জন্তুর পেটের উপর কামড় পড়লে যে শব্দ বার হয় তা অভিজ্ঞ শিকারী ভুল করতে পারে না। একসঙ্গে অনেকগুলি জন্তুর ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি বন্দুক সামনে নিয়ে এলাম। লক্ষ্যের স্থান ঠিক করে বগলে তুলতেই অভ্যাসমত সুইচ টিপলাম—আলো জ্বলে না, ব্যাটারীর শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।

তখন চাঁদের আলোর শেষরশ্মি পাহাড়ের আড়ালে। ঝোপের কাছে, ঘোর অন্ধকার। তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পূর্ব্ব ঘটনাগুলি মনে পড়তে লাগল। বাঘের কথা, তার

কাতর গোঙানি, এবং মড়ার মত পড়ে থাকার কথা। ছবিটা চোখের সামনে দেখছিলাম তবে কি বাঘটা মরেছে ? যারা মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে তারা কোন্ জাতীয় মাংসভুক্। নিজের কাছেই উত্তর পেলাম, হাইনা।

ওরা পচা জন্তুর সন্ধানে বেরিয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে টাটকা মড়া পেয়ে গিয়েছে। পূতিগন্ধ না পেলে ওদের রসনার তৃপ্তি হয় না। ক্ষুধার তাড়না কি রুচির বিচারের সময় রাখে ?

কিন্তু একটা তাজা বাঘ অযথা এবং হঠাৎ মরতে গেল কেন ? প্রেমের ব্যর্থতায় আত্মঘাতী হওয়া যে আরণ্যক-নীতির বিরুদ্ধাচরণ। তবে কি ঝোপের বাঘ গতরাত্রের মল্লযুদ্ধে নিহত হয়েছিল ?

ঘুম কেটে গিয়েছে, হাইনাই মারব ঠিক্ করে বসে রইলাম। ভোর হ'তেও বেশীক্ষণ সময় লাগল না।

একটু পরিষ্কার হতেই ট্রিগার টিপবার লোভে একদৃষ্টে ঝোপের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, যে কোন একটা হাইনা বেরুলে হয়। নিশ্চয় বলতে পারি তখন স্বপ্নের ঘোর ছিল না, মাংস ছেঁড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, তার পরিবর্ত্তে কাছে দূরে তিতিরের ডাক শুনছি, মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকারব। আকাশ ফর্সা হয়ে গিয়েছে। ঝোপে কোন চাঞ্চল্য নেই।

একটা গাছের ছোট ডাল ভেঙে ঝোপের উপর ছুঁড়লাম, কোন সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার ডাল ছুঁড়লাম, ভিন্ন ফল পেলাম না। পরের পর বাইরের উৎপাতেও বাঘ নির্লিপ্ত থাকায় খটকা লেগে গেল, ভাবতে লাগলাম আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই স্বপ্ন নয় তো ?

সকালের আলো ভিন্নপ্রকারের সাহস নিয়ে এসেছে। বিপদকে বোঝবার শক্তি ফিরে পেয়েছি। নেমে এলাম গাছ থেকে। একেলা ঝোপের দিকে যাবার ভরসা পেলাম না। বাংলোমুখে চলতে লাগলাম। বাংলোর কাছে এসে দেখি ঘরের গা ঘেঁষা একটি বিরাট পাথরের চাঁই, ছাদে ওঠার জন্য বাঘের সিঁড়ির ধাপ।

একলা ঘরের ভিতর ঢোকা বিপদজনক মনে করলাম। রাত্রির ঘটনা স্বপ্ন হলেও মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল লাগছিল না। পাথরের চাঁইয়ের সাহায্য নিয়ে আবার ছাদে উঠে পড়লাম। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় নেশা তখন একেবারে কেটে গিয়েছে।

বসে আছি বন্ধু ও কুলীদের ফেরার অপেক্ষায়। তারা যখন ফিরে এলো তখন বেলা হয়ে গিয়েছে। এই শিকারের বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত্তগুলির সঙ্গে পরের ঘটনার কোন সম্বন্ধ নেই। কারণ এর পর আমাকে জঙ্গল ছাড়তে হয়েছিল বন্ধুর আতঙ্কের জন্য। বিষের ভয় তাঁকে এমন ভাবেই অভিভূত করেছিল যে যাবার পথে দামী সৌখীন বিছানা জঙ্গলীদের দান করতে কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি।